
আইডিয়াস
এন
ভিউস
CHANGES IN IDEAS N VIEWS
এ জেড এম আলমগীর
আইডিয়াস এন ভিউস • এ জেড এম আলমগীর
রাজ
নীতি
নারী: মা, মেয়ে ও স্ত্রী
ভাষা
ধর্ম
পরীক্ষা: একটি স্বপ্ন বা কল্পনা
টি ভ্রম সংশোধন
সিদ্ধান্ত ও ধর্ম
ডিজিট: একটি স্বীকৃতি, একটি সম্ভাবনা
বুদ্ধিজম ও ইসলাম
এক আজব বা স্বর্গীয় অর্থনৈতিক ভাবনা
মানব সৃষ্টি ও বিবর্তন

আইডিয়স এন্ড ভিউস

(Changes in Ideas and Views)

এ জেড এম আলমগীর

আইডিয়াস এন্ড ভিউস পাবলিকেশন

গ্রন্থস্বত্ব : এ জেড এম আলমগীর

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০২২

প্রকাশক : এ জেড এম আলমগীর
আইডিয়াস এন্ড ভিউস পাবলিকেশন
রোড-৬, ব্লক-এ, মিরপুর-১০, ঢাকা।

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : এ জেড এম আলমগীর
প্রচ্ছদ ডিজাইন : তাজ মোহাম্মদ
ছবি : সোহেল ঘোষ আদিত্য

মুদ্রণ : ইরানী প্রিন্টার্স
১৪৯-১৬১, গাউসুল আজম মার্কেট, ঢাকা।

মূল্য : ৪৮০ টাকা।

Ideas and Views
(Changes in Ideas and Views)
by A Z M Alamgir
Published in Bangladesh
by A Z M Alamgir
Ideas n views publication.

Price: BDT 480.

ISBN : 978-984-35-2852-0

www.facebook.com/ideasnviews 01534-773814.

সূচী পৃষ্ঠা

পরীক্ষা : একটি স্বপ্ন বা কল্পনা

(Examination : A Vision)

প্রথম পর্ব

পরিপ্রেক্ষিত পর্যালোচনা

১.১ শিশু শিক্ষার্থীর মর্যাদাবোধ ও আত্মবিশ্বাস

শিশুরা ড্রপ আউট হয় না। শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে যারা নিয়োজিত থাকে তাদের গৃহীত সিদ্ধান্ত শিশুদের ড্রপ আউটের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। বিশেষত ভর্তির প্রাথমিক পর্যায়ে যে শ্রেণীতে একজন শিক্ষার্থীকে ভর্তি করা হচ্ছে সে শিক্ষার্থী উক্ত শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার উপযুক্ত কিনা সে বিষয়টি যথোপযুক্তভাবে নির্ধারণ করা গুরুত্বপূর্ণ। এ নির্ধারণ সঠিক না হলে শিশু ড্রপ আউটের দিকে যেতে থাকে। এর সাথে দারীদ্রতার একটি ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে। ড্রপ আউটের আরও অনেক কারন আছে কিন্তু সে আলোচনায় যাব না। কেননা এ লেখার উদ্দেশ্য সূত্রপাতকৃত আলোচনা থেকে ভিন্ন।



শিক্ষার প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়কে বিশেষভাবে বিবেচনায় রেখে পরীক্ষা নিয়ে কিছু স্বপ্ন বা কল্পনা এ লেখার মাধ্যমে তুলে ধরতে চাই আগামীর শিক্ষার্থীদের জন্য।

একজন শিক্ষার্থী কেবল একটি বিদ্যালয় বা কোন একটি শ্রেণীর অধীন নয়, সে একটি সমাজ ও পরিবেশে বসবাস করে। প্রাথমিক পর্যায়ের একটি শিশু বা শিক্ষার্থী যত ছোটই হোক না কেন মানুষ হিসেবে ধনী-দরীদ্র নির্বিশেষে মর্যাদার বিষয়ে ভেতরে সে যথেষ্ট সচেতন। এ বিষয়টিকে প্রথমেই উপলব্ধিবোধ বা বিশ্বাসের মধ্যে আনা গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে একজন শিক্ষার্থী কেমন আচরণ পাচ্ছে সেটি গুরুত্বপূর্ণ। গ্রাম-গঞ্জ থেকে শুরু করে মাঠ-পর্যায়ে শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়নের সাথে

যারা জড়িত তাদেরকে বিশেষভাবে এ বিষয়টিতে মনযোগ দিতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থা যদি কোন প্রকারে শিশুর মর্যাদাবোধকে ক্ষুন্ন হওয়ার সুযোগ করে দেয় তবে শিশু ধীরে ধীরে মানসিকভাবে বিকলাঙ্গ হতে থাকে। স্বকীয়তা হারাতে থাকে। ফলে নিজ চরিত্রের পরিবর্তন ঘটিয়ে সমাজে ছদ্মবেশী চরিত্র ধারণ করে মিশতে চেষ্টা করে। তার স্বপ্ন ও লক্ষ্যকে পরিবর্তন করে ফেলে। শিক্ষার্থীর মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা যা অর্জন করতে চায় তা ব্যাহত হয়।

শিক্ষা ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য অধিক নাম্বার প্রাপ্তি নয়। মূল লক্ষ্য সমুহের অন্যতম হচ্ছে শিক্ষার্থীকে মর্যাদা সম্পন্ন ও আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে উঠতে সহায়তা করা। যেন শ্বাপদ-সংকুল পৃথিবীতে সে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়ে চলতে পারে।

শিশুদের মধ্যে কিছু আছে যারা নিজেদের মর্যাদাকে ক্ষুন্ন হতে দেখলে কোন উপায়ে সেটি প্রকাশ করার চেষ্টা করে। অর্থাৎ প্রতিবাদ করে। কিন্তু এমন শিশুর সংখ্যা বেশী নয়। বেশীরভাগ শিশু বিষয়গুলি নিজের মধ্যে চাপা রাখে। চলার বিকল্প পথের সন্ধান করে। অন্যদিকে যারা প্রতিবাদী হয় একই ঘটনার পুরাবৃত্তি তাদেরকেও সরল পথ থেকে বিকল্প পথে যেতে বাধ্য করে। মর্যাদা ক্ষুন্নের বিষয়টি শিশুকে মানসিকভাবে আঘাত করে।

শিশুরা যখন প্রতিবাদী হয় তখন প্রতিক্রিয়া দেখে বিষয়গুলি বুঝে নেয়া বড়দের জন্য সহজ হয়। কিন্তু যারা প্রতিবাদ না করে নিশ্চুপ থাকে তাদের নিশ্চুপতার ভাষা বুঝে নেয়া বড়দের দায়িত্ব। বড়রা যখন সেটি বুঝতে ব্যার্থ হয় তখন শিশুদের অনেকে আত্ম হননের পথও বেছে নেয়। মানসিক অবস্থা কোন পর্যায়ে গেলে শিশু এমন কাজে উদ্বুদ্ধ হতে পারে? অবশ্যই বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিতে হবে। কাউকে আঘাত দেয়া কিংবা কারও সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথ রুদ্ধ করে দেয়া শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য হতে পারে না।

একজন ছাত্র কিংবা ছাত্রী যে শ্রেণীতে অধ্যায়ন করে সেখানে সে তার সহপাঠিদের সাথে পরিচিত সমাজে একটি সমমর্যাদা নিয়ে চলাফেরা করে। তাকে কোন অজুহাতে শ্রেনী থেকে অর্থাৎ সহপাঠিদের থেকে নীচে নামিয়ে দেয়া তার মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করে। তার আত্মবিশ্বাসে আঘাত হানে। বিষয়টি বড় হয়ে দেখা দেয় তখন যখন এটি শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে করা হয়। কেননা তখন সেটি একটি প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতির রূপ পায়। সমাজ সেটিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা বা গ্রহণ করে। বিষয়টিকে সমাজের এই অধিক গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করা শিশুর মর্যাদাকে

অধিক ক্ষুন্ন করে। উপরন্তু পরিবার ও সমাজের নানান জনের নানান ব্যাঙ্গ কথাবার্তা ও আচরণ তো আছেই। শিশু এসব পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে চরিত্রের পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। দু একজন যারা একেবারেই মেনে নিতে পারে না তারা আত্মহননের মত বিষয় নিয়েও চিন্তা ভাবনা করে। সমাজে এমনটি ঘটছে।

প্রতিষ্ঠান একজনকে সমাজে এভাবে হেয় প্রতিপন্ন করতে পারে না। করা উচিত নয়। এ ব্যাবস্থা থাকা উচিত নয়। মানুষ লেখাপড়া শিখতে আসে মর্যাদাশীল ও আত্মবিশ্বাসী হতে। অপমানিত হতে নয়। এতসব আলোচনার সূত্রপাত করেছি মূলত পরীক্ষা নিয়ে কিছু কথা বলার ইচ্ছে থেকে।

১.২ পরীক্ষা

পরীক্ষা এমন একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীকে তার সহপাঠিদের থেকে নীচে নামিয়ে দেয়া সম্ভব হয়। পরীক্ষার নামে যখন এমনটি করা হয় তখন মূলত তা শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্জনকে ব্যাহত করে। শিশুর মর্যাদাবোধকে ক্ষুন্ন করে। তার আত্মবিশ্বাসে আঘাত হানে। যা তার জীবনের স্বাভাবিক গতিকে ঘুরিয়ে দিতে ভূমিকা রাখে। পরীক্ষার মধ্য দিয়ে স্পষ্টত নীচের বিষয়সমুহ ঘটে:

- একদলকে অকৃতকার্য রূপে চিহ্নিত করা হয়।
- অপর একটি দলকে কৃতকার্য রূপে চিহ্নিত করা হয়।
- কৃতকার্যদের এ বি সি ডি ই এভাবে চিহ্নিতকরণ বা গ্রেডিং করা হয়।

পরীক্ষার নামে বছর শেষে মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কৃতকার্য, অকৃতকার্য বা এ বি সি ডি ইত্যাদি রূপে চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে আমরা আসলে কি অর্জন করতে চাই?

শিক্ষা জীবনের প্রতিটি ধাপের পরীক্ষার রয়েছে কিছু আপাত বা তাৎক্ষনিক লক্ষ্য। আবার পরীক্ষাসমুহের কিছু সূদুরপ্রসারী লক্ষ্যও রয়েছে। পরীক্ষার আপাত অর্জিত লক্ষ্য এবং সূদুরপ্রসারী লক্ষ্যের মধ্যে আবার একটি ধারাবাহিক সম্পর্কও বিদ্যমান রয়েছে। নীচে পরীক্ষার কিছু মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অতি সংক্ষেপে তুলে ধরতে চাই।

পরীক্ষার আপাত লক্ষ্য

● একটি শ্রেনীতে অনুষ্ঠেয় পরীক্ষার আপাত বা তাৎক্ষনিক লক্ষ্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কৃতকার্য শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করা, যারা পরবর্তী ধাপে উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা রাখে।

● পরীক্ষার মাধ্যমে তুলনামূলক বিচারে যারা মন্দ ফলাফল করেছে তাদের অকৃতকার্যরূপে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা হয়। চিহ্নিত অকৃতকার্যদের পরবর্তী ধাপে উন্নীত না করে একই ধাপে রেখে দেয়া হয়। নিবিড় তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে তাদের আরও যোগ্য করে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। অর্থাৎ তাদের পরবর্তী বছরে ভাল ফলাফল করার জন্য প্রস্তুত করা হয়। যেন তারা পরবর্তীতে ভাল ফলাফল করে উত্তীর্ণ হতে পারে।

● প্রাথমিক ও জুনিয়ার পর্যায়ে কেন্দ্রীয়ভাবে অনুষ্ঠিত পরীক্ষা অর্থাৎ পিইসি ও জেএসসি-তে শিক্ষার্থীদের গ্রেডিং করার কোন সরাসরি প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হয় না। এর মাধ্যমে যদি বৃত্তি প্রদান করা হয় তবে সেক্ষেত্রে কাজে আসতে পারে। তবে এ জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে এত বড় পরীক্ষা আয়োজনের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। তা ছাড়া এভাবে বৃত্তি প্রদান করাও সঠিক কাজ নয়।

● এসএসসি এবং এইচএসসি পর্যায়ে গ্রেডিং করার সাথে যোগ্যতা অনুযায়ী ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারার একটি সরাসরি সম্পর্ক পরিলক্ষীত হয়। এর মাধ্যমে কিছুটা ফিল্টারিং করা সম্ভব হয়। মনে করা হয় যে এর মাধ্যমে যোগ্যদের ভাল কোথাও ভর্তি হওয়া ও সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথ সুগম হয়। তবে একই সাথে অকৃতকার্য ও তুলনামূলক কম গ্রেড প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের ভাল কোথাও ভর্তি হওয়ার পথও রুদ্ধ হয়ে যায়।

পরীক্ষার সুদুর-প্রসারি লক্ষ্য

● পরীক্ষা সমুহের সুদুরপ্রসারি লক্ষ্য মূলত কর্ম জীবনের সাথে সম্পৃক্ত। প্রতিটি ধাপে পরীক্ষার মাধ্যমে ছেঁকে ছেঁকে যোগ্যদের ভাল কাজে নিয়ে আসার চেষ্টা করা হয়, যেন সবচেয়ে তুখোড় ও চৌকষেরা গুরুত্বপূর্ণ সব কাজে আসতে পারে। ফলে তাদের থেকে জীবন ও জগত ভাল কিছু পাবার আশা করতে পারে।

- এ ছাড়াও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল যোগ্যদের বেছে বেছে আগামীর নেতৃত্বের জায়গায় নিয়ে আসা।

শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায় থেকে প্রতিটি ধাপে পরীক্ষার মাধ্যমে ছেঁকে ছেঁকে যোগ্যদের উপরে নিয়ে আসার চেষ্টা করা হয়। ফলে পরীক্ষার প্রতিটি ধাপের আপাত লক্ষ্য একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তার সুদুরপ্রসারি লক্ষ্য ও উদ্দ্যেশ্য অর্জনকে সহায়তা করে।

পরীক্ষার মাধ্যমে যারা কৃতকার্য হয় তাদের নিয়ে খুব একটা ভাববার নেই। কিন্তু পরীক্ষার কারনে কিছু শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হয়, আবার পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিবিধ গ্রেডিং করা হয়, মূলত সে কারনে কিছু বলার ইচ্ছে থেকে এ লেখার সূত্রপাত।

পরীক্ষার মাধ্যমে কিছু শিক্ষার্থীদের অকৃতকার্যরূপে চিহ্নিত করা হয়, আবার কিছু শিক্ষার্থীদের নানাবিধ গ্রেডে গ্রেডিং করা হয়। এসব কার্যকলাপের হয়তোবা কিছু ভাল দিক আছে, কিন্তু এর যথেষ্ট মন্দ দিকও রয়েছে। সে বিষয়গুলি তুলে ধরতে চাই। অতপর ভাল মন্দের তুলনামূলক বিচার না করে সমাজের সামগ্রীক মঙ্গলের জন্য করণীয়টি তুলে ধরতে চাই।

আলোচনার প্রথমেই দেখার চেষ্টা করব পরীক্ষায় শিক্ষার্থীরা কেন অকৃতকার্য হয়। অতপর দেখতে চেষ্টা করব অকৃতকার্য ও গ্রেডিং করার নানামুখী মন্দ দিকগুলি কি। সমগ্র আলোচনাটি শিক্ষার প্রাথমিক, জুনিয়র, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়কে বিবেচনায় রেখে করা হয়েছে।

১.৩ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার কারন

শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয় মন্দ ফলাফল করার কারনে। অতএব শিক্ষার্থীদের অকৃতকার্যতা বিষয়ে আলোচনা করতে হলে দেখা প্রয়োজন যে, কেন একজন শিক্ষার্থী মন্দ ফলাফল করে।

নানান কারনে একজন শিক্ষার্থী ফলাফল খারাপ করে। এ বিষয়ে প্রচুর গবেষনা-পত্র রয়েছে। এসব গবেষনা পত্রসমুহে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারনের উল্লেখ রয়েছে। আগ্রহ নিয়ে কেউ চাইলে সে সব গবেষনা-পত্র পর্যালোচনা করে এ বিষয়ে জেনে নিতে পারে।

এখানে একটু ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিষয়টি দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। তাছাড়া এ লেখা একটি ভিন্ন উপসংহারে গিয়ে পৌঁছাতে চায়। তাই গবেষনালব্ধ নানান কারনের বিস্তারিত এখানে তুলে ধরা হল না।

সাধারণত গবেষনালব্ধ ফলাফলে যে সব বিষয় আসতে পারে তার মধ্যে আছে শিক্ষা প্রদান পদ্ধতিতে সমস্যা, শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষনের অভাব, কনটেন্টে সমস্যা ইত্যাদি। এসবের প্রাপ্ত ফলাফল আবার পার্থক্যপূর্ণ হতে পারে শহর ও গ্রামে, ছাত্র এবং ছাত্রীতে, ধনী কিংবা দরীদ্রে ইত্যাদি।

শিক্ষার প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরকে বিবেচনায় রেখে এ আলোচনা শুরু করেছি। ফলে শিক্ষার্থীদের এ সময়ের বয়সকে বিবেচনায় রেখে সে আলোকে এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব। খুব গভীর, জটিল কিংবা অনেক বড় লিষ্ট উপস্থাপন করতে চাই না। সহজ বিষয়গুলিকে বিবেচনায় নিতে চাই।

- **শিক্ষার্থীর প্রচেষ্টার ঘাটতি :** শহর-গ্রাম, ছাত্র-ছাত্রী, ধনী-গরিব সর্বত্র পার্থক্যপুর্ণ কারনের উপস্থিতি থাকা সত্বেও সব ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে কিছু শিক্ষার্থী ভাল ফলাফল করছে, আবার সবখানেই কিছু শিক্ষার্থী মন্দ ফলাফল করছে। অর্থাৎ খারাপ অবস্থায় থেকেও ভাল ফলাফল করা সম্ভব হচ্ছে। আবার ভাল অবস্থায় থেকেও মন্দ ফলাফল হয়ে থাকে। তাহলে সমস্যাটি কোথায়?

সমস্যাটি শিক্ষার্থীর মধ্যে। শিক্ষার্থী নিজে যখন উদ্যোগী নয়, শিক্ষার্থী নিজে যখন ভালভাবে লেখাপড়া করে না- তখনই সে পরীক্ষায় ফলাফল খারাপ করে এবং অকৃতকার্য হয়।

মানুষ কোন কাজে ভাল করে বা সফল হয় মূলত কাজে তার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টার প্রয়োগের কারনে। কোন শিক্ষার্থীই মন্দ নয়। মনযোগ সহকারে লেখাপড়া করলে বা নিজের সর্বোচ্চ চেষ্টাটি দিলে সকলের পক্ষেই ভাল ফলাফল করা সম্ভব। কিন্তু সকলেই লেখাপড়ায় মন দেয় না বা মন বসাতে পারে না। ফলে তার সক্ষমতার সবটুকু প্রয়োগ করে না। মন-প্রাণ দিয়ে চেষ্টা না করার কারনেই পরীক্ষায় একজন শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হওয়ার মত ফলাফল করে থাকে। ফলাফল মন্দ হয় বস্তুত প্রচেষ্টার ঘাটতির কারনে। কেবল কনটেন্টের সমস্যা, শিক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষক প্রশিক্ষন এসবের কারনে নয়। একই কনন্টেন্ট, পদ্ধতি ও শিক্ষকের কাছে শিক্ষার্থীরা অনেক ভালও করছে। মানুষ নিজে যখন আন্তরীকতার সাথে কিছু করতে চায় তখন সে সব বাধা পেরিয়ে সব অবস্থা থেকে সব কিছু করতে পারে।

● **শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করতে না পারা :** প্রশ্ন হচ্ছে কেন কারও কারও প্রচেষ্টায় ঘাটতি থাকে? কেন কেউ লেখাপড়ায় মন বসাতে পারে না?

অনেক কারনের একটি হচ্ছে লেখাপড়ার গুরুত্ব অনুধাবন করতে না পারা। যে বয়সটি নিয়ে আলোচনা করছি এ বয়সের একজন শিক্ষার্থীর পক্ষে লেখাপড়ার গুরুত্ব বা বাস্তব জীবনে এর প্রয়োজনীয়তা না বুঝাই স্বাভাবিক। শিক্ষার্থীদের পড়ালেখায় আগ্রহী করে তুলতে হলে তাই লেখাপড়ার গুরুত্ব সম্পর্কে তাকে অব্যাহত স্মরণ করিয়ে দেয়া ও উৎসাহ প্রদান করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কিন্তু শিক্ষার্থীদের সকলে সেটি সমভাবে পায় না। আবার অভিভাবকদের সকলে সেটি দিতেও পারে না। এসবের বহুবিধ কারন আছে। সে তালিকায় যেতে চাই না।

আবার বিষয়টি যদি হয় প্রান্তিক অঞ্চলের কোন দরীদ্র পরিবারের সন্তান, যাকে সংসারের নানান কাজেও সহায়তা করতে হয়, তেমন একজনের পক্ষে এমন সুযোগ পাওয়া বা পেলেও গ্রহণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এ বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করা বা এর গুরুত্ব তুলে ধরার মতও কেউ থাকে না।

যে মানুষ কোন কাজের গুরুত্ব নিজ থেকে অনুধাবন করে না বা করতে পারে না, তার পক্ষে সে বিষয়ে আন্তরীক হওয়া সম্ভব নয়। কোন কাজে আন্তরীক না হলে মন-প্রাণ দিয়ে সর্বোচ্চ চেষ্টা প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না। ফলে ফলাফল খারাপ করে।

● **বয়সের নাজুকতা :** পিইসি, জেএসসি, এসএসসি, এইচএসসি এ সময়ের বয়সটি প্রাকৃতিক কারনেও ছেলেমেয়েদের জন্য একটি অত্যান্ত নাজুক সময়। এটি বয়ঃসন্ধিকালের সময়। এ সময়ে বাস্তব জ্ঞান পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করে না, অথচ একটি সন্ধিকালের মধ্য দিয়ে সময়টি অতিবাহিত হয়। মস্তিষ্ক সব বিষয় নিয়ে অতি দ্রুত কাজ করে। দীর্ঘমেয়াদী একঘেয়ে কাজে মন বসে না। এ সময়ে কিছু শিক্ষার্থী আছে যাদের লেখাপড়া বিষয়টি একেবারেই ভাল লাগে না। লেখাপড়ায় মন বসাতে পারে না। এদের অনেকের ওপর ফ্রয়েডিয় নানান সূত্র ক্রিয়া করে। যে বিষয়টি অধ্যায়ন করে মস্তিস্ক সেটিকে ভালভাবে ধারণ করে না। আবার লেখাপড়ায় যথেষ্ট সময়ও দেয় না। পরীক্ষায় ফলাফল মন্দ হয়।

● **সহজাত প্রবনতা :** পিইসি, জেএসসি, এসএসসি, এইচএসসি এ বয়সের সন্তানেরা কল্পনা-প্রবণ হয়ে থাকে। বাস্তবতা বোঝে না এবং সেটি বোঝার কথাও না। আবার এক অর্থে স্বাভাবিকভাবে বোঝা উচিতও নয়। এ বয়সে এক এক

জনের এক এক দিকে ঝোঁক থাকে। খেলাধুলা, ছবি আঁকা, গান করা, নাচ করা, গল্প কবিতা নাটক সিনেমা, আড্ডা দেয়া, অন্যের বিপদে এগিয়ে আসা ইত্যাদি। এগুলি অস্বাভাবিকতা নয়। এসবে অধিক মনযোগী হয়ে সময় ব্যায় করাতেও পড়ালেখায় ফলাফল মন্দ হয়। তবে এগুলিতেও তো সময় দিতেই হবে। এটিই তো স্বাভাবিকতা! শিক্ষা ব্যবস্থায় ভাল-মন্দ নির্ধারণে এসব বিষয়গুলিকে কিভাবে বিবেচনা করতে হবে- তা নিয়েও ভাবতে হবে। কেননা ব্যাক্তি, সমাজ, পরিবারে এগুলিরও অনেক মূল্য আছে। সবকিছু অর্থের মূল্যে মূল্যায়ন করা যায় না বা করার প্রয়োজনও নেই এবং উচিতও না।

● **বিকল্প ব্যবস্থা না থাকা :** কেউ পরীক্ষার পূর্ব রাতে পিতা-মাতা কিংবা অতি ঘনিষ্ট কারও মৃত্যুর কারনে পরীক্ষায় খারাপ করতে পারে। কিংবা অনুপস্থিত থাকতে পারে। সেটি শিক্ষার্থীর নিজের কোন ভূল, অন্যায় বা অপরাধ নয়। হতে পারে নিয়তি। শিক্ষা ব্যবস্থার কাজই তো নিয়তির প্রতিবন্ধকতাসমুহকে কিভাবে দুর করা যায় তা নিয়ে কাজ করা। কিন্তু তেমন ব্যবস্থা নেই। এমন ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের ফলাফল খারাপ করার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

একজন শিক্ষার্থী নিজে অসুস্থতার কারনেও অনুপস্থিত থাকতে পারে বা ফলাফল খারাপ করতে পারে। কিন্তু পরীক্ষা এসব বিষয়কে বিবেচনায় নেয় না। বিশেষত যেসব পরীক্ষা কেন্দ্রীয়ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। একদিনের ক্ষণস্থায়ী অসুস্থতা চিরদিনের জন্য একজনের জীবনের গতি পরিবর্তন করে দিতে পারে মনুষ্য সৃষ্ট কঠোর অন্ধ-নিয়মের কারনে। এর ফলেও শিক্ষার্থীদের ফলাফল খারাপ হয়ে থাকে।

● **মানসিক বিদ্রোহ :** বইয়ের সব বিষয় একজন নাও জানতে পারে। নির্দিষ্ট কিছু কমন প্রশ্নের উত্তর মুখস্ত করে একজন কৃতকার্য হতে পারে। অনেকে আবার না বুঝে কেবল মুখস্ত করে ভাল ফলাফল করতে পারে। অনেকে অংকও মুখস্ত করে। মুখস্ত ভিন্ন ভাল ফলাফল করা সম্ভব নয়।

শিক্ষা জীবনে শিক্ষার্থীরা অনেক কিছু অধ্যায়ন করে যা কর্মজীবনে প্রয়োজন হয় না। শিক্ষার্থীরা সে সব জানে। এ ধরণের অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলিও তাদেরকে কেবলমাত্র পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করতে হবে সে কারনে বছরব্যাপি মুখস্ত করে রাখতে হয়।

কিছু শিক্ষার্থী আছে যারা বিষয়গুলি জানে বুঝে কিন্তু নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অর্থাৎ দীর্ঘ এক বছর একটি বিষয় স্মৃতিতে ধারণ করে রেখে পরীক্ষার

জন্য অপেক্ষা করাকে অপ্রয়োজনীয় মনে করে। তারা মন থেকে এ ব্যবস্থাকে মেনে নিতে পারে না। কেননা সে জানে প্রয়োজনে অপ্ত জ্ঞানটিকে সে কিভাবে কাজে লাগাবে। কোথায় পাবে। এটিই তো গুরুত্বপূর্ণ।

বলা যায় বিদ্যমান ব্যবস্থার সাথে অনেকে ভেতরে এক রকম বিদ্রোহ করে। এসবের প্রভাব সবার ওপর সমানভাবে পরে না। তবে মানুষে মানুষে চরিত্রে পার্থক্য আছে। মুখস্ত নির্ভর পরীক্ষা ব্যবস্থাকে যারা মন থেকে গ্রহণ করতে পারে না তারা অবহেলা করে। বিদ্যমান ব্যবস্থায় তারা ফলাফল খারাপ করে। কিন্তু তারা খারাপ না। অনেক ক্ষেত্রে তারাই চৌকষ।

শিক্ষা ব্যবস্থা পড়ালেখার দিকটিকে অধিক মাত্রায় বিবেচনায় নিয়ে কৃতকার্য-অকৃতকার্য এভাবে সন্তানদের প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ভাল-মন্দরূপে সমাজে পরিচয় করিয়ে দেয়। জীবনের অপরাপর বিষয়গুলিকে বিবেচনায় নেয় না। নিলেও যেভাবে নেয় তাতে একজনের প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি মেলে না; সন্মানজনকভাবে জীবনে চলার মত পথও সৃষ্টি হয় না। শিক্ষার্থীরা দেখতে পায় তার আগ্রহের বিষয়টিতে এ জগতে কোন সন্মান বা মূল্য নেই। কোন স্বীকৃতি নেই। ছেলে-মেয়েদের অন্তর প্রচলিত ব্যবস্থার সাথে বিদ্রোহ করে। তারা নিজেদের আগ্রহের বিষয়টিতে উপেক্ষিত হয়ে লেখাপড়াকে উপেক্ষা করতে থাকে। চরম অসহায় শিক্ষার্থীদের এ মানসিক বিদ্রোহও তাদের ফলাফল খারাপ করার একটি অন্যতম কারন।

শিক্ষার্থীরা দেখে বাস্তবে অনেক বড় বড় ডিগ্রী ও সনদধারীরা উচ্চ বেতনে চাকুরি করছে। ভাল জীবন-যাপন করছে। অথচ সমাজে তাদের অবদান চোখে পড়ার মত নয়। অনেকক্ষেত্রে কৃত্রিমভাবে অবদানকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। অথচ যে ধান ফলায় সে তার সন্তানকে সন্মানজনকভাবে লেখাপড়া করাতে পারে না। মানসিক বিদ্রোহের অনেক কারন আছে। কেবল শিক্ষা নয় গোটা সমাজ ব্যবস্থায় সমস্যা আছে। যার প্রভাব শিক্ষার্থীদের লেখা-পড়ার ওপরে নেতিবাচকভাবে এসে পরে।

● **অকৃতকার্যতার ধারণা :** পরীক্ষায় একজন শিক্ষার্থীর অকৃতকার্য হওয়ার প্রধান কারনটি হচ্ছে- শিক্ষা ব্যবস্থায় অকৃতকার্যতার ধারণার উপস্থিতি। শিক্ষা ব্যবস্থায় এ ধারণার উপস্থিতি না থাকলে কেউই অকৃতকার্য হত না।

পরীক্ষায় মন্দ ফলাফলের গবেষনালব্ধ প্রাপ্ত যে কারনই থাকুক না কেন- মূল কারনটি হচ্ছে লেখাপড়ায় শিক্ষার্থীদের আগ্রহ না পাওয়ার কারনে চেষ্টায় ঘাটতি

থাকা। চেষ্টায় ঘাটতি থাকার অনেক কারনের মাঝে গুরুত্বপূর্ণ কারন হচ্ছে বয়সের নাজুকতা ও শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করতে না পারা। উপরন্তু শিক্ষা ব্যবস্থায় অকৃতকার্যতার ধারণার উপস্থিতির কারনেও শিক্ষার্থীরা অকৃতকার্য হয়।

পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের মন্দ ফলাফলের গবেষনালব্ধ অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারন আছে। যদি একেকটি কারনকে ভাঙ্গার চেষ্টা করা হয়, তবে আরও অনেক অনেক কারন বেড় হয়ে আসবে। কিন্তু এ লেখায় কারন নিয়ে বেশী আলোচনা করতে চাই না। মন্দ ফলাফলের কারন যাই হোক না কেন- এ লেখার উদ্দেশ্য সে সব অনুসন্ধান করা নয়। এখানে পুরো ব্যবস্থাটিকে নিয়ে এমন কিছু স্বপ্ন দেখতে চাই, যা কোনদিন বাস্তবায়িত হলে এসব কারন নিয়ে এভাবে আর ভাবতে হবে না।

১.৪ পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের অকৃতকার্যরূপে চিহ্নিতকরণের নেতিবাচক দিক সমুহ

একজন শিক্ষার্থীর পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার সরাসরি পরিণতিটি হচ্ছে পরবর্তী ধাপে উত্তীর্ণ হতে না পারা। অর্থাৎ তাকে একই শ্রেণীতে পুনরায় থেকে যেতে হবে। এর অপর অর্থই হচ্ছে সে তার সহপাঠিদের থেকে এক ধাপ নীচে নেমে গেল।

একজন শিক্ষার্থীকে একই স্তরে পুনর্বার রেখে দেয়া বা তার সহপাঠিদের থেকে এক ধাপ নীচে নামিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্য কি? এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যেন শিক্ষার্থী পরবর্তী বছর কৃতকার্য হওয়ার জন্য ভালভাবে চেষ্টা করে। পরবর্তীতে ভাল ফলাফল করে। অতপর ভাল কোথাও ভর্তি হতে পারে।

শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় এভাবে অকৃতকার্য করে আবার একই ধাপে রেখে দেয়ার বেশ কিছু নেতিবাচক ফলাফল আছে। নিচে এর নেতিবাচক কিছু দিক তুলে ধরার চেষ্টা করা হল।

- **শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ততাকে ব্যাহত করে :** গ্রাম প্রধান দরীদ্র দেশ বাংলাদেশ। এখানে শিক্ষার হার স্বল্প। আছে শিক্ষার্থী ড্রপ আউট সমস্যা। তার ওপর শিক্ষা জীবন শুরু করা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিশু সন্তানেরা শিক্ষা জীবন বুঝে ওঠার প্রাক্কালে যদি পরীক্ষা এবং তাতে অকৃতকার্য হওয়ার বিষয়টির সাথে পরিচিত হতে শুরু করে, তবে তাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় ধরে রাখার ক্ষেত্রে সে ব্যবস্থা সহায়ক নয়।

শিক্ষার নিম্ন পর্যায়ে- বিশেষ করে প্রাইমারী ও জুনিয়র পর্যায়ে অনেক বেশী পারফেকশনের প্রয়োজন নেই। এ পর্যায়ে বেশী দরকার শিক্ষার চৌহদ্দির মধ্যে শিক্ষার্থীকে ধরে রাখা। কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থায় অকৃতকার্যতার নিয়ম নিজেই অনেক শিক্ষার্থীকে অল্প বয়সে ড্রপ আউটের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বঞ্চিত করে দিচ্ছে শিক্ষার আলো প্রাপ্তির সম্ভাবনা থেকে। শিক্ষিত জাতি হয়ে গড়ে ওঠা দীর্ঘায়িত হচ্ছে। সামগ্রিকভাবে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অথচ শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে শিশুদের ধরে রাখা সম্ভব হলে জীবনে একদিন তারা কৃতকার্য হবেই। আজ যার প্রচেষ্টায় ঘাটতি আছে একদিন সেও সচেষ্ট হবে।

অকৃতকার্যতার ধারণা ও তার প্রয়োগ শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত থাকাকে ব্যাহত করছে। এটি ড্রপ আউট ও শিক্ষার নিম্ন পর্যায়ে শিক্ষা ভীতির একটি অন্যতম কারন।

● **স্ব উদ্যেগী হওয়ার পথে স্বাভাবিক সময় না পাওয়া :** শিক্ষার্থী সফল কিংবা ব্যার্থ হয় তার প্রচেষ্টার পরিপূর্ণ প্রয়োগ কিংবা ঘাটতির কারনে। একজন শিক্ষার্থী শিক্ষা জীবনের কোন পর্যায়ে এসে তার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টাটি নিজ থেকে প্রয়োগ করবে, সেটি শিক্ষার্থী থেকে শিক্ষার্থীতে পার্থক্যপূর্ণ হয়। কেননা এটি নির্ভর করে শিক্ষার্থীর নিজ থেকে লেখাপড়ার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারার ওপর। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট সময়ে বা বয়সে একই ধরণের কাজে বিশেষত লেখাপড়ায় সকলেই সমভবে সচেষ্ট হয় না। সে সময়টি পেরিয়ে স্ব উদ্যেগে চেষ্টায় নিয়োজিত হতে শিক্ষার্থীকে তার নিজের নিয়মে সময় দিতে হবে। এটিকেই 'স্বাভাবিক সময়' বলা হচ্ছে।

একই শ্রেণীতে পড়া সত্বেও স্ব উদ্যেগী হওয়ার এই স্বাভাবিক সময়টি নানাবিধ কারনে শিক্ষার্থী থেকে শিক্ষার্থীতে পার্থক্যপূর্ণ হয়। পরিবেশ, আর্থ সামাজিক অবস্থা, শারিরীক ও মানসিক অবস্থা, নানান বয়সী শিক্ষার্থীদের একই শ্রেনীতে ভর্তি হওয়া, কল্পনার জগতের পার্থক্যপূর্ণ বিস্তৃতি ইত্যাদি নানান বিষয় এর ওপর প্রভাব ফেলে। এ পার্থক্যের কারনে এক এক জন শিক্ষার্থী তার সম্পূর্ণ শিক্ষা জীবনের এক এক সময়ে এসে নিজের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টাটি প্রয়োগ করে। কেউ বিলম্বে করে।

যে বিলম্বে সচেষ্ট হয় সেই বিলম্বিত সময়টিই তার জন্য স্বাভাবিক সময়। একজনকে স্ব উদ্যেগী হওয়ার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নিয়মে তাকে স্বাভাবিক সময়ে

আসতে দিতে হবে। এখানে 'স্বাভাবিক নিয়ম' বলতে অকৃতকার্যতা বা কোনরূপ মন্দ গ্রেড আরোপ না করানোকে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু তার পূর্বেই একজনকে নিম্ন গ্রেডের কিংবা অকৃতকার্যরূপে চিহ্নিত করে নিচে নামিয়ে দিলে, সেটি তার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। পরবর্তীতে ভাল করার স্পৃহাকে নষ্ট করে দেয়। হতাশাগ্রস্ত করে। শিক্ষার্থীকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

● **সহপাঠিদের সাথে একই তালে এগিয়ে যাওয়ার পথে অন্তরায় :** এ ব্যবস্থা শিক্ষার্থীকে তার সহপাঠিদের থেকে তাকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে চিরদিনের জন্য নীচে নামিয়ে দেয়। ভূল শুধরিয়ে সহপাঠিদের সাথে সমান তালে ওপরে যাবার পথকে রুদ্ধ করে দেয়। ব্যবস্থা হিসেবে যেটি আশাব্যাঞ্জক নয়, হতাশাজনক।

শিক্ষক ও সহপাঠিদের কাছে শিক্ষার্থী করুণার পাত্রে পরিণত হয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে একজন শিক্ষার্থী নিজ ব্যাচের সাথে চলতে গিয়ে যে আনন্দ, স্বাচ্ছন্দ ও স্বাভাবিকতা নিয়ে বেড়ে ওঠে, পরবর্তী ব্যাচের সাথে সেটি করতে গিয়ে মানসিকভাবে পর্যুদস্ত হয়। স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়। লেখাপড়ার আনন্দ ও স্বাচ্ছন্দতা এতে বিনষ্ট হয়।

● **শিক্ষার্থীদের জীবন থেকে অনর্থক সময় কেড়ে নেয় :** জীবনের কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে কিছু নির্দিষ্ট বিষয় দ্বারা পরীক্ষার নামে যাদেরকে অকৃতকার্য বলা হয়, বস্তুত জীবনে তারাও কোন একদিন প্রতিষ্ঠা পায়। একটি নির্দিষ্ট সময়ে বা বয়সে অনেকেই সমভবে পড়া লেখায় সচেষ্ট হয় না। সে সময়টি পেরিয়ে চেষ্টায় নিয়োজিত হতে শিক্ষার্থীকে স্বাভাবিক সময় দিতে হবে। ভবিষ্যত জীবনে যখন নিজেদের দায়িত্ববোধ জাগ্রত হয়, তখন কেউই প্রচেষ্টাবিহীন থাকে না। নিজেদের ঘাটতি নিজেরা নিজ দায়িত্বে পুষিয়ে নিয়ে সামনে এগিয়ে চলে। ফলে দেখা যায়, শিক্ষা ব্যবস্থায় অকৃতকার্যতার ধারণা কার্যকরীকরণ- শিক্ষার্থীদের জীবন থেকে বছরের হিসেবে অনর্থক সময় কেড়ে নেয়।

চৌত্রিশ পেয়ে একজন ওপরের শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হল, তেত্রিশ পাওয়ায় একজনকে নীচে নেমে যেতে হল। এই একটি নাম্বারের ব্যবধানে একজনের জীবন থেকে একটি বছর কেড়ে নেয়া সঠিক বিবেচিত হয় না। কোন একদিন কোন একটি বিষয়ের কোন একটি প্রশ্নের না দেখে সঠিক উত্তর দিতে না পারার কারনে চিরদিনের মত প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষার্থীকে পিছিয়ে যেতে হবে। অথচ অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে তার জ্ঞান, বুদ্ধি, কর্মক্ষমতা, দক্ষতা, সমবয়সীদের সাথে

চলাফেরায় কোথাও কোন ঘটতি নেই। ঐ একটি প্রশ্নের উত্তর সে পরীক্ষা দেয়ার পরেও জেনে বা বুঝে নিতে পারে। জানা বা বুঝাটিই তো গুরুত্বপূর্ণ। নির্দিষ্ট সময়েই জানতে বা বুঝতে হবে সেটি গুরুত্বপূর্ণ নয়। অথচ তাকে সমবয়সীদের থেকে পিছিয়ে যেতে হবে সারা জীবনের জন্য। এ ব্যবস্থা জীবন থেকে অনর্থক সময় কেড়ে নেয়।

● **দায় :** শিক্ষা ব্যবস্থায় অকৃতকার্যতার ধারণা বিদ্যমান থাকার কারনে শিক্ষার্থীর জীবন থেকে বছর কেড়ে নেয়ার দায় শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর বর্তায়। শিক্ষা ব্যবস্থার এরূপ নিয়মের কারনে শিক্ষার্থীকে পিছিয়ে যেতে না হলে পরবর্তী বছরগুলিতে সে তার নিজের ঘাটতি পুষিয়ে নিয়ে ফলাফল ভাল করার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু বিদ্যমান ব্যবস্থা তাকে সে সুযোগ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করছে। যার দায় বর্তায় শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর। অথচ এটি থাকা উচিত শিক্ষার্থীর নিজের ওপর।

● **পিতা-মাতা বা অভিভাবকদের উপর মানসিক ও অর্থনৈতিক চাপ :** একজন শিক্ষার্থীকে অকৃতকার্য হওয়ার কারনে যখন একই শ্রেনীতে পুনর্বার থেকে যেতে হচ্ছে, তখন পিতা-মাতা বা অভিভাবককে একই শ্রেণীর পেছনে দ্বিতীয়বার ব্যায় বহন করতে হচ্ছে। এটি কখনও তিন থেকে চারবারেও পৌঁছে যায়। অভিভাবকদের জন্য এটি একটি বাড়তি মানসিক ও অর্থনৈতিক চাপ। অনেক পিতামাতার একত্রিত এ চাপ সামাজিক সমস্যারও সৃষ্টি করে। তাদের কর্মক্ষমতার ওপরও এটি নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

● **শিক্ষার্থীর ওপর মানসিক ও আচরণিক প্রভাব :** এ ব্যবস্থা একজন শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাসে আঘাত হানে। তাকে বেদনার্ত করে। তার সামাজিক মর্যাদাকেও ক্ষুন্ন করে। শিক্ষার্থীর মর্যাদা যখন একবার ক্ষুন্ন হয়ে যায়, আত্মবিশ্বাস যখন ভেঙ্গে পরে, তখন তার প্রতি সমাজের পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে সে খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করে। এতে তার নিজ চরিত্রে নেতিবাচক পরিবর্তন ঘটে। স্বকীয়তা নষ্ট হয়।

একই পড়া সুদীর্ঘ আরও এক বছর পড়তে হবে এ ভাবনা শিক্ষার্থীকে ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত ও হতাশাগ্রস্ত করে। এ ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর ধৈর্য্যচূতি ঘটে। এক বছরের এ ক্ষতি পুরণ করতে গিয়ে এমনকি জীবন থেকে তিন থেকে চার বছর সময়ও হারিয়ে যায়। এ ব্যবস্থা একজন শিক্ষার্থীকে যে আরও খারাপ ফলাফলের দিকে নিয়ে যাবে

না সে নিশ্চয়তাও নেই। কেবল খারাপ ফলাফলই নয়, খারাপ পথে নিয়ে যাবে না তারও নিশ্চয়তা নেই।

সব মিলিয়ে একজন শিক্ষার্থীকে শারীরিক, মানসিক ও সামাজিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। শিক্ষার্থীর ভবিষ্যত জীবনকে পিছিয়ে দিয়েও এ ব্যবস্থা তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

● **সামাজিক পর্যায়ে প্রভাব :** যে সব শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হয় তারা পরবর্তী বছরের জন্য বাড়তি বোঝা হয়ে দাড়ায়। পরের বছরের শিক্ষার্থীদের এদের কারনে সর্বক্ষেত্রে বাড়তি প্রতিযোগীতার মুখোমুখী হতে হয়। পরের বছরের শিক্ষার্থীদের প্রাপ্য সুবিধায় তারা অংশীদার হয়। যা শিক্ষা ব্যবস্থা ছাড়াও সমাজকে জটিলতায় ফেলে দেয়।

এ ব্যবস্থা সমাজে অকৃতকার্য কিশোর বয়সী সন্তানদের স্বাভাবিক আচরণকে ব্যাহত করার মধ্য দিয়ে নতুন এক বিকল্প আচরণের জন্ম দেয়ার উপায় সৃষ্টি করে। যা কোন এক সময় বড় আকারের সামাজিক সমস্যায় পরিণত হয়। বিষয়টি নিয়ে হয়তো আরও অনেক গবেষনা বা বিচার বিশ্লেষনের প্রয়োজন আছে। তবে এখানে এ বিষয়ে বেশী বিশ্লেষনে যেতে চাই না, কেননা এটি আরেকটি ভিন্ন প্রসংগ। মনোবিজ্ঞানীরা বিষয়টি নিয়ে গবেষনা করতে পারেন।

শিক্ষা জীবনের অকৃতকার্যতার কারনে যারা নিজেদের জীবনে মূল্যবান সময় থেকে বঞ্চিত হয়েছে, কোনদিন তারাও সমাজে প্রতিষ্ঠা পায়। তাহলে অকৃতকার্য করে রেখে জীবন থেকে বছর কেড়ে নেয়ার কি কারন থাকতে পারে? যে নিজে বঞ্চিত হয় সে অপরকেও বঞ্চনায় ফেলে। সমাজে এভাবে বঞ্চনা প্রসার লাভ করে। অনেক একক ব্যাক্তির একত্রিত বঞ্চনা বৃহৎ সামাজিক বঞ্চনার রূপ লাভ করে। যা পরবর্তী প্রজন্মের অগ্রগতিকে এসব ভূক্তভোগীদের নিরব ক্ষতের কারনে ব্যাহত করার সম্ভাবনা সৃষ্টি করে।

১.৫ পরীক্ষায় কৃতকার্যদের গ্রেড নির্ধারণ এবং তার নেতিবাচক দিকগুলি

পরীক্ষায় যে সব শিক্ষার্থী কৃতকার্য হয় তাদেরকে এ বি সি ডি ইত্যাদি রূপে গ্রেডিং করা হয়। এভাবে গ্রেডিং করার ইতিবাচক ফলাফলের পাশাপাশি বেশ কিছু নেতিবাচক দিকও রয়েছে। কোন সময়ে, কোন যুগে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে- সেসবকেও বিবেচনায় নিতে হবে। কেবল প্রচলিত একটি ব্যবস্থাকে যুগের পর যুগ

টেনে নিয়ে যাওয়াই কাজ নয়। নিচে এ ব্যবস্থার নেতিবাচক কিছু দিক তুলে ধরা হল।

- **চিরস্থায়ী লেবেলিং :** গ্রেডিং করার মধ্য দিয়ে এ ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে খারাপ বা বুদ্ধি কম, অমনযোগী, অপদার্থ, ফাঁকিবাজ ইত্যাদি নানান বিশেষনে নিম্ন গ্রেড প্রাপ্তদের বিশেষায়িত করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। পরীক্ষার ফলাফল যত ভালই হোক সকলে প্রথম হবে না। আবার যে যতই ভাল করুক আশিজন শিক্ষার্থী থাকলে একজনকে আশিতম হতেই হবে। অর্থাৎ সকলেই যোগ্য। কেবল আপেক্ষিক বিচারে কেউ পিছিয়ে।

যে শিশুটি তুলনামূলক বিচারে পিছিয়ে আছে, গ্রেডিং পদ্ধতি সামাজিক মস্তিষ্কে তার সম্পর্কে একটি নিচু ধারণা প্রবেশ করিয়ে দিচ্ছে। এ ব্যবস্থা একজন শিক্ষার্থীকে সারা জীবনের জন্য সমাজে একভাবে পরিচয় করিয়ে দেয়। সমাজ চিরকালই তেমন একজনকে মানসিকভাবে নিম্ন গ্রেডের ভেবে যেতে থাকে। অর্থাৎ গ্রেডিং পদ্ধতি একদিনের বিচার ব্যবস্থা দ্বারা গায়ে আজীবনের জন্য একটি সীল মেরে দেয়। এটি শিক্ষার্থীদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। পরবর্তীতে নিম্ন গ্রেড প্রাপ্তদের ভাল করার স্পৃহাকে নষ্ট করে। পরবর্তীতে তেমন একজন ভাল করলেও একবার একটি গ্রেড প্রাপ্তির কারনে সেটি পরবর্তী বিচার ব্যবস্থাকেও প্রভাবিত করে।

এ ব্যবস্থার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীকে মানুষ হিসেবে সারা জীবনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিকভাবে একটি নির্দিষ্ট লেবেলে ফেলে দেয়া হচ্ছে। তুলনামূলক ভাল বা মন্দ। এ লেবেলটি সমাজের মস্তিস্কে একজন ব্যাক্তি সম্পর্কে আজীবনের জন্য একটি ধারণা সৃষ্টি করে। যা একটি নির্দিষ্ট সময়ে, কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ের, কিছু নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর না দেখে লিখতে পারা না পারার সাথে সম্পর্কিত।

- **সম্ভাবনার অবারিত দুয়ারকে রুদ্ধ করে :** শিক্ষা ব্যবস্থা এমন এক ব্যবস্থা- যার সাথে সম্পৃক্ত থাকার কারনে একজন শিক্ষার্থী যে সাধারণ জ্ঞানটুকু অর্জন করে, নিজ প্রয়োজনে সেটিকে সে আরও শানিত করে নিতে পারে। এটি পারে সিস্টেমে অবস্থান করার কারনে। কিন্তু একজন শিক্ষার্থী জীবনের কোন পর্যায়ে এসে তার প্রয়োজনটুকু নিজ থেকে অনুভব করবে, সেটি শিক্ষার্থী থেকে শিক্ষার্থীতে নানান কারনে পার্থক্যপূর্ণ হয়। এ পার্থক্যের কারনে এক এক জন জীবনের এক এক সময়ে এসে নিজের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টাটি প্রয়োগ করে। একজনকে সে সময় পর্যন্ত

আসতে দিতে হবে স্বাভাবিক নিয়মে। স্বাভাবিক নিয়ম বলতে শিক্ষার্থী অকৃতকার্যতা বা নিম্ন গ্রেডের স্বাদ আস্বাদন করার পূর্ব অবস্থাকে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু তার পূর্বেই শিক্ষার্থীর গায়ে লেবেল লাগিয়ে দিলে সম্ভাবনার অবারিত দুয়ার রুদ্ধ হয়। কেননা লেবেল প্রথমত মানসিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। অতপর এটি নানাভাবে সামাজিক প্রতিবন্ধকতাও আরোপ করে। এটি পরবর্তী বিচার ব্যবস্থাকেও প্রভাবতি করে। অকৃতকার্যতার নামে নীচে নামিয়ে দিলে কোনদিনই সে ক্ষতি পুরণ হবার নয়। সমপাঠীদের থেকে চিরদিনের জন্য নিচে নেমে যেতে হবে। আবার নিম্ন গ্রেডে ফেলে দিলে সমাজে চিরকালের জন্য একটি লেবেল চেপে বসবে। যার প্রভাব কাটিয়ে ওঠা কঠিন হয়ে যায়। ফলে এ নিয়ম স্বাভাবিকভাবে শিক্ষার্থীর অগ্রগতির পথে অন্তরায় হয়ে কাজ করে।

নিম্ন গ্রেড প্রাপ্ত একজনকে ভাল কোথাও প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে দেয়া হয় না। নিম্ন গ্রেড প্রাপ্ত একজন শিক্ষার্থী কখনও নিজেকে যোগ্য করে গড়ে তোলার সংকল্প করতে পারে। অথচ এ ব্যবস্থা জীবনের শুরুতেই তাকে নানাবিধ সুযোগ গ্রহণের সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে দেয়। এক পরীক্ষায় যে নিম্ন গ্রেড পেয়েছে, আরেক পরীক্ষায় সে ভাল করবে না তার নিশ্চয়তা কি? এক পরীক্ষায় যে ভাল করেছে আরেক পরীক্ষায় সে মন্দ করবে না তারও বা নিশ্চয়তা কি? এ ব্যবস্থা ভবিষ্যত সম্ভাবনার অবারিত দুয়ারকে বাধাগ্রস্ত করে।

● **অপ্রয়োজনীয় ও অসুস্থ্য প্রতিযোগীতার সৃষ্টি করে :** এক সময় ভাবা হত এ ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিযোগীতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। সে সময়ের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে হয়তোবা সেটি সঠিক ছিল। কিন্তু এখন প্রয়োজনহীন। মানুষে-মানুষে, বন্ধুতে-বন্ধুতে, ভাইয়ে-ভাইয়ে আচরণে পরিবর্তন ঘটাতে এ ব্যবস্থা সহায়তা করছে। সমাজে প্রথমত মানসিক বৈষম্য সৃষ্টিতে এ ব্যবস্থা ভূমিকা রাখছে। অতপর এ বৈষম্য অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টিতেও পরবর্তীতে ভূমিকা রাখছে। বৈষম্য অনেক অঘটনের মূল।

● **কোচিং এবং অর্থনৈতিক নেতিবাচক প্রভাব :** পরীক্ষার মাধ্যমে ভাল-মন্দ সৃষ্টির গ্রেডিং ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাসকে প্রথমে ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। অতপর কোচিং এর মাধ্যমে সফলতার নিশ্চয়তা দেয়। এতে কোচিং এর প্রয়োজনীয়তা প্রতিষ্ঠা পায়। এগুলি শিক্ষা নিয়ে ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টি করে। কিছুটা দুর্বল আত্মবিশ্বাস সম্পন্ন অভিভাবকগন এগুলিতে বিচলিত হয়। তারা সন্তানের

ভাল করার জন্য কোচিং করাতে ছুটে। যারা কোচিং এ অংশ নেয় তারা ভাল করে। এখানেও যোগ-সাজশ থাকা অস্বাভাবিক নয়। তাদের কারনে আত্মবিশ্বাসী শিক্ষার্থীদের অভিবাবকদেরও সে পথে বাধ্য হয়ে গমন করতে হয়। নইলে যোগ-সাজশের কারনে সন্তান ভাল হওয়া সত্বেও নানান সূক্ষাতিসূক্ষ অজুহাতে তাদের ফলাফল কোচিং এ অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের তুলনায় মন্দ হতে পারে। অভিভাবকদের মনে এসব ভয় কাজ করে। এভাবে কোচিং এর প্রয়োজনীয়তা প্রতিষ্ঠা পায়। সমাজে যে নিয়ম একবার প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়, তাকে পাশ কাটিয়ে দু-একজন নিজের মত চলতে পারে না। তাদেরও বাধ্য হয়ে গড্ডালিকায় গা ভাসাতে হয়। অর্থনৈতিক ক্ষতির মুখোমুখী হয় অভিভাবকেরা। যদিও একই সাথে এর একটি অর্থনৈতিক ইতিবাচক ফলাফলও রয়েছে। কোচিং প্রতিষ্ঠান ও এর সাথে সংশ্লিষ্টরা লাভবান হয়।

একজন দশ বিষয়ে কোচিং করছে আরেকজনের একটি কোচিং করার সামর্থ নেই। দুজনের মধ্যে সমতার ভিত্তিতে পরীক্ষা হয় কিভাবে? সেক্ষেত্রে পরীক্ষা না নিয়ে বরং কোচিং প্রতিষ্ঠান থেকে কে কতটি বিষয়ে কোচিং করেছে সে সনদ নিয়ে গ্রেডিং করে দিলেই তো হল। শিক্ষায় ভাল গ্রেডিং প্রাপ্তি আর্থিক সামর্থের সাথে ভীষনভাবে সম্পৃক্ত হয়ে পরেছে। গ্রেডিং ব্যবস্থার কারনে এসবগুলি গুরুত্ব লাভ করছে।

- **অনৈতিক আচরণের প্রসার :** গ্রেডিং এর কারনে সামাজিক মানসিক থেকে শুরু করে বাস্তবিক কিছু বাড়তি সুবিধা প্রাপ্তি হয় বিধায় কিছু মানুষ কাগজের পেছনে ছুটছে। ফলে সত্যিকারের ভাল কাজ কমে আসছে। ভাল কাজ করার পরিবর্তে দুষ্ট বুদ্ধি দিয়ে কাগজ সংগ্রহের চেষ্টায় প্রতিযোগীতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কিছু কিছু শিক্ষক এবং কোচিং সেন্টারগুলি গোগ্রাসে যেভাবে অর্থ গিলছে, অভিভাবকদের নাভিশ্বাস দেখে সন্তানেরাও উপলব্ধি করতে পারছে যে, বর্তমানে শিক্ষার সাথে জ্ঞান অর্জনের সম্পর্ক কম। শিক্ষা ব্যবস্থা অর্থকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। জ্ঞান বা সৃষ্টিশীলতাকে কেন্দ্র করে নয়। শিক্ষার্থীরাও তাই এখন অর্থের বিনিময়ে ফলাফল ক্রয়ের বিষয়টিতে অধীক আগ্রহী। তারই নমুনা হচ্ছে প্রশ্নপত্র ক্রয়-বিক্রয়ের নামে ব্যবসার আরও একটি নতুন শাখার সৃষ্টি।

- **শিক্ষার্থীর ওপর মানসিক ও আচরণিক প্রভাব :** গ্রেডিং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সন্তানদের ভাল বা মন্দরূপে চিহ্নিত করে দেয়। এতে তুলনামূলক মন্দ গ্রেড প্রাপ্ত

একজন শিক্ষার্থী নিজেকে মন্দ ভাবতে শেখে। আত্মবিশ্বাসহীন হতে থাকে। না পারার বিশ্বাস জন্মাতে থাকে। লেখাপড়ায় আগ্রহ কমতে থাকে। অতপর ইংরেজী কঠিন মনে হতে শুরু করে। অংক কঠিন মনে হতে শুরু করে। ধারণা করে তার দ্বারা অমুকের মত হওয়া কোনদিনই সম্ভব না। 'ডি' গ্রেড প্রাপ্ত একজনকে 'এ' গ্রেডে যেতে মানসিকভাবে বাধাগ্রস্থ করে। হাল ছেড়ে দিতে শেখায়। সিষ্টেম শিক্ষার্থীকে লেখাপড়ায় নিরুৎসাহিত হতে উৎসাহিত করে।

গ্রেডিং পদ্ধতি কিছু শিক্ষার্থীদের জীবনের শুরুতেরই মেরুদন্ড সোজা করে দাড়াবার পূর্বেই সেটি ভেঙ্গে দিয়ে তাদের ক্ষতিগ্রস্ত করে। নিজের ক্ষতি নিজের পুষিয়ে নেয়ার মানসিক প্রস্তুতি নেবার পূর্বেই একজনকে ভাল-মন্দের সীল দিয়ে হতাশাগ্রস্ত করে।

এ ব্যবস্থা একজনের মধ্যে অহম প্রবেশ করিয়ে দেয়। আবার অপরজনকে আত্মবিশ্বাসহীন করে। গতদিন যে সমান ছিল আজ পার্থক্য সৃষ্টি হয়। মানুষে-মানুষে, বন্ধুতে-বন্ধুতে, ভাইয়ে-ভাইয়ে আচরণে পরিবর্তন ঘটাতে এ ব্যবস্থা সহায়তা করে।

● **সামাজিক নেতিবাচক প্রভাব :** এ ব্যবস্থা সমবয়সি সহপাঠির কাছে একজন শিক্ষার্থীকে মানসিকভাবে ছোট করে দেয়। তার সামাজিক মর্যাদা ক্ষুন্ন করে। সন্তানদের ভাল মন্দ নানান গ্রুপে বিভক্ত করে। শিক্ষা ব্যবস্থার এ নিয়ম অনেকের ভেতর ক্ষোভের সঞ্চার করে। ভেতরের ক্ষোভ আচরণকে পরিবর্তন করে। রুক্ষতা ও দুর্ব্যবহারের জন্ম দেয়। মানুষ বিষয়গুলি প্রকাশ করে না, কিন্তু ভেতরে এগুলি কাজ করে। শব্দহীন শব্দকে অনুধাবন করতে হবে। এভাবে অনেক জীবন নষ্ট হওয়ার পথে ধাবিত হয়। সামাজিক জীবনে এসবের মন্দ ফলাফল আছে।

দুটো সন্তানই ভাল হয়ে জন্ম নিয়েছে। অথচ গ্রেডিং একজনকে ভাল আবার একজনকে মন্দভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠা করছে। ফলস্বরূপ মন্দ চিহ্নিত কিছু শিক্ষার্থী মন্দ পথে পা বাড়ায়। এটি অনেক বড় ক্ষতি। গ্রেডিং পদ্ধতি আমাদের সন্তানদের ভাল-মন্দ এভাবে চিহ্নিত ও অভিহীত করার ফলে কেউ কেউ ধরেই নেয় যে সে খারাপ। এটি তার প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি। এটি মনের ওপর ভীষনভাবে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ধীরে ধীরে মন্দ গ্রেড প্রাপ্ত শিক্ষার্থী খারাপের দলে ভীড়তে থাকে। এভাবে চিহ্নিতকরণ করা না হলে কেউই হয়তো নিজেকে বা তার সন্তানকে মন্দ শিক্ষার্থী, খারাপ ছেলে এভাবে ভাবতে শিখত না। শিক্ষার্থী নিজেও পরবর্তীতে

ভাল করার চেষ্টা করত। কিন্তু এ ব্যবস্থা অনেকের ভবিষ্যত প্রত্যাশা ও আত্মবিশ্বাসকে নষ্ট করছে। নিজেকে নিজের ছোট ভাবতে শেখাচ্ছে। নিজেকে অসন্মান করতে শিক্ষা দিচ্ছে। তার সাথে যোগ হচ্ছে সমাজের কিছু মানুষের কটাক্ষ। সব মিলিয়ে অনেক শিক্ষার্থী ভূল পথে চলে যায়। মানসিক, আচরনিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এসবের অবশ্যই নেতিবাচক প্রভাব আছে।

শিক্ষার লক্ষ্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসকে গড়ে উঠতে সহায়তা করা। তা ভেঙ্গে দেয়া নয়। যাদের বিশ্বাস জীবনে প্রথমবার মন্দ গ্রেড প্রাপ্তির কারনে ভেঙ্গেই চলেছে এবং গা সয়ে গেছে, তাদের তিলে তিলে ভেতরে নিঃশেষ করে দিতে এ ব্যবস্থা ভূমিকা রাখে। সহপাঠি থেকে এ ব্যবস্থা শিক্ষার্থীকে সন্তর্পনে মানসিকভাবে দুরে সরিয়ে দেয়। সে দেখতে পায় এ ব্যবধান আর মিটবার নয়। লেখাপড়ায় অমনযোগী হয়ে বিকল্প পথে মনযোগী হয়। সাধারণ সকল কাজে-কর্মে, জ্ঞানে-বুদ্ধিতে সমান হওয়া সত্বেও শিক্ষা ব্যবস্থা তাকে সমাজে তুলনামূলক মন্দরূপে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। এভাবে সম্ভাবনাময় অনেকে বিকল্প মন্দ পথে বা কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। গোটা সমাজে যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

- **সহজাত ও মানবিক গুণাবলীর ক্ষতিগ্রস্ততা :** শিক্ষার্থীদের একেক জনের একেক রকমের সহজাত ভাল গুণাগুণ থাকে। প্রচলিত ব্যবস্থায় সেগুলি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি পায় না। কেননা এখানে নাম্বারের প্রাধান্য বেশী। মুখস্তের প্রাধান্য। এর ফলে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রবেশ করে কিছু অর্জনের পূর্বেই নিজ গুণাগুণ বিসর্জন দেয়। এ ব্যবস্থায় ধীরে ধীরে নিজেদের সহজাত ও মানবিক গুণগুলি মৃত্যুবরণ করতে থাকে। সমাজ সহজাতভাবে অনেক ভাল গুণের অধিকারী সদস্যদের হারায়। এক একটি ব্যাক্তি শিক্ষার্থী থেকে বহু শিক্ষার্থীর ক্ষতিগ্রস্ততার মধ্য দিয়ে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর ভীষন নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে, যা নিয়ে পৃথকভাবে বই লেখা যেতে পারে।

একজন ছবি আঁকতে ভালবাসে। তাকে পরীক্ষায় ভাল করাতে হবে। তার সহজাত আকর্ষন থেকে বিচ্ছিন্ন করে অনেকটা বলপূর্বক পরীক্ষায় ভাল করাবার জন্য চাপ দেয়া হচ্ছে। একজনের স্বাভাবিক গুণকে আমরা আমাদের সৃষ্ট সিষ্টেমের মাধ্যমে স্বীকৃতি দিতে কার্পন্য করার মধ্য দিয়ে বলা যেতে পারে হত্যা করছি।

প্রতিটি মানুষ নিজেকে নিজের স্থানে ছোট মনে করে না। কিন্তু এ ব্যবস্থা বলপূর্বক একজনকে তার নিজেকে মন্দ ভাবতে বাধ্য করে। অনেকে সহজাতভাবে

পরোপকারী হয়। অন্যের বিপদে এগিয়ে আসে। সেগুলিও জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় গুণাগুণ। কিন্তু পরীক্ষা সে সব গুণকে বিবেচনায় নিতে পারে না। ফলে সকলেই ভাল গ্রেড অর্জনের পিছে ছুটতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে মানবিক গুণাবলী নষ্ট হতে থাকে। পরীক্ষায় অকৃতকার্যতা বা গ্রেডিং এর নামে তেমন গুণসম্পন্ন মানুষকে অবমূল্যায়ন করে নিঃশেষ করে দেয়া হয়। এ বয়সের শিশুদের স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠার ক্ষেত্রে এসবগুলি প্রচন্ড চাপ। এ চাপ প্রয়োগ হচ্ছে বিদ্যমান ব্যবস্থার কারনে। লেখাপড়ার এই একটি দিক বাদ দিলে সব দিক থেকেই একজন শিক্ষার্থী যথেষ্ট ভাল। সহপাঠিদের সমতুল্য। কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থা একটি দিকের বিবেচনায় শিক্ষার্থীদের সমাজে ভাল মন্দরূপে পরিচিত করিয়ে দিচ্ছে। এতে শিক্ষার্থীর সহজাত প্রবণতা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে সে সর্বাধিক আনন্দের সাথে সমাজে অবদান রাখতে পারে সেটি।

জীবনের সফলতা-বিফলতা কেবলমাত্র একটি বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়ার কারনে শিক্ষার্থীদের অনেক ভাল মানবিক গুণাবলী এভাবে হারিয়ে যাচ্ছে, কিংবা পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারছে না।

মৃত-প্রাণ নিয়ে শিক্ষার্থীরা বুঝতে শেখে যে, যে কোন প্রকারে বড় বড় সনদ আর ডিগ্রী নিতে হবে। বহু বেতনের চাকুরী পেতে হবে। তবেই সবাই সন্মান দেবে। ভালবাসবে।

অর্থ প্রবাহের সামগ্রীক ব্যবস্থাপনার ত্রুটিও এসবের জন্য দায়ী। অর্থ ব্যবস্থা সমাজে একজনকে দেড় লক্ষ টাকা দিয়ে একটি শাড়ি কিনতে উৎসাহিত করছে, কিন্তু একটি ভাল বই বিনে পয়সায় কিভাবে নেয়া যায় সে ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করছে। প্রচার-প্রচারণায় আবার ভাল বইকে মন্দ এবং মন্দ বইকে ভালরূপে তুলে ধরছে। কেবল শিক্ষা ক্ষেত্রে নয়, সর্বত্র অনৈতিকতা প্রবেশ করেছে। কিন্তু ত্রাস সৃষ্টিকারীদের জন্য সেটিকেও দমন করা যাচ্ছে না। ভাল মানুষদের মধ্যে প্রচন্ড বিভাজন। এগুলি আবার ভিন্ন প্রসঙ্গ।

গ্রেডিং নামের এ ব্যাবস্থা কেবল অধিক বেতনের চাকুরির প্রলোভন ছাড়া আর কিছুই দেয় না। সত্যিকার অর্থে চাকুরির অর্জিত সে বেতনও মানব কল্যানে কোন কাজে আসে না। অনেক সময় পরিবারেরও কোন কাজে লাগে না। উল্টো মানুষে মানুষে, বন্ধুতে বন্ধুতে, ভাইয়ে ভাইয়ে সম্পর্কের অবনতি ঘটায়। অহম বোধের সৃষ্টি করে। এভাবে একটি পৃথক পড়ুয়া বা তথাকথিত ভাল ছেলে বা স্বার্থপর গোষ্ঠী

সৃষ্টি করা হয়। যারা প্রকৃত অর্থে অন্যের স্বার্থ সংরক্ষণে নিজেদেরকে নিয়োজিতকরণের বিনিময়ে অধিক অর্থ লাভ করে। আর এ যোগ্যতার জন্য লেখাপড়া আদৌ গুরুত্বপূর্ণ নয়। রাজনৈতিক পরিচয়ই বড়।

- **শিক্ষকদের ওপর প্রভাব :** এ ব্যবস্থা অনেক শিক্ষককে স্বৈরাচারের মত আচরণ এবং কখনও অনৈতিক সুবিধা নেয়ার পথ করে দেয়।

১.৬ কেন্দ্রীয়ভাবে অনুষ্ঠিত পরীক্ষাসমুহ ও বাস্তবতা

পিইসি, জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পর্যায়ের পরীক্ষাগুলি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হয়। এগুলির পেছনে সময়, অর্থ ও প্রচুর শ্রম ব্যায় হয়। রয়েছে ঝুঁকি। এমনকি জীবনের ঝুঁকি। এসব পরীক্ষায় কেন্দ্রীয়ভাবে প্রশ্নপত্র তৈরী করা হয়। সে প্রশ্ন সর্বত্র প্রেরণ করতে হয়। প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে গোয়েন্দা নজরদাড়ির ব্যবস্থা রাখতে হয়। ব্যাস্ততার অন্ত নেই।

পরীক্ষা সমুহের কেন্দ্র পরিবর্তনের নামে দেশব্যাপি শিক্ষার্থীদের ছুটোছুটি শুরু হয়। মানুষের অহেতুক দুর্দশাকে বিবেচনায় নেয়া হয় না। সম্পূর্ন দেশটা তো আর ঢাকা শহরের মত নয়। গ্রামে, গঞ্জে, চরাঞ্চলে বৃষ্টিতে, কাঁদায় দুরত্ব পেরিয়ে, গ্রামের শিশুদের হাইওয়ের রাস্তা দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলাচল, শিশু ও অভিভাবকদের ছুটোছুটি, শহরে ট্রাফিক জ্যাম, মূল্যবান সময়, অর্থের অপচয়, চলার খরচ, থাকার খরচ, খাওয়ার বাড়তি খরচ করতে হয়।

এত ঘটা করে এতসব কর্মকান্ড সংঘটনের উদ্দ্যেশ্য কি? এতসব কর্মকান্ডের মাধ্যমে আমরা আসলে কি অর্জন করতে চাই? এতসব কর্মকান্ডের মাধ্যমে যা অর্জন করার চেষ্টা করা হয়, বলা যায় তার সারমর্ম হল-



- সকল শিক্ষার্থীদেরকে একটি সম প্রমিতমানে যাচাইকরণ এবং
- যাচাইকরণ প্রক্রিয়ায় নকল বা অসদুপায় অবলম্বন প্রতিরোধকরণ। দুটি বিষয় নিয়ে নীচে সামান্য আলোচনা করা হল।

● **সম প্রমিতমানে যাচাইকরণ :** শিক্ষার আপাত ও সূদুরপ্রসারী লক্ষ্য ওপরে উল্লেখ করেছি। সকল শিক্ষার্থীদের সম প্রমিতমানে বা একই মানদন্ডে যাচাই করে কি করা হবে? শিক্ষার প্রাথমিক, মাধ্যমিক এমন কি উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে এসবের খুব একটা প্রয়োজন আছে কি? বিষয়গুলি নিয়ে ভাবতে হবে।

পরীক্ষার এতসব আয়োজন করতে গিয়ে সাময়িক শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের মধ্যে একটি জাগরণ সৃষ্টি হয় এটি সঠিক। কোচিং এর হিড়িক পড়ে যায়। কিন্তু সেই তো একই বই! আর যারা যাচাই করবে তারা তো সেই একই শিক্ষক! কেবল অদল-বদল করে দেয়া। এটি করতে চাইলে শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ বিদ্যালয়ে রেখেই করা যায়। এই অদল-বদল করে সকলকে একই মানে যাচাই করে আমরা কি এর থেকে খুব বেশী বা আহামরি ভিন্ন কিছু অর্জন করি? এ পর্যায়ে এত আয়োজন করে নেয়া পরীক্ষার ফলাফল কর্মজীবনে সম্পৃক্ত হওয়ার সাথে খুব বেশী সম্পৃক্ত নয়। কর্ম জীবনে ভাল বা দক্ষ মানের কর্মী পাওয়ার জন্য শিক্ষার এত ধাপে, এত পরীক্ষার আদৌ কি কোন প্রয়োজনীয়তা আছে? যাচাই বাছাইকরণ প্রক্রিয়াটি শিক্ষার কোন স্তর থেকে করা হবে, সে বিষয়টি নিয়েও ভাবতে হবে।

● **নকল প্রতিরোধ :** প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ভাবনার বিষয়টি হচ্ছে দেশব্যাপি সকল শিক্ষার্থীদের সম প্রমিতমানে যাচাইকরণের বাস্তবে কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কি না। যদি থাকে তবে সেটি কেন্দ্র বদল করে করা হবে, নাকি নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রেখে করা হবে- সে বিষয়টিও বিবেচনা করতে হবে। কেন্দ্র বদলের প্রশ্ন আসে সম্ভাব্য নকল প্রতিরোধের চিন্তা থেকে। কেবল নকল প্রতিরোধের জন্য ঘটা করে এত আয়োজন কি আদৌ প্রয়োজন আছে? নকল প্রতিরোধ করে আমরা কি পাব? এ পর্যায়ে একজন শিক্ষার্থী নকল করলেওবা রাষ্ট্র তাতে কতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হবে? এ পর্যায়ে নকল প্রতিরোধ করে আমরা কি অর্জন করব? খারাপ শিক্ষার্থীদের ওপরে ওঠা প্রতিরোধ করব? তথাকথিত খারাপদের ওপরে ওঠা প্রতিরোধ করে কি অর্জন হবে? কিছু শিক্ষার্থীকে অকৃতকার্য ঘোষনা করব? তাতে লাভ? যেসব সাধারণ মানের শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হয় তাদেরও তো জীবনে কোন কর্ম করে, খেয়ে-পড়ে সন্তান-সন্ততি নিয়ে বাঁচতে হবে। জীবনে তারাও তো কিছু না কিছু করবে এবং করে জীবন চালাবে। এই কৃতকার্যতা অকৃতকার্যতা সাধারণদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়। যারা অকৃতকার্য হয়, ধরে নেয়া যায় যে তারা সাধারণের মধ্যে পরে। আর

যারা নিজ মেধা দিয়ে অনেক অনেক ওপরে যাবে, তারা সব ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই যাবে। অকৃতকার্য চিহ্নিত করে কিছু সাধারণ ছেলেমেয়েদের পিছিয়ে দিয়ে বরং সমাজের ক্ষতিই সাধন করা হয়। অকৃতকার্যতার নেতিবাচক দিকগুলি ওপরে সংক্ষেপে তুলে ধরেছি। নিচে আরও কিছু আলোচনা করার ইচ্ছে রয়েছে। সময়ের প্রয়োজনে বিষয়গুলি নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে।

যে নকল করে সে নকল করে লিখতে গিয়ে কিছু শিখতে বাধ্য হয়। যে বাধ্যটুকু পিতামাতা এমনকি শিক্ষকও তাকে দিয়ে সারা বছর করাতে পারে না। না দেখে মুখস্ত লিখতে পারার বিষয়টি তো গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে শিক্ষার্থী কিছু জানতে ও শিখতে পারল কিনা সে বিষয়টি। বরং বই দেখে শিক্ষার্থীদের লিখতে দিলে শিক্ষার্থীরা অনেক কিছু এ তিন ঘন্টায় শিখতে পারত। এমনকি অমনযোগী শিক্ষার্থীদের অনেকের মধ্যে অনেক বিষয়ে জানার আগ্রহ সৃষ্টি হত বই দেখে লিখতে গিয়ে।

সম মানদন্ডে সকলকে যাচাই এবং ঐটুকু নকল প্রতিরোধ করতে গিয়ে কি দুর্বিসহ যন্ত্রনাকে বরণ করতে হয়। জীবনে অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি নিতে হয়। বরং তাদের বই দেখে লিখতে দিলেও তিন ঘন্টায় তারা জীবনে অনেক কিছু জানতে ও শিখতে সক্ষম হত। এতদ্বসত্বেও যদি এ ব্যাবস্থায় পরীক্ষা নিতেই হয় তো লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী ও অভিভাবককে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে না নিয়ে, বরং শত শত শিক্ষককে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে পরীক্ষার ডিউটি প্রদান করলে ভাল হত। যদিও এ লেখা তেমন বিকল্প ভাবনাকেও প্রস্তাবাকারে তুলে ধরতে চাইছে না।

নকল প্রতিরোধের এ ব্যবস্থা- কোমলমতি শিশুদেরকে নকল করা বলে একটি বিষয় আছে, তাকে সে বিষয়টি সম্পর্কে অধিকতর সচেতন করে তোলে। সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য আমরা যেমন দিবস পালন করি, তেমনি এ দিবসগুলিতে শিশুরা শেখে নকল বলে একটি চমৎকার বিষয় আছে। বুদ্ধি খাটালে যা করা সম্ভব। বড় হলে আরও বড় ও বেশী বুদ্ধি প্রয়োগ করার বিষয়টি তাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে। এগুলি হল সরল পথ থেকে বিচ্যূতি। অথচ শিক্ষার্থীদের সামনে এ শব্দটি উচ্চারণ না করার অভ্যাস গড়ে তোলা এবং এমন বিষয়টিকে স্বীকার না করা শ্রেয়।

ছোট ছোট শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় এমনভাবে ঘটা করে নকল প্রতিরোধের ব্যবস্থা না করে বরং শ্রেনীকক্ষ থেকেই তাদেরকে জানানো প্রয়োজন যে, দেশে ঘুষ-দূর্নীতি নেই, এখানে কেউ আমানতের টাকা তছরূপ করে না, ষড়যন্ত্র করে কেউ অন্যের স্থান দখল করে নেয় না ইত্যাদি ইত্যাদি। আর যদি বাস্তবে এ কথাগুলি মিথ্যেই হয়, তবে ঘটা করে শিক্ষার এ পর্যায়ে নকল প্রতিরোধের প্রয়োজনীয়তা কি? এটি তো টেকসই (Sustainable) হবে না! বড় হয়ে সে এটিকে নিশ্চিত ধরে রাখতে পারবে না!

নকল প্রতিরোধের নামে যা করা হয় তা সত্ত্বেও নকল হয়। পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে যে এত খরচ, শ্রম ইত্যাদির বিনিময়ে জাতি কিছুই অর্জন করে না। হয়তো নকল করে লিখতে দিলেও জাতি কিছু অর্জন করতে পারত। তাছাড়া নকল করেও মানুষ বড় হয়ে বড় বড় দায়িত্ব পালন করছে। নকল করা না করা ও প্রতিরোধ করা আদৌ গুরুত্বপূর্ণ নয়।

নকল প্রতিরোধ করার মাধ্যমে তথাকথিত মন্দ কিছু শিক্ষার্থীদের পরবর্তী ধাপে উত্তীর্ণ হওয়াকে প্রতিরোধ করা হবে। কিছু অকৃতকার্য হবে। তাদের একই শ্রেণীতে পুনর্বার থাকতে হবে। যারা উত্তীর্ণ হবে তাদের এ বি সি ডি গ্রেডিং করা হবে। এসবের নেতিবাচক দিকগুলি ওপরে সংক্ষেপে তুলে ধরেছি। নিচে আরও কিছু আলোচনা করার ইচ্ছে রয়েছে।

অপ্রয়োজনীয় এসব কাজ জীবনকে কেবল দুর্বিসহ করে। এগুলির প্রয়োজনীয়তা নেই। কিন্তু যাদের অর্থনৈতিক জীবন এ কাজগুলির সাথে জড়িয়ে গেছে, তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য এসবের প্রয়োজনীয়তা আছে। তাদের বিপদাপন্ন না করে বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজতে হবে।

দ্বিতীয় পর্ব

প্রস্তাবনা

২.১ প্রাইমারী ও জুনিয়র পর্যায়

● **শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ততাকে ধরে রাখা :** প্রাইমারী ও জুনিয়র পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য অনেক বেশী পারফেকশনের প্রয়োজন নেই। এ পর্যায়ে সাধারণ বা গড় মানের শিক্ষার্থী ও মেধাবী শিক্ষার্থী চিহ্নিতকরণের চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত রাখা। অর্থাৎ শিক্ষর্থীদেরকে শিক্ষার চৌহদ্দীর মধ্যে ধরে রাখা। যেন ঝড়ে না পড়ে। শিক্ষায় অনাগ্রহী হয়ে না যায়। শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে তাকে সম্পৃক্ত রাখা সম্ভব হলে একদিন সে সফল হবেই। ব্যবস্থা এমন হতে হবে যেন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে ধরে রাখা যায়।

● **স্ব-উদ্যেগী হওয়ার স্বাভাবিক সময় দেয়া :** একজন শিক্ষার্থীর যখন নিজের দায়িত্ববোধ জাগ্রত হয়, শিক্ষার গুরুত্ব যখন নিজেই অনুধাবন করতে শেখে তখন সে নিজেই সচেষ্ট হয়। নিজের অবহেলাজনিত পূর্বতন ঘাটতি নিজ দায়িত্বে পুষিয়ে নিয়ে সামনে এগিয়ে চলে। শিক্ষা জীবনে তাই স্বাভাবিক নিয়মে শিক্ষার্থীকে স্ব-উদ্যেগী হতে স্বাভাবিক সময় প্রদান করতে হবে। ব্যবস্থা এমন হতে হবে- যেন একজন শিক্ষার্থী নিয়মের বেড়াজালে পড়ে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত না হয়।

● **চিরস্থায়ী লেবেলিং :** পরীক্ষার ফলাফল যত ভালই হোক সকলে প্রথম হবে না। আবার যে যত ভাল করুক আশিজন শিক্ষার্থী থাকলে একজনকে আশিতম হতেই হবে। ভাল-মন্দ সময়ের প্রেক্ষিতে একটি আপেক্ষিক বিষয়। আজ কোন কারনে যে ভাল করছে না আগামীতে সে ভাল করতে পারে। আবার আজ যে ভাল করেছে কাল তারও মন্দ করার সম্ভাবনা আছে। জীবনের কোন এক সময়ে নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের প্রেক্ষিতে বিচার করে মানুষ হিসেবে একজনকে চিরস্থায়ীভাবে সমাজে ভাল-মন্দরূপে চিহ্নিতকরণের নিয়ম পরিবর্তীত হতে হবে।

● **সম্ভাবনার দুয়ারকে অবারিত রাখা :** শ্রেণীকক্ষে যে পড়াটি আজ পড়ানো হয়েছে আজই তার পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে না। শিক্ষার্থী এর জন্য একটি বছর সময় পাচ্ছে। এর মধ্যে তাকে অকৃতকার্যরূপে চিহ্নিতকরণ বা কোনরূপ গ্রেডিং আরোপ করা

হচ্ছে না। ফলে মানসিকভাবে কোনরূপ বিপর্যস্ততা ছাড়াই বছর ব্যাপি তার ভাল করার সম্ভাবনা থাকছে। ঠিক একইভাবে একজনকে দশম বা একাদশ শ্রেনী পর্যন্ত সময় পেতে বা দিতে হবে স্ব-উদ্যেগী হওয়ার। জীবনের কোন পর্যায়ে কোন শিক্ষার্থীকে নিয়মের বেড়াজালে আটকে ফেলা যাবে না। শিক্ষার্থীর ভাল করার সম্ভাবনার দুয়ার সকল সময়ের জন্য সমভাবে অবারিত থাকতে দিতে হবে।

● **কোচিং :** পরীক্ষায় অকৃতকার্যতা বা গ্রেডিং এর নিয়ম বজায় থাকার কারনে কোচিং এর সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। ব্যবস্থা এমন হতে হবে যেন কোচিং করাবার প্রয়োজনীয়তা না থাকে। শিক্ষার্থীরা আনন্দের সাথে সহজেই লেখাপড়ার বিষয়গুলি বুঝতে পারে।

● **জীবন থেকে অনর্থক সময় কেড়ে না নেয়া :** জীবনের কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষার নামে যাদের অকৃতকার্য বলা হয় বস্তুত জীবনে তারাও কোন একদিন প্রতিষ্ঠা পায়। একটি নির্দিষ্ট সময়ে বা বয়সে অনেকেই সমভবে লেখা-পড়ায় সচেষ্ট হয় না। সে সময়টি পেরিয়ে চেষ্টায় নিয়োজিত হতে শিক্ষার্থীকে স্বাভাবিক সময় দিতে হবে। ভবিষ্যত জীবনে যখন নিজেদের দায়িত্ববোধ জাগ্রত হবে তখন কেউই প্রচেষ্টাবিহীন থাকবে না। নিজেদের ঘাটতি নিজেরা নিজ দায়িত্বে পুষিয়ে নিয়ে সামনে এগিয়ে যাবে। শিক্ষা ব্যবস্থায় অকৃতকার্যতার ধারণা বিদ্যমান থাকায় শিক্ষার্থীদের জীবন থেকে অনর্থক সময় অপচয় হয়।

তেত্রিশ পেলে কৃতকার্য বত্রিশ পেলে অকৃতকার্য। ব্যবস্থাটি ন্যায় সম্মত প্রতীয়মান হয় না। তেত্রিশ-বত্রিশ এখানে মূল বিষয় নয়। মূল বিষয়টি হচ্ছে যা বলতে বা বোঝাতে চাচ্ছি সেটি। এ ক্ষতি শিক্ষার্থীকে পরবর্তী ধাপে এগিয়ে নিয়ে গিয়েও পুষিয়ে নেয়া সম্ভব। অকৃতকার্যতার বিষয়টি ধারণাগত একটি আপেক্ষিক বিষয়। এটিকে গ্রহণ করে নিলে অনেক কিছু, আবার গ্রহণ না করলে বা না করতে জানলে কিছুই না। অন্তত একটি পর্যায় পর্যন্ত এটিকে গ্রহণ না করায় বড় রকমের কোন সমস্যা নেই। অর্থাৎ প্রাইমারী ও জুনিয়র এমন কি মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত। সে বিষয়টিই এ লেখায় গুরুত্বের সাথে তুলে ধরতে চাইছি। ব্যবস্থা এমন হতে হবে যেন জীবন থেকে সময়ের অপচয় না হয়।

● **সহপাঠিদের সাথে একই তালে এগিয়ে যাওয়ার পথ উন্মুক্ত রাখা :** কাউকে অকৃতকার্য ঘোষনা করে সহপাঠিদের থেকে নীচে নামিয়ে না দিয়ে সামনে এগুতে দিলে শিক্ষার্থী এক সময় নিজ প্রচেষ্টায় নিজ ঘাটতি পুরণ করে ভাল করবে,

বিষয়টিকে সেভাবেও ভাবা যেতে পারে। ব্যবস্থা এমন হতে হবে যেন সহপাঠিরা সকলেই একই সাথে সমমর্যাদা নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে।

● **মানসিক, আচরণিক ও সামাজিক মন্দ প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা :** শিক্ষা ব্যবস্থা এমন হতে হবে যেন একজন শিক্ষার্থীর সামাজিক মর্যাদাকে সে ব্যবস্থা ক্ষুন্ন না করে। শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাসকে নষ্ট না করে। তাকে বেদনার্ত না করে। তার চরিত্রে কোনরূপ নেতিবাচক পরিবর্তন না ঘটায়। তার স্বকীয়তা নষ্ট না হয়। মানসিক এসব চাপ থেকে শিক্ষার্থীদেরকে মুক্ত রাখতে হবে।

গ্রেডিং এর মাধ্যমে নিম্ন গ্রেড প্রাপ্ত একজন মানুষকে অনেকটা অস্পৃশ্য বানিয়ে দেয়া হয় চিরকালের জন্য। যেটি এক সময় জাত প্রথার মাধ্যমে করা হত। কাজগুলি সূক্ষ জ্ঞানে যেভাবেই করা হোক না কেন ফলাফলগুলি একই। জাত প্রথার নতুন সংস্করণ।

● **সিস্টেমে অবস্থানের কারনে প্রাপ্ত সুবিধাকে বিবেচনায় নেয়া :** ধান, গম বা কাঁচা মশলা গুড়ো করার মেশিনে ফেলে দিলে ভাল-মন্দ মিলিয়ে সে প্রক্রিয়াকৃত দ্রব্য হয়ে বেড় হয়ে আসে। আমরা যখন খাবার খাই সিষ্টেমের মধ্যে প্রবেশ করে সে খাবার দেহের অভ্যন্তরে প্রক্রিয়াকৃত হয়ে তার কাজ সম্পন্ন করে। দেহকে হৃষ্টপুষ্ট করে। সিষ্টেমে ফেলে দিলে সিষ্টেমের কারনে প্রতিটি কাঁচামালের যেমন কিছু অর্জন আছে, তেমনি আছে অবদান। যে ছেলেটিকে সি ডি বা ই গ্রেডে ফেলে দেয়া হচ্ছে কিংবা অকৃতকার্য বলা হচ্ছে, সিষ্টেমে ফেলে দিলে সেও ডাক্তার কিংবা ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বেড় হয়ে আসবে। সিষ্টেমের কারনে সেটি ঘটবে। কেবল পাইপ লাইনে ফেলে দিলেই হল।

এক স্থানে ভর্তি পরীক্ষায় যে অকৃতকার্য হয়েছে প্রাইভেটে পড়ে সে কি ডাক্তার কিংবা ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বেড় হয়ে আসছে না? কি অর্থ বহন করে? সিস্টেমে প্রবেশ করিয়ে দিলে ফলাফল আসবেই। কৃতকার্যতা, অকৃতকার্যতা কিংবা গ্রেডিং এর ভাল বা মন্দ- সময়, প্রাপ্ত সুযোগ কিংবা আর্থিক সামর্থের প্রেক্ষিতে এক আপেক্ষিক বিষয়।

একটি বছর যারা একটি শ্রেণীতে থেকেছে তারা ঐ শ্রেণীতে কিছু না কিছু শিখেছে। প্রতিষ্ঠানের সাথে চলেছে। পাঠ্য পুস্তকের সাথে পরিচয় ঘটেছে। শিক্ষকদের সাথে চলেছে। সহপাঠিদের সাথে চলেছে। বিষয়ের সাধারণ জ্ঞানটুকু তারা অর্জন করেছে। সিষ্টেমের মধ্যে অবস্থান করার কারনে তাদের কিছু অর্জন

আছে। যারা সিষ্টেমে প্রবেশ করেনি তাদের সাথে তুলনা করলে এ পার্থক্য সহজেই ধরা যাবে। ফলে সিষ্টেমে অবস্থান করার কারনে অবধারিতভাবেই শিক্ষার্থীর কিছু অর্জন থাকে। সিস্টেমে প্রবেশের কারনে একজন শিক্ষার্থী যে সাধারণ জ্ঞানটুকু অর্জন করে, ভবিষ্যতের প্রয়োজনে সে সেটিকে আরও শানিত করে নিতে পারে। এর বড় কারন হচ্ছে তার সকল পথঘাট জানা থাকে। এক বছর একজন শিক্ষার্থীর একটি সিস্টেমের আওতায় অবস্থানের মূল্য সংযোজনকে অবশ্যই গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিতে হবে। এসব বিবেচনায় বিশেষভাবে শিক্ষার এত নিচের পর্যায়ে অকৃতকার্যতা ও গ্রেডিং করার ধারণা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয় না। এ ব্যাবস্থার পরিবর্তন হতে হবে।

● **যুগের চাহিদাকে বিবেচনা করা :** চলমান সময়কে বিবেচনা করতে হবে। এখন সহজেই হাতের কাছে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। ধীর গতিতে বছরব্যাপি নিয়মের মধ্যে আবধ্য থাকতে বাধ্য হয়ে যে বিষয়টি অধ্যায়ন করতে হয়, সেটি শিক্ষার্থীরা এখন ইন্টারনেট থেকে সহজেই জেনে নিতে পারে। আবার সব বিষয় জানা বা বোঝার জন্য শিক্ষকের সহায়তাও প্রয়োজন হয় না। তবুও বিদ্যমান ব্যবস্থার কারনে সকলকে এসব মেনে নিতে হচ্ছে। এ যুগের সন্তানেরা অপ্রয়োজনীয় এ দীর্ঘ প্রতীক্ষা সইতে নারাজ। যুগের চাহিদাকে বিবেচনায় নিয়ে তাই শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা প্রয়োজন।

● **সাধারণ বা গড় মানের শিক্ষার্থী :** একটা সময় ছিল যখন বড় বড় গুণ-ভাগ, সরল অংক হাতে কলমে খাতায় করতে হয়েছে। প্রযুক্তির উন্নতির কারনে এখন সে সব হাতে কলমে করতে হয় না। ক্যালকুলেটর সে সব কাজ সম্পন্ন করে দেয়। সবশেষে এসেছে কম্পিউটার। বিবিধ বিষয়ে এসেছে এমন সব সফটওয়্যার যে কেবল ডাটা প্রবেশ করিয়ে দিলেই হল, কাজ করে দেবে কম্পিউটার।

হিসাব বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং, আর্কিটেকচার, ডাক্তারী নানান সব কাজে কম্পিউটার এত সহযোগীতা করছে যে কর্মক্ষেত্রে সকলকে এখন আগের মত ভেতরের সব বিষয় জানতে হয় না। সাধারণ জ্ঞান ও কম্পিউটার চালনার দক্ষতা থাকলে কর্মক্ষেত্রে সকলেই কাজ করে যেতে পারে।

দেশে বেশীরভাগ শিক্ষার্থী শিক্ষা জীবন শেষে এ ধরণের সাধারণ মানের কাজ করে। অর্থাৎ অপারেশনাল কাজ। যা কর্মক্ষেত্রে গিয়ে সকলেই রপ্ত করে নিতে পারে সহকর্মীদের সহযোগীতায়। এসব বিবেচনায়ও বর্তমানে শিশু শ্রেণী থেকে

শুরু করে মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে কোন শিক্ষার্থীকে অকৃতকার্য দেখাবার প্রয়োজন নেই। যে সব শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হয় ভবিষ্যতে এরা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই অপারেশনাল কাজের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে দেখা যায়। তাদের ভাবিষ্যত কাজের ধরণ বিবেচনায় নিয়েও এ ধরণের সাধারণ বা গড় মানের শিক্ষার্থীদের অকৃতকার্য ঘোষনা করে তাদের জীবন থেকে বছর কেড়ে নেয়ার প্রয়োজন হয় না। এসব শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার নামে অকৃতকার্য ঘোষনা করার মাধ্যমে জাতি উপকৃত হয় না। বরং বোঝা বাড়ে। আবার এদের এত সূক্ষ গ্রেডিং করারও প্রয়োজন নেই। এরা একই মানের।

● **মেধাবী শিক্ষার্থী বাছাই :** সাধারণ মানের শিক্ষার্থী ছাড়াও কিছু শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের গভীরে প্রবেশ করতে হয়। এরা সৃষ্টিশীল কিংবা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী। জগতের অগ্রগতির নানান ব্যবস্থার স্রষ্টা। জীবন ও জগত পরিচালনার জন্য তেমন মানুষও প্রয়োজন আছে। ফলে কিছু শিক্ষার্থীদের আলাদাভাবে মেধাবীরূপে চিহ্নিত করারও প্রয়োজনীয়তা আছে।

উচ্চ পর্যায়ের জ্ঞানে পরিশেষে সকলেই প্রবেশ করে না। এদের সংখ্যা মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যার তুলনায় খুবই নগন্য। কম সংখ্যক শিক্ষার্থীকেই কোন বিষয়ের গভীরের জ্ঞানে প্রবেশ করতে হয়। তাদেরকে সকল ঘটনার ভেতরের রহস্যটি জানতে হয়। তার জন্য ভাল লেখাপড়া জানা প্রয়োজন। শিক্ষা ব্যবস্থার কোন পর্যায় থেকে তেমন শিক্ষার্থীদেরকে পৃথকীকরণ করা হবে, সে বিষয়টি নির্ধারণ করা গুরুত্বপূর্ণ। খুব শিশুবেলা থেকে সেটি করার প্রয়োজন নেই।

এ ধরণের শিক্ষার্থীদের সাথে তুলনায় সাধারণ মানের শিক্ষার্থীদের গ্রেডিং করা অপ্রয়োজন। সকল শিক্ষার্থীই মেধাবী। প্রচেষ্টার ঘাটতির কারনে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। প্রত্যেককেই তার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হতে স্বাভাবিক সময় দিতে হবে। প্রাথমিক, জুনিয়র বা মাধ্যমিকের মত এত নিম্ন স্তরে এর জন্য শিক্ষার্থীদের অকৃতকার্যকরণ কিংবা গ্রেডিং কারার প্রয়োজন নেই। বরং নিচের পর্যায়গুলিতে পরীক্ষা বা গ্রেডিংবিহীনভাবে কোর্স সম্পন্ন করাটি গুরুত্বপূর্ণ।

● **দায় :** শিক্ষা ব্যবস্থায় অকৃতকার্যকরণের বিধানের বিদ্যমানতার কারনে শিক্ষার্থীর জীবন থেকে বছর নষ্ট হওয়ার দায় শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর বর্তায়। সকল ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীগণ এ পরিণতিকে নিজ থেকে বা মন থেকে মেনে নেয় না। বিষয়টি শিক্ষা ব্যবস্থা কর্তৃক একটি নিয়ম আরোপের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ওপর চাপিয়ে দেয়া

হচ্ছে। বরং শিক্ষার্থীদেরকে বুঝতে দিতে হবে যে, বছর অনুসারে সে শিক্ষার সকল ধাপ পেরিয়ে এসেছে। কোন পর্যায়ে তার সময় নষ্ট হতে দেয়া হয়নি। শিক্ষার্থী যদি কোন কারনে জীবনে সহপাঠিদের তুলনায় পিছিয়ে থাকে, তবে সেটি তার নিজের ভূল ও তার পরিণতির দায় তার ওপরেই থাকতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থা তেমন হতে হবে। তাকে স্ব-উদ্যেগী হওয়ার পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে। কর্ম জীবনের সন্ধানে কোন শিক্ষার্থী পিছিয়ে গেলে সে ঘাটতি তার নিজেকেই পুরণ করে নিতে হবে নিজ দায়িত্বে।

শিক্ষার্থীদেরকে পরীক্ষা ছাড়া ওপরে উত্তীর্ণ করে দিলে সমস্যা কোথায়? আর নীচে নামিয়ে দিয়েই বা লাভ কি? পরের বছর কি তারা বাড়তি সমস্যা হয়ে আসবে না? এবং একদিন কি তারা ওপরে উঠবে না? কিন্তু নিয়েমের কারনে জীবন থেকে অহেতুক বছর ঝড়ে পড়ছে। আজ যে বিষয়টি অর্জন না করার কারনে একজনকে নীচে থেকে যেতে হচ্ছে, পরের ধাপে বিষয়টি যদি প্রয়োজন হয় তবে সে পরের ধাপেও সে জ্ঞানটি অর্জন করে নিয়ে এগুতে পারবে। এ কারনে একটি বছর পিছিয়ে দিয়ে কোন লাভ হয় না। আর যে বিষয়টি পরের ধাপে বা জীবনে কোনদিনই প্রয়োজন হবে না, সেটি দ্বারা কোন একদিন বিচার করে কেন একজনের জীবন থেকে শুধু শুধু বছর নষ্ট করতে হবে? এমন তো জগতের কত বিষয়ই আমরা না জেনে জীবন পরিচালনা করছি। নির্দিষ্ট সিলেবাসের মধ্যেই কি মানবজীবন?

অকৃতকার্যতার ধারণা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে পরবর্তীতে শিক্ষার্থীদের ভাল ফলাফল করারও নিশ্চয়তা দেয় না। বরং এক নিদারুণ কষ্ট বুকে চেপে রেখে এগিয়ে চলতে বাধ্য করে। আবার এতে খুব আহামরি ভাল ফলাফলও আসে না। বরং দীর্ঘ এক বছর পর টেনেটুনে পার হওয়াকে স্বীকৃতি দেয়। যা আগের বছর দিলেও একজন গড় মানের শিক্ষার্থীর জন্য খুব একটা সমস্যা বলে মনে হয় না।

এত বক্তব্য প্রদান সত্বেও লেখাপড়া যে প্রয়োজন এবং সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ সেটি অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। কেবল কি প্রকারে উপরোক্ত সমস্যাগুলি নিয়ে কাজ করা যেতে পারে সে বিষয়টি নিয়ে কাজ করতে হবে।

পরীক্ষায় অকৃতকার্যতার বিষয়টি যদি শিশুকে ড্রপ আউটের পথে নিয়ে যায়, তবে সেটি সমগ্র জাতির জন্য অধিকতর ক্ষতিকর। প্রাইমারী ও জুনিয়র পর্যায়ে শিক্ষা ব্যবস্থায় তাই অকৃতকার্যতা ও গ্রেডিং এর ধারণাটি না রাখা শ্রেয়। সময়ের

প্রয়োজনে ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। তাই এত আলোচনার পর প্রস্তাবনাটি হচ্ছে, শিক্ষা ব্যবস্থায় অকৃতকার্যতা এবং গ্রেডিং এর ধারণার বিলুপ্তীকরণ, অন্তত নিচের শ্রেণীগুলিতে।

● **বার্ষিক পরীক্ষার ধারণা বিলুপ্তিকরণ :** বিদ্যমান ব্যবস্থায় বার্ষিক পরীক্ষা অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ। বার্ষিক পরীক্ষার সাথে কৃতকার্যতা ও অকৃতকার্যতার একটি সরাসরি সম্পর্ক আছে। আবার এর সাথে গ্রেডিং করারও সম্পর্ক আছে। যেহেতু এ লেখায় বিদ্যমান ব্যবস্থাকে বিবেচনায় নিয়ে অকৃতকার্যতার ধারণা ও গ্রেডিং প্রথার বিলুপ্তির কথা বলা হয়েছে, সে প্রেক্ষিতে বার্ষিক পরীক্ষা বলতে বর্তমানে আমরা যেমনটি বুঝি তেমন কোন পরীক্ষা থাকার কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে না। প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে ব্যবস্থাটি কেমন হবে?

ব্যবস্থাটি আলোচনার পূর্বে অতি সংক্ষেপে এ পর্যায়ে শিক্ষা ব্যবস্থার দর্শনটি কি হবে, সে বিষয়ে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। দর্শনটি হচ্ছে- শিক্ষা ব্যাবস্থায় প্রতিটি শিক্ষার্থী তার সহপাঠিদের সাথে একই সাথে শিক্ষা জীবন শেষ করবে। বিধানটি তেমন হতে হবে। প্রত্যেকেই সমমর্যাদার সাথে সমপর্যায়ে উন্নীত হবে। পরীক্ষার ফলাফল খারাপ হওয়ার নামে একজন শিক্ষার্থীকে তার সহপাঠিদের থেকে নীচের স্তরে নামিয়ে দেয়া হবে না। একজন শিক্ষার্থী তার শিক্ষা জীবনের শেষ পর্যন্ত সহপাঠিদের সাথে সমপর্যায়েই থাকবে। সে পদ্ধতিকে স্বীকৃতি দিয়ে বাস্তবায়ন করতে হবে। একজনকে টেনে নীচে নামিয়ে আনা শিক্ষা ব্যবস্থার কাজ নয়। বিশেষ করে প্রাইমারী ও জুনিয়র এমনকি মাধ্যমিক পর্যায়েও তেমনটি না হওয়া বাঞ্ছনীয়। শিক্ষা জীবন শেষে লক্ষ্যটি হচ্ছে কর্মজীবন। কর্ম জীবনের সন্ধানে কোন শিক্ষার্থী পিছিয়ে গেলে সে ঘাটতি তার নিজেকেই পুরণ করে নিতে হবে নিজ দায়িত্বে। তেমন ব্যবস্থা ও সুযোগও পরবর্তীতে অবারিত থাকতে হবে।

পরীক্ষার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট সময়ে কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ের দ্বারা শিক্ষার্থীদের যদি বিচার করতেই হয়, তবে সেটি পিএসসি, জেএসসি, এসএসসি এমন কি এইচএসসি-র মত এমন নাজুক বয়সে নয়। বিশেষত এগুলি হচ্ছে বয়ঃসন্ধিকালের সময়। এ সময় নানান জনের ওপর শারিরীক, মানসিক, সামাজিক কারনে নানান প্রভাব বা চাপ থকে। এ বয়সে পরিপূর্ণভাবে স্বকীয়তা গড়ে ওঠে না। বরং গড়ে ওঠার সময়। এ সময়ে শিক্ষা জীবনে অকৃতকার্যতা বা গ্রেডিং নামক ভাল-মন্দ সৃষ্টির নামে বাড়তি মানসিক চাপ না দেয়ার ব্যবস্থা থাকা শ্রেয়।

একটি বিষয় না দেখে মুখস্ত বলতে বা লিখতে পারার চেয়ে শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাসী হয়ে গড়ে উঠাটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ হিসেবে তেমন মানুষ গড়ে তোলা সম্ভব হলে তেমন মানুষের পক্ষেই সম্ভব পৃথিবীর প্রয়োজনে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়ে চলা। পরীক্ষার ফলাফলই জীবনের সব কথা প্রকাশ করে না।

যেহেতু অকৃতকার্যতার ধারণা ও গ্রেডিং এর ধারণার বিলুপ্তিকরণের কথা বলা হয়েছে। ফলে বার্ষিক পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা থাকে না। কেননা এ দুটি ধারণার সাথে বার্ষিক পরীক্ষার একটি সম্পর্ক আছে। ফলে বর্তমানে বার্ষিক পরীক্ষা বলতে যা বোঝায় এবং এর প্রাতিষ্ঠানিক যে মূল্য আছে তা বিলুপ্তকরণের বিষয়ে বলা হচ্ছে। তাহলে ব্যবস্থাটি কেমন হবে? বিষয়টি সম্পর্কে নিচে কেবলমাত্র একটি সাধারণ ধারণা তুলে ধরা হল।

● **মূল্যায়ন ও উত্তীর্ণতা :** মূল্যায়ন হতে পারে মাসিক বা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে। মূল্যায়ন হবে শ্রেনীকক্ষে। মূল্যায়নে যে নাম্বার দেয়া হবে তা থেকে শিক্ষার্থীরা তাদের নিজেদের ও পারস্পরিক তুলনামূলক অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা লাভ করবে। প্রাপ্ত এ নাম্বারের কোনরূপ প্রাতিষ্ঠানিক মূল্য থাকবে না। অর্থাৎ এ নাম্বারের ভিত্তিতে কোনরূপ সুবিধা-অসুবিধা প্রাপ্তি ঘটবে না।

বছর শেষে শেষ পর্বের মূল্যায়ন হতে পারে। তবে সেটি বর্তমান বার্ষিক পরীক্ষার মত গন্য হবে না। পরবর্তী ধাপে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য বার্ষিক পরীক্ষা থাকবে না। বছর শেষে অনুষ্ঠিত এ মূল্যায়নে নাম্বার দেয়া যেতে পারে। তবে এ মূল্যায়ন বা মূল্যায়নে প্রাপ্ত নাম্বারের ভিত্তিতে উত্তীর্ণ হওয়া নির্ভর করবে না। কে উত্তীর্ণ হয়েছে কে উত্তীর্ণ হয়নি সেটি পৃথকভাবে নির্ধারণের প্রয়োজন নেই।

বছরের কোর্স সম্পন্ন হলে সকল শিক্ষার্থী তার সহপাঠিদের সাথে একইসাথে পরবর্তী ধাপে উর্ত্তীর্ণ হবে। এক একটি ব্যাচের সকলকে একই সাথে পরবর্তী ধাপে নিয়ে যাওয়া হবে। বছর শেষে বার্ষিক পরীক্ষা দিতে হবে না। এমনকি মূল্যায়নে প্রাপ্ত নাম্বারের ভিত্তিতে কোনরূপ গ্রেডিং কিংবা পরবর্তীতে রোলের ক্রমিকও নির্ধারণ করা হবে না। শিক্ষার্থীদের রোলের ক্রমিক হতে পারে তাদের নামের অদ্যাক্ষর বা ভর্তির পূর্বাপর সময়ের ভিত্তিতে।

এ পর্যায়ে শিক্ষার লক্ষ্য হবে এক বছরের কোর্স সম্পন্ন করে এক একটি ব্যাচের সকলকে একসাথে পরবর্তী ধাপে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। কেউই পিছিয়ে থাকবে না। সময়ের বিচারে কেউ পিছিয়ে থাকবে না। শিক্ষার মানের বিচারে যে পিছিয়ে

থাকবে, সে নিজেই যথাসময়ে সচেষ্ট হয়ে নিজেকে যথাযথ পর্যায়ে নিয়ে যাবে। নিয়মটি তেমন হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

● **কেন্দ্রীয়ভাবে অনুষ্ঠিত পরীক্ষা সমুহ :** কেন্দ্রীয়ভাবে অনুষ্ঠিত পিইসি, জেএসসি পরীক্ষা সমুহের প্রয়োজন নেই। এ পর্যায়ে করা গ্রেডিং করার সাথে বস্তুত কর্ম জীবনের কোনরূপ সম্পর্ক নেই। এ পর্যায়ে করা গ্রেডিং সুদুরের ভবিষ্যৎ কর্ম-জীবনে কোন প্রভাব ফেলে না।

● **কেন্দ্রীয় তথ্য ভান্ডার :** কেন্দ্রীয় তথ্য ভান্ডারে সকল শিক্ষার্থীর তথ্য প্রাথমিক পর্যায়ে ভর্তির সময় থেকেই সংরক্ষন করা যেতে পারে।

● **শিক্ষা সনদ :** অত্র বিদ্যালয়ে অধ্যায়ন করেছে, মাসিক ও/বা ত্রৈমাসিক অনুষ্ঠিত মূল্যায়নসমুহে অংশ গ্রহণ করেছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত তেমন সনদই হবে প্রাইমারী ও জুনিয়র পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত সনদ। এ পর্যায়ে এর বেশী প্রয়োজন নেই। তবে এ সনদ কেন্দ্র থেকে ছাপিয়ে দেয়া যেতে পারে। যা কেবলি মানসিক তৃপ্তির সাথে সম্পর্কিত।

কেন্দ্রীয়ভাবে এগুলি এ পর্যায়ে করা যেমন ঝামেলার তেমনি অপ্রয়োজনীয়। অনিয়ম সকল ক্ষেত্রে হয় বা করা সম্ভব। ফলে অনিয়ম রোধে সিষ্টেমে জটিলতা বৃদ্ধি না করে বিষয়টি ঐ পর্যায়ে রেখে কিভাবে আরও সহজ ও ভালভাবে ব্যবস্থা করা যায়, বা দক্ষ জনবল সৃষ্টি করা যায়- সে বিষয়ে কাজ করতে হবে।

সমাজের কাছে কোন সনদের গ্রহণযোগ্যতা মূলত মানসিকতা সৃষ্টি করতে পারার সাথে সম্পৃক্ত। সকল মানুষই নিজ প্রয়োজনে নিজেকে কাজের যোগ্য করে গড়ে তোলে। সনদ দেয়ার ওপর কাজ নির্ভর করে না। তথাপি অসংখ্য মানুষের ব্যবস্থাপনাকে একটি নিয়মের মধ্যে রাখতে হয়, তাই এগুলির প্রয়োজন। কিন্তু সেই প্রয়োজনীয়তাকে কাজে লাগিয়ে জটিলতা সৃষ্টি করা ঠিক কাজ নয়।

যারা এ পর্যায় পর্যন্ত লেখাপড়া শেষ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করবে, তাদের চাকুরীদাতা ব্যাক্তি বা প্রতিষ্ঠান তাদেরকে তাদের নিজেদের প্রয়োজনে, তাদের মত করে চাকুরী প্রার্থীদের কর্মের ধরণ অনুযায়ী যাচাই-বাছাই করে নিতে পারে। কিংবা তার প্রয়োজন বোধ না করলে যাচাই না করতে পারে। সেটি কর্মদাতা ব্যাক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিষয়।

মূলত শিক্ষার্থীদের কোন প্রকার যাচাই-বাছাই করা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্যই প্রয়োজনীয় নয়। এটি প্রয়োজন চাকুরীদাতা বা কর্মদাতা ব্যাক্তি বা প্রতিষ্ঠানের জন্য। সে বিষয়টি স্মরণে রাখতে হবে।

● **বিকল্প ব্যবস্থার বিদ্যমানতা :** অসুস্থতা বা কোন ঘনিষ্টজনের মৃত্যু বা কোন ধরণের যুক্তিসঙ্গত দুর্যোগের কারনে যেন শিক্ষার্থীর জীবন থেকে বছর বা সময় নষ্ট না হয়ে যায় সে ব্যবস্থা থাকতে হবে। এসব কারনে একজন শিক্ষার্থীকে সহপাঠিদের থেকে সারা জীবনের জন্য নীচে নামিয়ে দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করা সঠিক নয়। বিকল্প পথ থাকা প্রয়োজন।

● **শিক্ষা জীবনের শুরু থেকে টীম ওয়ার্কের মনোভাব গড়ে তোলা :** গ্রেডিং পদ্ধতির পরিবর্তে সকলেই ভাল, সকলেই যোগ্য, সকলেই সম্ভাবনাময় এ ধারণার প্রসার ঘটাতে হবে। একক ব্যাক্তিক কৃতিত্বকে প্রাধান্য না দিয়ে, শিক্ষার্থীদের মাঝে শিশুবেলা থেকে সবাই মিলে একসাথে অর্জন করব, এমন ধারণার চর্চা বাড়াতে হবে। টীম ওয়ার্কের মনোভাব গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে এ সময় থেকেই।

ভবিষ্যৎ কর্মস্থলে সমস্যা সমাধানে সকলে সাম্মিলিতভাবে অবদান রেখেছে সেভাবে সকলে উদ্বুদ্ধ হতে শিখবে। বিভিন্ন জনের বিভিন্ন যোগ্যতাকে স্বীকৃতি দিয়ে টীম ওয়ার্কের মনোভাব গড়ে তুলতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের জীবনের শুরু থেকেই সহায়তা করবে। আর সে কারনেই শিক্ষা জীবনে ব্যাক্তিক গ্রেডিং পদ্ধতির প্রয়োগ ছাড়াই শিক্ষার্থীদেরকে গড়ে উঠতে দিতে হবে। গ্রেডিং ব্যাবস্থা টীমে প্রতিযোগীতার সৃষ্টি করে বটে, তবে এক পর্যায়ে গিয়ে এটি টীম স্প্রিটকে ক্ষুন্নও করে। কোন কোন ধরণের কর্মে বা কোন কোন ক্ষেত্রে এটি ব্যাক্তিকে বিপদের মুখেও ঠেলে দেয়। আবার হিংসা, বিদ্বেষ, ষড়যন্ত্র ও অসুস্থ প্রতিযোগীতারও জন্ম দেয়।

মানুষ যখন তার সহপাঠি সহকর্মী সহযাত্রীদের সাথে একসাথে চলে, তখন সকলের সহযোগীতায় ঘাটতি পুরণ করে নেয়। নিজেকে যোগ্য করে গড়ে তোলে। কিন্তু জীবনের কোন এক সময়ে সহপাঠিদের থেকে নীচে নামিয়ে দেয়া হলে সেটি আর কোনদিন পুরণ হবার নয়। সম্ভাব্য এ ক্ষতি থেকে শিক্ষার্থীদেরকে রক্ষা করতে হবে।

একজন শিক্ষার্থী যখন একগুচ্ছ বইয়ের সাথে দীর্ঘ এক বছর চলাফেরা করে, তখন সে স্বাভাবিকভাবেই সে বিষয়ের সাধারণ জ্ঞানটুকু অর্জন করে। আবার একজন শিক্ষার্থী যখন তার সহপাঠিদের সাথে দীর্ঘ এক বছর চলাফেরা করে, তখনও সে স্বাভাবিকভাবেই সে শ্রেণীর ও বিষয়ের সাধারণ জ্ঞানটুকু অর্জন করতে সক্ষম হয়। এরপরেও সে নিজে কিছু না কিছু লেখাপড়া করছে। যে কম করছে সিষ্টেমের মধ্যে অবস্থান করার কারনেই সে কিছু অর্জন করছে। একজনকে উচ্চ শ্রেণীতে গমনের জন্য এ সাধারণ জ্ঞানটুকুর চেয়ে অধিক কিছু প্রয়োজন হয় না। অন্তত সাধারণ মানের শিক্ষার্থীদের জন্য।

একটি সিষ্টেমের মধ্য দিয়ে একজন শিক্ষার্থী যখন অতিক্রম করে সে তখন নিদেনপক্ষে ঐ বিষয়ের সাধারণ জ্ঞানটুকু অর্জন করেই। সিষ্টেমের মধ্য দিয়ে চলার কারনেই করে। ঐ সাধারণ জ্ঞানটুকু থাকার কারনে কর্মজীবনের প্রয়োজনে সে নিজেকে প্রস্তুত করে নিতে সক্ষম হওয়ার মত করেই গড়ে ওঠে।

সিষ্টেমের মধ্যে থাকা সহপাঠি, শিক্ষক, কর্মজীবনে সহকর্মী সকলের সহযোগীতায় একজন নিজেকে কাজের উপযোগী করে গড়ে নেয়, যখন সে প্রয়োজন মনে করে। এটি টীম ওয়ার্ক। টীম ওয়ার্কের উপস্থিতির কারনে একজনকে শৈশবে অকৃতকার্যতার নামে নীচে নামিয়ে দেয়ার প্রয়োজন নেই। বরং এটিকে কিভাবে আরও শানিত করা যায় সে বিষয়টি নিয়ে ভাবা যেতে পারে।

শিক্ষাক্ষেত্রে এক সময় অনেক নিয়ম পদ্ধতি ছিল না। আজ যে পর্যায়ে এসেছে দীর্ঘদিনের অভ্যস্ততায় মানব মস্তিস্ক সেটিকে গ্রহণ করে নিয়েছে। আজ আবার গ্রেডিং পদ্ধতি পরিহার করে যদি টীম ওয়ার্কের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়, তবে সময়ের সাথে সাথে মানুষ সেটিকেও গ্রহণ করে নেবে। ভাবতে হবে কি উপায়ে এটিকে আরও ভাল রূপ দেয়া যেতে পারে।

শিক্ষার্থীরা জীবনের প্রথম থেকেই জানবে যে, তাদের মাঝে উচু-নীচু নেই, সকলের সমান যোগ্যতা আছে। সকলেই সব সময় সব বিষয়ে সমান প্রচেষ্টা দেয় না বিধায় পার্থক্য সৃষ্টি হয়। আবার এক বিষয়ে সকলের সমান ঝোঁক না থাকলেও, একেক জনের একেক দিকে অধিক ঝোঁক আছে। একে অন্যকে সহায়তা করবে। এমন বিশ্বাস, মর্যাদা ও সহর্মীতা নিয়ে সকলেই পরবর্তী ধাপে উত্তীর্ণ হবে। টীম ওয়ার্কের মানসিকতা শিক্ষা জীবন থেকে গড়ে উঠবে। এ ব্যবস্থার ফলে সকলের

নিজস্ব গুণাগুণ অর্থাৎ স্বকীয়তা বজায় থাকবে। কেবল অধিক নাম্বার পাবার জন্য নিজের ভেতরের ভাল গুণাগুণগুলিকে বিসর্জন দিতে হবে না।

একজন একক ব্যাক্তি মারাত্মক ভাল ফলাফল করেছে, এককভাবে তেমন একজনকে দিয়ে সমাজে আহামরি কিছুই হয় না। খুব বেশী হলে অতি পার্থক্যপূর্ণ বেতনের চাকুরী পাওয়া যেতে পারে। যেটি দু'চার জন পায়। সে লোভে সকলেই ছুটে। তবে অবশ্যই যদি চাকুরী দাতারা সে নিয়ম সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। কিছু মানুষকে আহামরি সৃষ্টি করার ব্যবস্থা উঠিয়ে দেয়া উত্তম। যারা রবীন্দ্র, নজরুল, আইনষ্টাইন হবে তারা সব ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই ব্যাতিক্রমি আপন স্বতঃস্ফুর্ত উচ্ছাস ও যোগ্যতায় হবে। তা ছাড়া প্রাতিষ্ঠানিকভাবেও হতে পারে। তবে সে পৃথকীকরণের কাজটি উচ্চ মাধ্যমিকের পরে করা যেতে পারে।

এককভাবে নয়, সবাই মিলে ভাল। এখন এ রকম আওয়াজ তোলার সময় এসেছে। এককভাবে কাউকে অতি ভাল প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন নেই। এককভাবে কেউই সমাজে কোন অবদান রাখতে পারে না। মনে করা হয় এভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগীতা সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু অনেকক্ষেত্রে সেটি সুস্থ প্রতিযোগীতার পরিবর্তে মন্দ ঈর্ষারও জন্ম দেয়। মানসিক থেকে শুরু করে নতুন সামাজিক সমস্যারও সৃষ্টি করে। কিছু শিক্ষার্থী ক্ষতিগ্রস্তও হয়। গুটি কয়েক ভাল নামধারীকে উৎসাহিত করার চেয়ে অধিকসংখ্যককে ক্ষতিগ্রস্ততার হাত থেকে রক্ষা করা বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

কর্মক্ষেত্রে নেতৃত্বের একটি প্রশ্ন এসে যায়। এটি টীম নিজে নির্ধারণ করে নেবে। টীমের ইচ্ছায় নেতৃত্বে পরিবর্তন হতে পারে। এসবের বাঁধা-ধরা নিয়ম থাকা ঠিক নয়। কাজ হবে সিষ্টেমে। বর্তমান সময়ে নেতৃত্ব গ্রহণযোগ্য চেহারা কিংবা গ্রহণযোগ্য আচরণ ব্যাতিত আর কিছু নয়।

● **ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব প্রসংগ :** ভাল ভাল জিপিএ দিয়ে মনে করা হয় ভবিষ্যতে রাষ্ট্রের নেতৃত্বে সবচেয়ে যোগ্য ও চৌকষদের তুলে নিয়ে আসা হচ্ছে। মূলত নেতৃত্বে যারা আসে তাদেরকে তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হয়ে আসতে হয়। পিইসি, এসএসসি, এইচএসসিতে জিপিএ ৫ প্রাপ্তির কারনে আসে না। সেখানে এসে অকৃতকার্য হওয়া ব্যাক্তিও ভাল করে। রাজনীতিই যখন সব সেক্টরে নেতৃত্বের প্রধান নির্ধারক, তখন শিক্ষার এত নীচের পর্যায়ে ভবিষ্যত নেতৃত্ব সৃষ্টির জন্য গ্রেডিং এর প্রয়োজনীয়তা নেই। তা ছাড়া গ্রেডিং যদি নেতৃত্ব

সৃষ্টি কিংবা প্রতিযোগীতা সৃষ্টির প্রয়োজনে করতেই হয়, তবে সেটি আরও উপরের পর্যায়ে গিয়ে করা যেতে পারে।

আবার এক অর্থে অনেক বড় গ্রেড পেয়ে কি হবে? সেই তো চাকুরিই করতে হবে। চাকুরিদাতাদের দয়ার ওপর সব নির্ভরশীল। তারা 'জেড' গ্রেড প্রাপ্ত একজনকে মূল্য দিলে সেটিই প্রকৃত মূল্য। 'এ' গ্রেড কাজে আসবে না। 'এ' এবং 'জেড' একই কাজ করবে। মারাত্মক উঁচু গ্রেড প্রাপ্তির প্রতিযোগীতা প্রয়োজনহীন। অন্তত শিক্ষার যে পর্যায় নিয়ে এখানে আলোচনা করা হচ্ছে- সে পর্যায়ে তো অবশ্যই অপ্রয়োজনীয়।

বস্তুত শিক্ষার নিম্নস্তরে অনেক বেশী পারফেকশনের দরকার নেই। দরকার শিক্ষার চৌহদ্দির মধ্যে শিক্ষার্থীকে ধরে রাখা। যখন শিক্ষার্থীর নিজের বুঝের বয়স হবে, তখন সে নিজেই নিজের করণীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। শিক্ষা ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষের শিক্ষার্থীর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থার অনমনীয় নিয়মের কারনে এ ব্যবস্থা শিক্ষার আলো থেকে অনেককে খুব অল্প বয়সে নিজেই ঠেলে বঞ্চিত করে দিচ্ছে। শিক্ষিত জাতি হয়ে গড়ে ওঠা দীর্ঘায়িত হচ্ছে। সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

২.২ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ঃ

মাধ্যমিক পর্যায়টি এমন এক অবস্থানে অবস্থান করছে যে এটিকে বিদ্যালয়ের অন্তর্ভূক্ত রেখে প্রাইমারী ও জুনিয়রের সাথে রাখা যেতে পারে, কিংবা বিদ্যালয় থেকে উঠিয়ে নিয়ে উচ্চ মাধ্যমিকের সাথে কলেজ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। বিষয়টি নিয়ে ভাবা যেতে পারে। এ পর্যায়ে বিষয়টি নিশ্চিত করে এখানে বলা সঠিক হবে না। মাধ্যমিকের বিষয়টিকে উচ্চ মাধ্যমিকের সাথে একীভূত করে এখানে আলোচনা করা হল।

- **মূল্যায়ন :** প্রাথমিক ও জুনিয়র পর্যায়ের মত এ পর্যায়েও শিক্ষার্থীদের নিয়মিত মাসিক বা ত্রৈমাসিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।
- **বার্ষিক পরীক্ষা :** বর্তমানে বার্ষিক পরীক্ষা বলতে যা বোঝায় তেমন কোন পরীক্ষা এ পর্যায়ে থাকবে না। প্রকৃতপক্ষে বার্ষিক পরীক্ষার কোন প্রকার ব্যাবস্থাই এ পর্যায় পর্যন্ত রাখা হবে না।

নিয়মিত মাসিক বা ত্রৈমাসিক মূল্যায়নের মত বছর শেষে শেষ পর্বের মূল্যায়ন হবে। তবে সেটি বর্তমানের বার্ষিক পরীক্ষার মত গন্য হবে না। বছর শেষের এ মূল্যায়নে নাম্বার দেয়া যেতে পারে। যা দেখে শিক্ষার্থীরা নিজেদের অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা লাভ করবে। তবে এ মূল্যায়নের নাম্বারের ভিত্তিতে উত্তীর্ণ হওয়া-না হওয়া নির্ভর করবে না। পরবর্তী ধাপে সকলকেই নিয়ে যাওয়া হবে। মূল্যায়নে প্রাপ্ত নাম্বারের ভিত্তিতে কোনরূপ গ্রেডিং বা পরবর্তীতে রোলের ক্রমিকও নির্ধারণ করা হবে না। অর্থাৎ এসব মূল্যায়নের কোন প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা থাকবে না। পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের রোলের ক্রমিক হবে শিক্ষার্থীদের নামের অদ্যাক্ষরের ভিত্তিতে বা ভর্তির সময়ের ক্রমানুসারে। শিক্ষার লক্ষ্য হবে সকলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, কাউকেই পিছিয়ে দেয়া নয়। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কাউকে ভাল বা মন্দরূপে চিহ্নিত করা হবে না। সম্ভাবনার দুয়ার সকলের জন্য সব সময় সমভাবে উন্মুক্ত থাকবে। কাউকে মানসিকভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না। চাইলে যে কেউ যে কোন সময় নিজের ফলাফল ভাল করতে পারে। অকৃতকার্যতা বা গ্রেডিং এর নামে কোন শিক্ষার্থীকে মানসিকভাবে সামান্যতম ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না।

এ লেখা নীতিগতভাবে পরীক্ষা- বিশেষত বার্ষিক পরীক্ষা এবং সকল পর্যায়ে কেন্দ্রীয়ভাবে আয়োজিত কোনরূপ পরীক্ষার পক্ষে নয়। বিশেষত প্রাইমারী, জুনিয়র ও মাধ্যমিক পর্যায়ে।

● **কেন্দ্রীয়ভাবে অনুষ্ঠিত পরীক্ষা :** বর্তমানে দশম শ্রেনীর শিক্ষার কোর্স সমাপ্ত হবার পর মাধ্যমিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। নবম শ্রেনীতে কেন্দ্রীয়ভাবে কোন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় না। আবার একাদশ শ্রেনীতে কেন্দ্রীয়ভাবে আয়োজিত কোন পরীক্ষা হয় না। দ্বাদশ শ্রেনীতে হয়। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকে মোটামুটি একই পড়া। উচ্চ মাধ্যমিকে একই বিষয়ে বিস্তারীত আলোচনা করা হয়। কিছু বিষয় সংযোজিত হয়।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে পাশাপাশি দুটি ঝামেলা বহুল প্রচলিত ধারণায় গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার আদৌ প্রয়োজন নেই। যুগ যুগ ধরে এভাবে চলে আসছে বিধায় সেটিকে চলতে দিতে হবে বিষয়টি তেমন হতে পারে না। পরিবর্তীত প্রেক্ষাপটে আদৌ তার প্রয়োজন আছে কি না তা ভেবে দেখা দরকার।

কেন্দ্রীয়ভাবে অনুষ্ঠিত বড় মাপের অনেকগুলি পরীক্ষার পরিবর্তে অবস্থার প্রেক্ষিতে যদি পরীক্ষা নিতেই হয়, তবে সেটি একটি এবং উচ্চ মাধ্যমিকে। উচ্চ মাধ্যমিকে কেন? সে বিষয়টি পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে।

কেন্দ্রীয়ভাবে অনুষ্ঠিত পরীক্ষাসমুহে শিক্ষার্থীদের কেন্দ্র পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। বিষয়টি নিয়ে ওপরে আলোচনা করা হয়েছে। প্রয়োজনে শিক্ষকদের অবস্থান পরিবর্তন করা যেতে পারে। কেন্দ্র থেকে সকল স্থানে একই প্রশ্নপত্র প্রেরণ করা যেতে পারে। এসব প্রস্তাবনা বর্তমান বিদ্যমান ব্যবস্থার আলোকে করা হল। পরীক্ষা নিয়ে দেখা স্বপ্নের আলোকে নয়।

- **কেন্দ্রীয় তথ্য ভান্ডার :** কেন্দ্রীয়ভাবে সকল শিক্ষার্থীর তথ্য সংরক্ষন করা হবে প্রাইমারী পর্যায় থেকে। এ পর্যায়ে তা আপডেট রাখা হবে। উচ্চ মাধ্যমিকে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফলাফলও সংরক্ষিত থাকবে। এসবগুলি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিষয়। এসব বিষয়ে এখানে জোড়াল কোন প্রস্তাবনা নেই। যা করতে হবে প্রয়োজন ও সময়ই তা বলে দেবে।

- **গ্রেডিং এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান :** বর্তমান সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমুহকেও গ্রেডিং করা হচ্ছে। সেটি আরও ভয়াবহ। খারাপ চিহ্নিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কেউ ভর্তি হতে চায় না। যারা ভর্তি হয় তাদের ভালভাবে গ্রহণ করা হয় না। অথচ এ ত্রুটি সুযোগ-সুবিধা না দিতে পারা কর্তৃপক্ষের। সে দায় অন্যের ওপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। কিংবা সুযোগ-সুবিধা ন্যায্যতার ভিত্তিতে বন্টন না করে কাউকে অধিক সুবিধা দেয়া হচ্ছে। রাজনীতি প্রবেশ করছে। প্রতিষ্ঠান সমুহের গ্রেডিং পদ্ধতি বন্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই সিলেবাসে লেখাপড়া করে, একই পুস্তক পাঠ করে, একই নিয়মে পরীক্ষা দিয়েও কেবল প্রতিষ্ঠানের কারনে কেউ অধিক সামাজিক মর্যাদা লাভ করছে। এগুলি অসুস্থ প্রতিযোগীতা সৃষ্টির উপায় সৃষ্টি করছে। লেখাপড়া থাকে বইয়ের ভেতর, প্রতিষ্ঠানে নয়। সে বই মনোযোগ দিয়ে যে যেখান থেকে পাঠ করবে, সে ভাল করবে। বটবৃক্ষের নিচে মুক্ত হাওয়ায় লেখাপড়া করেও মানুষ ভাল ফলাফল করেছে।

২.৩ ব্যবহারিক শিক্ষা প্রসংগ

'একটি বিকার লই। উহাকে পরিস্কার করি। .. ..।' এসএসসি এবং এইচএসসি পর্যায়ে বিজ্ঞান বিভাগে প্র্যাকটিকেল বা ব্যাবহারিক পরীক্ষার নিয়ম প্রচলিত আছে।

এ পর্যায়ের ব্যবহারিক শিক্ষা বাস্তব জীবনে খুব একটা কাজে লাগে না। এগুলির পিছনে অবকাঠামোগত, শ্রম থেকে শুরু করে নানান রকমের ব্যায় নির্বাহ হয়। যা আদৌ প্রয়োজনীয় নয়। কর্ম জীবনে এত বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী এমন ধরণের কাজে নিয়োজিত হয় না। যারাও নিয়োজিত হয় তাদের জন্যও এ পর্যায়ের ব্যবহারিক শিক্ষা খুব একটা কাজে আসে না। এসবের জন্য এত শিক্ষার্থীর পেছনে এত পরিমান অর্থের বরাদ্দ প্রয়োজনহীন। এটি অপচয় হিসেবে গন্য হতে পারে। বাস্তবে এখান থেকে কেউই কিছু শেখে না। যে দু'একজন যতটুকু শেখে ততটুকু খুব প্রয়োজনীয় নয়। আজকাল ভিডিও উপস্থাপনা বা ছবি দেখিয়েও এ পর্যায়ের বিষয়গুলি শিখিয়ে দেয়া সম্ভব। ব্যবহারিকের বিষয়টি এ পর্যায়ে না রাখা ভাল। এখান থেকে কোন গবেষক বেড় হয় না। এ ব্যবস্থার পেছনে আজ পর্যন্ত কত ব্যায় হয়েছে, আর কত উপকার এসেছে তার হিসেব কষলেই বিষয়টি পরিস্কার হয়ে যাবে।

কর্ম জীবনে বেশীরভাগ শিক্ষার্থীর এ পর্যায়ের ব্যবহারিক শিক্ষার জ্ঞান কাজে লাগে না। বিজ্ঞান বিভাগে এ পর্যায়ে ব্যবহারিক শিক্ষার বিষয়টি না রেখে, উচ্চতর বা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বরং অধিক বরাদ্দ ও গুরুত্ব দেয়া যেতে পারে।

২.৪ উচ্চতর পর্যায়ে ভর্তি

উচ্চ মাধ্যমিকে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি পরীক্ষা থাকার বিষয়টি ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিকের পরে শিক্ষার্থীদের উচ্চ পর্যায়ে ভর্তির একটি বিষয় রয়েছে। কে কোথায় ভর্তি হতে পারবে তা নির্ধারনের জন্য উচ্চ মাধ্যমিকে একটি পরীক্ষা নেয়ার প্রয়োজন হতে পারে। এভাবে ভাবা হচ্ছে বিদ্যমান বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে।

অবস্থার প্রেক্ষিতে বলতে বোঝানো হয়েছে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অভাবকে। যেহেতু সকলে চাইলেও তার মন মত বিষয়ে ভর্তির সংকুলান করা সম্ভব না, তাই। অর্থাৎ পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি করতে না পারার কারনে কিছু শিক্ষার্থীকে কোন বিষয়ে অধ্যায়নের সুযোগ থেকে বাদ দেয়ার জন্য এ পরীক্ষার প্রয়োজন হতে পারে।

আরও একটি কারনে এ পরীক্ষার প্রয়োজন হতে পারে। সেটি হল, অধ্যায়নের বিষয় নির্বাচন যদি সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয় এবং সকলেই যদি ডাক্তার

কিংবা ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়, সেক্ষেত্রে অন্যান্য ক্ষেত্রগুলিতে কারা অবদান রাখবে বা কাজ করবে? সে কারনেও এ পর্যায়ে একটি পরীক্ষা হতে পারে।

উচ্চ মাধ্যমিকে অনুষ্ঠিত পরীক্ষা পরিপূর্ণভাবে তখনই অর্থবহ হবে, যখন উক্ত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নাম্বারের ভিত্তিতে পরবর্তী ভর্তি কার্যক্রম পরিচালিত হয়। তবে উচ্চ মাধ্যমিকের পরে উচ্চতর পর্যায়ে ভর্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি যদি নিজ উদ্যোগে ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে শিক্ষার্থী বাছাই করে, তবে সেক্ষেত্রে উচ্চ মাধ্যমিকেও কেন্দ্রীয়ভাবে কোন পরীক্ষা আয়োজনের প্রয়োজন নেই। তেমন ক্ষেত্রে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের নাম্বার যোগ করার মত অপ্রয়োজনীয় জটিলতা সৃষ্টি করারও প্রয়োজন নেই। তবে সিলেবাসের বাইরে থেকে প্রশ্ন করা যাবে না।

উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা স্কুল কলেজে তাদের জন্য নির্ধারিত কোর্স সমাপ্ত করবে। উচ্চ মাধ্যমিকের পরে উচ্চতর পর্যায়ে ভর্তির ক্ষেত্রে তারা প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবে। যারা অতীতে অবহেলা করেছে তারা নিজ দায়িত্বে তাদের ঘাটতি পুরণ করে এগুতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থা কারও জীবন থেকে বছর কেড়ে নেবে না।

২.৫ কর্মজীবন ও প্রকৃত মূল্যায়নঃ

শিক্ষার সাথে কর্মজীবনের সম্পর্কটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত একজন শিক্ষার্থীর জীবনে সফলতা-বিফলতা কর্ম জীবনের সফলতা-বিফলতার সাথে সম্পর্কিত। শিক্ষার্থী শেখে নিজ প্রয়োজনে। প্রতিষ্ঠান কিংবা সমাজের প্রয়োজনে নয়। প্রতিষ্ঠান আবার তার প্রয়োজনে একজনকে গড়ে তোলে। পারস্পরিক নির্ভরশীলতার এ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সমাজ উপকৃত হয়।

প্রতিযোগীতামূলক মূল পরীক্ষাটি হতে হবে শিক্ষার্থীর কর্ম-জীবনে নিয়োজিত হওয়ার সময়। পূর্বের সকল লেখাপড়া এরই প্রস্তুতি পর্ব। চাকুরী প্রার্থী এবং নিয়োগকারী সংস্থা, ব্যাক্তি বা প্রতিষ্ঠান উভয় পক্ষই এ পর্যায়ে তাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টাটি দিয়ে থাকে। যা শিক্ষা জীবনে সকল শিক্ষার্থী সেভাবে দেয় না। এক পক্ষ নিজ প্রয়োজনে কর্ম-প্রাপ্তির জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টাটি দেয়। অপর পক্ষ নিজ প্রয়োজনে সর্বশ্রেষ্ট কর্মী নিয়োগ দিতে গিয়ে তার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টার প্রয়োগ করে। সর্বশ্রেষ্ট মূল্যায়নটি তাই উভয়পক্ষ অর্থাৎ শিক্ষার্থী ও কর্মদাতা প্রতিষ্ঠানের চহিদা ও প্রচেষ্টার ভিত্তিতে হতে হবে। পরীক্ষা যদি দিতেই হয় তবে সেটি এ পর্যায়ে

এসে হতে হবে। এ সময়ে একজন শিক্ষার্থী তুলনামূলকভাবে অধিক পরিপক্ক হয় বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। বাস্তবতা কিছুটা বুঝতে শিখে। ফলে এটিই পরীক্ষা নেয়ার এবং ভাল-মন্দ যাচাইয়ের উপযুক্ত সময় ও ক্ষেত্র। প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণে সহপাঠিদের সকলকে সমান সুযোগ পাবার সুযোগ করে দেয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেন তার গৃহিত কোন পদক্ষেপের মাধ্যমে কোন শিক্ষার্থীর জন্য তার সহপাঠিদের সাথে একই সাথে এ পর্যায়ে আসতে বাধা হয়ে না দাড়ায়, সে বিষয়টি ব্যবস্থা দ্বারা নিশ্চিত করা বাঞ্ছনীয়।

এক অর্থে বলতে গেলে শিক্ষা জীবনের পরীক্ষাগুলির সরাসরি কোন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নেই। পরবর্তীতে কর্ম জীবনে প্রবেশের পরোক্ষ লক্ষ্য নিয়েই শিক্ষা জীবনের পরীক্ষাগুলি পরিচালিত হয়। সুদুরের কর্ম জীবনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে দীর্ঘ শিক্ষা জীবনে পরীক্ষা নিয়ে নানাভাবে যে নাভিশ্বাস উঠছে এবং শিক্ষার্থী ও অভিভাবকগন যেভাবে হেনস্তা হচ্ছে তাতে এত পরীক্ষা না রেখে কর্মজীবনে নিয়োগের সময় একটি পরীক্ষা নেয়াই ভাল প্রতীয়মান হচ্ছে। সময় ও প্রযুক্তির উন্নয়নের বিষয়গুলিকেও বিবেচনায় নিতে হবে।

সদ্য শিক্ষা জীবন সমাপ্তকারী বা চাকুরী প্রার্থীকে মূল্যায়নের মাধ্যমে বাছাই করে নেবে মূলত কর্মদাতা প্রতিষ্ঠান। এটি প্রতিষ্ঠান করবে তার নিজ স্বার্থে বা প্রয়োজনে। কাজের ধরণ ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে যাচাই বাছাই করার প্রয়োজনীয়তাটি সেখানে গুরুত্বপূর্ণ। সেটিই হবে প্রকৃত মূল্যায়ন। তবে এটি করতে গিয়ে নিয়োগদাতা ব্যাক্তি বা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহায়তা নিতে পারে। সে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে উচ্চ মাধ্যমিকের পরের স্তরে অর্থাৎ উচ্চতর পর্যায়ে গ্রেডিং ভিত্তিক মূল্যায়ন করা যেতে পারে। যেটি কর্মদাতা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রাথমিক বাছাইকরণ হিসেবে সহায়ক হতে পারে। অনেক নিচের শ্রেণীগুলিতে এসবের প্রয়োজনীয়তা নেই।

কেবল শ্রেণী কক্ষে নয়, কর্ম জীবনেও মানুষ সহকর্মীদের থেকে কাজ শেখে বা বুঝে নেয়। সহকর্মীরাও গুরুত্বপূর্ণ। কাজের প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষনের মাধ্যমেও শিক্ষা লাভ করে। কর্মক্ষেত্রে নিজে কাজ করতে গিয়েও শেখে। ফলে শিক্ষা জীবনে তাত্ত্বিক জ্ঞানে অধিক ভাল ফলাফল করাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। শিক্ষা জীবনে বিষয়ের সাধারণ জ্ঞানটুকু অর্জন করা গুরুত্বপূর্ণ এবং

সেটি সকলকেই গ্রহণ করতে হবে। যে নিজেকে ফাঁকি দেবে সে নিজ দায়িত্বে তার ঘাটতি পুরণ করে নেবে, যদি ভবিষ্যতে ভাল করতে চায়।

২.৬ বাস্তবতা

সমগ্র পৃথিবীতে যত শত কোটি মানুষ আছে শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত, প্রতিটি মানুষ প্রতি বেলা আহার করছে। এখানে কেবল আহার করাকে বিবেচনায় নেয়া হল। অথচ মানব জীবনে আছে আরও কত বিষয়! কেবল আহার করার বিষয়টিকে বিবেচনায় নিলেই বোঝা সহজ হয়ে যায় যে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই রয়েছে অর্থ প্রবাহের প্রয়োজনীয়তা। প্রতিটি মানুষ কেবল তার আহারের প্রয়োজনে হলেও কোন না কোন উপায়ে অর্থ সংস্থানের একটি ব্যবস্থা দাড় করিয়েছে। মানুষের অর্থ সংস্থানের বিষয়টি অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ। যখন বেঁচে থাকার প্রশ্নটিই বড় হয়ে দেখা দেয় তখন নিয়ম-পদ্ধতি, নীতি-নৈতিকতার বিষয়গুলি বড় নয়।

যে শিশুটি আজ শিক্ষার্থী, একদিন তাকেও আহারের প্রয়োজনে উপার্জন করতে হবে। কর্মের এত সংস্থান কোথায়? কে করবে? আজকের শিক্ষার্থীদের অনেককে কোচিং প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেও জীবন ও সংসার চালাতে হতে পারে।

কোচিং বন্ধ করে দিলে তাদের কর্ম-সংস্থান কোথায় হবে? নোট বইয়ের ব্যবসা বন্ধ করে দিলে তারা কোথায় যাবে? বিকল্প ব্যবস্থা সৃষ্টি না করা বা হওয়া পর্যন্ত মুখের আহার তো কেড়ে নেয়া যাবে না। উপায় সন্ধান ও উদ্ভাবন করতে হবে। তা সত্বেও বর্তমান বিদ্যমান ব্যবস্থায় যেটি অত্যান্ত জরুরী তা হল- শিশুদের ওপর নানাবিধ অপ্রয়োজনীয় চাপ কমানো।

তৃতীয় পর্ব

একটি স্বপ্ন বা কল্পনা (A Vision)

ওপরে যেসব প্রস্তাবনার উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলি করা হয়েছে বিদ্যমান ব্যবস্থাকে বিবেচনায় রেখে। বস্তুত পরীক্ষা নিয়ে দেখা ভবিষ্যত স্বপ্নটি তেমন নয়। স্বপ্ন যদি কোনদিন বাস্তব রূপ লাভ করে, তবে ওপরের প্রস্তাবনাসমুহ সেক্ষেত্রে আর প্রয়োজনীয় গন্য হবে না। পরীক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতের আলোকে দেখা স্বপ্ন বা কল্পনাটি এমন-

পরীক্ষা : একটি স্বপ্ন বা কল্পনা

একটি ছেলে মাছ ধরার জন্য ছিপ ফেলে ছোট্ট ডিঙ্গি নৌকায় বসে অপেক্ষায় রত। নদীর কিনারায় গাছের ছায়ায় ডিঙ্গিতে বসে মোবাইল ফোনে গেম খেলছে। গেমের এক একটি লেভেল পেরুচ্ছে এবং স্কোর দেখতে পাচ্ছে।

যেদিন সব লেভেল সমাপ্ত করে সম্পূর্ণ গেমটি সম্পন্ন হল, সেদিন পূর্ণাঙ্গ স্কোর সহ সনদ চলে এলো। সিলেবাস বা পরিকল্পনা অনুসারে এ বছর যে ক'টি গেম সমাপ্ত করতে হবে, যেদিন সবগুলি গেম সম্পন্ন হবে, স্কোর সহ ঐ বছরের কোর্স সমাপ্তির সনদ চলে আসবে।

গেম খেলার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী লেখাপড়ার এক স্তর থেকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত হবে। কোন বিষয়ে সহযোগীতার প্রয়োজন হলে অন লাইনে ফি প্রদান করে সংশ্লিষ্ট বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান থেকে সহযোগীতা চাইতে পারে- সফলভাবে গেম সমাপ্ত করে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য। অর্থাৎ লেখাপড়াকে কম্পিউটার গেমে রূপান্তরীত করে দেয়া হবে।

শিক্ষার্থীরা কম্পিউটারে গেম খেলতে পছন্দ করে। এক একটি শ্রেণীর এক একটি বিষয়ের পাঠ্য বইয়ের জন্য বিষয়ভিত্তিক গেম থাকবে। একটি বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত এক একটি চ্যাপ্টারের আলোকে গেমের এক একটি লেভেল হতে পারে। অর্থাৎ গেম সমুহের লেভেল হবে বিষয়ের এক একটি চ্যাপ্টার। বিষয়ভিত্তিক কোন গেমের প্রতিটি লেভেল উত্তীর্ণ হলে সম্পূর্ণ বইটি অধ্যায়ন সমাপ্ত হল বলে ধরে নেয়া হবে।

এক একটি লেভেল পেরিয়ে সম্পূর্ণ গেমটি সমাপ্ত হলে শিক্ষার্থী ঐ বিষয়ে পরবর্তী ধাপে উন্নীত হবে। গেমে প্রাপ্ত স্কোর থেকে শিক্ষার্থীর ফলাফলজনিত অবস্থা ও অবস্থান জানা যাবে। এর ফলে পরীক্ষার ফলাফলকে মানবিক ত্রুটির প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা সম্ভব হবে। নীচের দিকের ক্লাসগুলিতে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

গেমসমুহে অংশগ্রহণের বিষয়টি উন্মুক্ত থাকতে পারে। অর্থাৎ যে যখন যেটি সমাপ্ত করবে সে তখনই সে বিষয়ে উত্তীর্ণ হবে। কেন্দ্রীয়ভাবে পরিক্ষার্থীর স্কোর সংরক্ষিত হয়ে যাবে। কেন্দ্রীয়ভাবে শিক্ষার্থী কোন বিষয়ে কোন পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে তার সনদ প্রদান করা যেতে পারে।

পাঠক, লেখাটি কেবলি একটি ধারণা মাত্র। (লেখা ২০১৭)

বৃদ্ধাশ্রম ও ইসলাম

(Old Home and Islam)

টেলিভিশনে একটি বিজ্ঞাপন দেখছিলাম। বিজ্ঞাপনে বলা হচ্ছে, 'ইসলামে বৃদ্ধাশ্রম বা ওল্ড হোমের কোন স্থান নেই'। শুনে মর্মাহত হলাম।

কোন বিষয়ে নিজের ব্যাখ্যা বিশ্লেষন বা মতামত ব্যাক্ত করার অধিকার সকলের আছে। সেটি করা যেতেই পারে। কিন্তু ইসলামের নামে যখন তেমনটি করা হয়, তখন বিষয়টি আর ছোট্ট পরিসরে থাকে না। সমগ্র মুসলিম জাহানের ওপর বর্তায়।



ইসলামের নামে যখন কোন সিদ্ধান্ত দেয়া হয়, তখন সেটি প্রকারন্তরে আল্লাহর নামে করা হয়। আল্লাহর নামে যখন কোন বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়, তখন সেটি করার অধিকার কোন একক মানুষের বা গোষ্ঠীর আছে কি না সে প্রশ্নটি চলে আসে?

যারা ইসলামের নামে নিজেদের কোন বিষয়ে রায় দেয়ার যোগ্য বলে বিবেচনা করেন, তারা কি নিশ্চিত যে তারাও ভূল করছেন না? এক সময় একদল মানুষ ইংরেজী শিক্ষাকেও হারাম ঘোষনা করেছিল। সে সময়কালে এ বিষয়ে বলার মত তারাই সর্বোচচ শিক্ষিত বলে বিবেচিত ছিল। সভ্য সমাজে সকলেরই মতামত প্রদানের অধিকার আছে। এটিও একটি মতামত মাত্র।

প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও কোরআনের নিচের আয়াতটিতে একটি দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়। আয়াতটিতে আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ করা হয়নি তেমন কোন বিষয়কে 'নিষিদ্ধ ঘোষনা' করতে স্বয়ং নবীকেও নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। বলা হচ্ছে,

"হে নবী! আল্লাহ ... যা আইনসিদ্ধ করেছেন ... কেন তুমি তা নিষিদ্ধ করছো?" (আল কোরআন ৬৬:১)

আল্লাহ কি বৃদ্ধাশ্রমের বিষয়টি সরাসরি নিষিদ্ধ করেছেন? আল্লাহর নামে যখন কোন কিছু নিষেধ করা হয়, তখন সেটি কোরআনের আলোকে হতে হয়। আর

ইসলামের নামে করতে হলে কোরআন বা হাদিসের আলোকে হতে হবে। ফলে এ ধরণের একটি বিজ্ঞাপন প্রচারের ক্ষেত্রে অসংখ্য হাদিসের কোথায় তেমন নির্দেশনা আছে সেটি পাশাপাশি উল্লেখ করা প্রয়োজন ছিল। কেননা কোরআনে সরাসরি তেমন কোন নির্দেশনা নেই।

আল্লাহ কর্তৃক যে সময়ে নানাবিধ বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছিল, সে সময়ে আজকের মত বৃদ্ধাশ্রমের ধারণাটি সমাজে বিদ্যমান ছিল কিনা সেটিও একটি প্রশ্ন? কেননা তৎকালীন সময়ে বিষয়টির বিদ্যমানতা না থাকলে সেটি তখন নিষিদ্ধ হওয়ারও প্রশ্ন আসে না। বিষয়টি সে সময়কালে নিষিদ্ধ না হলে এটি বর্তমান সময়ে নিষিদ্ধ করা হচ্ছে বলে ধরে নেয়া যায়। অর্থাৎ আল্লাহ নিষেধ করেন নি। আমরাই করছি।

ইসলাম তথা আল্লাহর নামে যখন কোন সিদ্ধান্ত বা রায় প্রদান করা হয়, তখন সেটি সমগ্র মুসলিম জাহানের সকলের ওপর প্রযোজ্য হয়। যেমন, পবিত্র কোরানে অন্যায়ভাবে মানুষকে হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে। এটি নিষিদ্ধ এবং সর্বজন স্বীকৃত ও গৃহীত। এ বিষয়ে দ্বি-মত করার কোন অবকাশ নেই। এটি স্পষ্টতই নিষেধ বলে প্রচার করা যেতে পারে। কিন্তু বৃদ্ধাশ্রমের বিষয়টি কোরআন বা হাদিসে যদি সুনির্দিষ্টভাবে নিষিদ্ধ না হয়ে থাকে, তবে এমন প্রচারনা মুসলিম সমাজে বিভ্রান্তি ছড়াবে।

আল্লাহর নামে যখন কোন নির্দেশনা জারি করা হয়, তখন সকলের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে ধারণাগতভাবে সেটি সমগ্র মানব জাতির ওপরও বর্তায়। তাতে কেউ আল্লাহতে বিশ্বাস করুক কিংবা না করুক। কেননা তিনি সকল মানুষের জন্য বার্তা প্রেরন করেন। কোন দল বা গোষ্ঠী বিশেষের জন্য নয়। কিন্তু জগতের সকল মানুষের সুবিধা-অসুবিধাগুলি একই প্রকারের নয়। তাই বিচার-বিবেচনাহীনভাবে আল্লাহ কখনও বিধি-নিষেধ আরোপ করেন না।

অতি উৎসাহী অনেককে আজকাল ফেইস বুকে বৃদ্ধাশ্রমের বিপক্ষে পোষ্ট করতে দেখা যায়। এদের বেশীরভাগ কোন একটি বিষয় নিয়ে নিজেরা ভাবে না। তারা কেবল অনুসরণ করে। যদিওবা কখনও ভাবে, তো নিজেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও অবস্থান থেকে ভাবে। বিপদাপন্ন মানুষের অবস্থা ও অবস্থান থেকে ভাবতে পারে না। কেননা তারা বিপদাপন্ন মানুষের বিপদ দেখেনি।

গ্রামীন যৌথ-পারিবারিক কাঠামোতে এক সময় যা উপযোগী ছিল, বর্তমান শহুরে এককেন্দ্রিক পারিবারিক কাঠামোতে- যেখানে পরিবারের সকল সদস্য প্রাতিষ্ঠানিক নানান কর্মে নিয়োজিত, সেখানে আরেক ধরণের সুবিধা-অসুবিধা বিদ্যমান। এর সঙ্গে আরও অনেক বিষয় জড়িত। পরিবারের সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক, এমন কি সমাজ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নেরও ভূমিকা রয়েছে। প্রযুক্তির উন্নয়ন সামাজিক ও পারিবারিক কাঠামোতে পরিবর্তন আনয়নে ভূমিকা রাখে। আর্থ-সামাজিক ও পারিবারিক কাঠামোতে পরিবর্তন এলে নতুনভাবে অনেক প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি হয়। আবার পুরোনো কিছুর বিলুপ্তি ঘটে।

স্থান-কাল-পাত্রভেদে বৃদ্ধাশ্রমের সুবিধা-অসুবিধা আছে। এর পক্ষে-বিপক্ষে বলার আছে। বৃদ্ধাশ্রম প্রথমত: কোন নিষিদ্ধ বিষয় নয়। এটি কোন অপরাধমূলক কর্মকান্ডের সাথে সম্পর্কিত বিষয় নয়। দ্বিতীয়ত: বর্তমান পরিবর্তীত আর্থ-সামাজিক ও পারিবারিক কাঠামোতে এটি এখন একটি প্রয়োজনীয়তা। তাই ইসলামে বৃদ্ধাশ্রমের কোন স্থান নেই এমন সিদ্ধান্ত, রায় বা বক্তব্য প্রদান না করা উত্তম। এমনটি করা হলে প্রকারান্তরে আল্লাহর অবস্থা ও অবস্থানকে বিতর্কিত ও ছোট করা হবে। কেননা বিপদগ্রস্ত ব্যাক্তি এমন সিদ্ধান্ত মানতে পারবে না। ফলে সে অনিচ্ছা সত্বেও আল্লাহর আদেশের বিরুদ্ধাচারণকারীরূপে প্রতীয়মান হবে- কেবল একটি ভূল বক্তব্য বা সিদ্ধান্ত প্রচারের কারনে।

মাটির নিচে যখন বিস্ফোরন ঘটে, সেখানেও একটি পথ খুঁজে নিয়ে লাভাগুলি বেড়িয়ে আসে। আল্লাহ সকল কিছুর জন্য পথ, উপায় বা ব্যবস্থা রেখেছেন। যেখানে পথ নেই, সেখানেও তিনি একটি উপায় বা পথ রেখেছেন।

"... যে পালনকর্তা আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন করে, আল্লাহ তার জন্য নিস্কৃতির পথ/উপায় করে দেবেন।" (আল কোরআন ৬৫:২)

বিপদাপন্নের জন্য বৃদ্ধাশ্রম তেমনি একটি উপায়, পথ বা ব্যবস্থা। ইসলাম একটি উদার ও প্রগতির ধর্ম। বিপদাপন্নের জন্য ইসলামের দিক নির্দেশনায় উদারতা আছে। নিয়মের কঠোরতার কারনে সৃষ্ট স্থবিরতাকে ইসলাম কোন ক্ষেত্রেই প্রশ্রয় দেয়নি। সমাজকে ন্যায়ের সাথে চলমান রাখতে উপায় প্রদর্শন করেছে ইসলাম। প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছে ইসলাম। কোরআনে তেমন অনেক উদাহরণ আছে। নিয়মের ক্ষেত্রে ইসলাম কিভাবে নমনীয়তা প্রদর্শন করেছে, নিচের আয়াতসমুহ পর্যালোচনা করলে বিষয়টি বোঝা

সহজ হয়ে যাবে। প্রেক্ষিত ভিন্ন হলেও মর্ম কথাগুলি বোধসম্পন্ন মানুষ নিশ্চয়ই অনুধাবনে সমর্থ হবেন।

".. আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ পথটিকেই নির্দেশ করেন; তিনি তোমাদের জন্য কঠিন নিয়ম প্রবর্তনের ইচ্ছে করেন না .." (আল কোরআন ২:১৮৫)

"তিনি তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন শুধুমাত্র ... কিন্তু যে অনন্যোপায় হয়ে তা করে, ইচ্ছেকৃত বা সীমালংঘনকারী হিসেবে নয়, তার জন্য সেটি পাপ নয়। ...।" (আল কোরআন ২:১৭৩)

ওপরের আয়াতে কিছু খাদ্যকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু পরিস্থিতির কারনে বাধ্য হয়ে কেউ তেমন খাদ্য গ্রহণ করলে তাতে পাপ নেই। তেমন ক্ষেত্রে সেটি নিষিদ্ধ থাকে না।

"... যদি পানি না পাও, তবে তোমরা কোন উচ্চস্থান থেকে পরিচ্ছন্ন মাটি সংগ্রহ করে নাও এবং তার দ্বারা স্বীয় মুখমন্ডল ও হস্তদ্বয় মুছে ফেল। আল্লাহ তোমাদের ওপর কোনরূপ বোঝা আরোপ করতে চান না। ...।" (আল কোরআন ৫:৬)

অজু করার সুনির্দিষ্ট নিয়ম আছে। কিন্তু পানি না পেলে বিকল্প উপায়ের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ কোন ক্ষেত্রেই মানুষের উপর কোনরূপ বোঝা চাপিয়ে দেননি। বরং যখন কোন উপায় নেই সেখানেও বিকল্প পথ খোলা রেখেছেন।

"... কিন্তু যে বাধ্য হয়ে করেছে অবাধ্যতা কিংবা সীমালংঘন করে নয় নিশ্চয়ই! তোমার পালনকর্তা ক্ষমাশীল, দয়ালু।" (আল কোরআন ৬:১৪৫)

কোন পরিস্থিতিতে উপায় না পেয়ে কেউ কোন নিষিদ্ধ কাজ করতে বাধ্য হলে সে কাজ সীমালংঘনরূপে বিবেচিত নয়। তেমন ক্ষেত্রে আল্লাহ ক্ষমাশীল। কোরআনে এমনি আরও উদাহরন রয়েছে।

আল্লাহ সর্বক্ষেত্রে বিকল্প উপায়ের ব্যবস্থা রেখেছেন। নিষিদ্ধ কাজও প্রয়োজনীয় বিবেচনায় করা যেতে পারে। তবে অবশ্যই সে কাজটি যথাসাধ্য না করার চেষ্টা থাকতে হবে।

বৃদ্ধাশ্রমের মত অতি প্রয়োজনীয় বিষয়টি কোনভাবেই নিষিদ্ধ কাজের মধ্যে পড়ে না। এটি কোন অবৈধ বা অপরাধমূলক কাজ বা ব্যবস্থা নয়। এটির সাথে

পাপেরও কোন সম্পর্ক নেই। উপরন্তু বিপদাপন্নের জন্য এ ব্যাবস্থা একটি প্রয়োজনীয়তা বা আশীর্বাদস্বরূপ।

বিপদে পরেই মানুষকে বৃদ্ধাশ্রমে আসতে হয়। আবার বিপদে পরেই সন্তান পিতামাতকে বৃদ্ধাশ্রমে রাখতে বাধ্য হয়। বৃদ্ধাশ্রমের বিপক্ষে প্রচারণা বিপদগ্রস্থ, উপায় ও অবলম্বনহীনকে সামাজিকভাবে আরও বিপদাপন্ন করে তোলে। বাধ্য হয়ে যাদেরকে বৃদ্ধাশ্রমের আশ্রয় নিতে হয়, এমন প্রচারণার ফলে সমাজে তাদেরকে নানান বিরূপ অবস্থার মুখোমুখী হতে হয়। বিপদগ্রস্থকে হেয় করা কিংবা অধিকতর বিপদে ফেলে দেয়া কোন ধর্মের কাজ নয় এবং ইসলামের তো নয়ই।

প্রশ্ন হচ্ছে যারা বৃদ্ধাশ্রমের বিপক্ষে প্রচারণা করেন তারা কি বিষয়গুলি জানেন না বা বোঝেন না? নিশ্চয়ই তারা বোঝেন। তাহলে মতপার্থক্যটি কোথায়?

কোন বিষয়ে পক্ষে বা বিপক্ষে কথা বলা এ লেখার উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে, সঠিক ও সত্যটিকে বুঝতে চেষ্টা করা। ফলে যারা বৃদ্ধাশ্রমের বিপক্ষে প্রচারণা করেন, তাদের স্বপক্ষে যুক্তিটি কি সেটিও জানা ও বোঝার চেষ্টা করতে হবে।

যারা বৃদ্ধাশ্রমের বিপক্ষে প্রচারণা করছেন তারা কাজটি করছেন ইসলামের নামে। তাই তাদের স্বপক্ষের যুক্তিগুলি বুঝতে হলে ইসলামে এ বিষয়ে কি নির্দেশনা আছে তা জানতে হবে। ইসলামের নির্দেশনার মূল উৎস কোরআন। পবিত্র কোরআনে বৃদ্ধাশ্রম বিষয়ে সরাসরি কোন নির্দেশনা নেই। কোরআনে পিতামাতা সম্পর্কিত যে সব আয়াত রয়েছে, তার সবগুলির মূল বক্তব্য নিচে উল্লেখিত আয়াতগুলিতে উঠে এসেছে। কোরআনে পিতামাতার প্রতি সদয় আচরণ করতে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে,

"... পিতা-মাতার প্রতি সদয়তা প্রদর্শন কর ...।" (আল কোরআন ৪:৩৬)

"... তোমরা পিতা-মাতার সঙ্গে সদয় ব্যবহার করবে ...।" (আল কোরআন ৬:১৫১)

"তাদের (পিতা-মাতার) প্রতি দয়া পরবশে বিনম্রভাবে পক্ষপুট অবনোমিত করে দাও ...।" (আল কোরআন ১৭:২৪)

"তোমার পালনকর্তার করুণার প্রত্যাশায় যদি কখনও তাদেরকে (মাতা-পিতাকে) বিমুখ করতে হয়, তবে তাদের সঙ্গে সদয়/যুক্তিসম্মতভাবে কথা বল।" (আল কোরআন ১৭:২৮)

"আমি মানুষকে পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার জোর নির্দেশ দিয়েছি ...।" (আল কোরআন ২৯:৮)

"এবং আমি মানুষকে তার পিতা-মাতা সম্পর্কে (সদ্ব্যবহারের) নির্দেশ দিয়েছি- তার মাতা কষ্টের পর কষ্ট করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং তার দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত দু'বছর- আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং তোমার পিতা-মাতার প্রতিও। ...।" (আল কোরআন ৩১:১৪)

"মানুষকে তার পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছি ...।" (আল কোরআন ৪৬:১৫)

অপরদিকে, পিতা-মাতার প্রতি অসদাচরণ করতেও নিষেধ করা হয়েছে। বলা হচ্ছে,

"... এবং পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয় তবে তাদেরকে 'উহ' শব্দটিও বল না এবং তাদের সঙ্গে শিষ্ঠাচারপূর্ণ কথা বল।" (আল কোরআন ১৭:২৩)

মাতা-পিতার জন্য ব্যায় করার নির্দেশনা রয়েছে। বলা হচ্ছে,

"(হে মোহাম্মদ) তারা তোমার কাছে জানতে চায়ঃ কি তারা ব্যায় করবে? বলঃ ভালর জন্য যাই তোমরা ব্যায় কর তা অবশ্যই হতে হবে পিতা-মাতার জন্য ...।" (আল কোরআন ২:২১৫)

পিতা-মাতার জন্য সন্তানদেরকে প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে।

"... বলঃ হে আমাদের পালনকর্তা! তাদের উভয়ের প্রতি তুমি তেমনিভাবে দয়া কর, যেমনিভাবে তারা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছে।" (আল কোরআন ১৭:২৪)

পিতা-মাতা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে যা বলা হয়েছে তার প্রায় সব আয়াত ওপরে তুলে ধরা হয়েছে। মাতা-পিতা সম্পর্কিত কোরআনের আয়াতগুলিতে 'ইসলামে ওল্ড হোমের স্থান নেই' এই কথাটির স্বপক্ষে কোন বক্তব্য নেই। যারা এ বক্তব্যের স্বপক্ষে প্রচারণা করেন, তাদের কাছে হাদিসের আলোকে তেমন কোন সূত্র জানা থাকলে, এ প্রচারণার পাশাপাশি হাদিসগুলিও তুলে ধরা উত্তম। হারাম-হালাল হতে হলে সেটি কোরআন কিংবা হাদিসের আলোকে হতে হয়। এছাড়াও কোন গোষ্ঠী বা কর্তৃপক্ষের মতামতের ভিত্তিতেও এমন সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে।

সেক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, এর বিপরীত মতামতও আছে। ফলে এভাবে ইসলামের নামে সিদ্ধান্ত বা রায় প্রদান ও প্রচারণা না করা শ্রেয়।

যারা বৃদ্ধাশ্রমের বিপক্ষে কথা বলেন, বস্তুত তারা বৃদ্ধাশ্রমের বিপক্ষে কথা বলেন না। তারা কথা বলেন পিতা-মাতার প্রতি সন্তানদের সম্ভাব্য অসদাচরণের আশংকার বিপক্ষে। তবে তারা বৃদ্ধাশ্রমের বিপক্ষে কথা বলেন- কারন তারা ধরে নিয়েছেন যে, বৃদ্ধাশ্রম থাকলে বৃদ্ধ অসহায় পিতা-মাতাকে সেখানে পাঠাতে সন্তানদের জন্য একটি সুযোগ সৃষ্টি হবে। এ ব্যবস্থা থাকলে সন্তানরা প্রয়োজনে সে সুযোগ নিতে পারবে। তাদেরকে সেখানে প্রেরণ করাকে অসদাচরণ হিসেবে ধরে নেয়া হচ্ছে। এ ব্যবস্থা না থাকলে পিতা-মাতাকে সেখানে প্রেরণ করা সম্ভব হবে না। নিজেদের সঙ্গে রাখতে বাধ্য হবে। সেটি হবে তাদের প্রতি সন্তানদের করা সদাচারণ। অর্থাৎ বুদ্ধি-সম্মতভাবে তাদেরকে সেটি করতে বাধ্য করানোর এটি একটি প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে। অতি ভক্তি প্রদর্শনের মনোবৃত্তি থেকে এর উৎপত্তি। আবার সমাজে এ মনোবৃত্তি সরল প্রাণ সাধারণ মানুষের দ্বারা সহজে গ্রহণযোগ্য ও প্রশংসিত।

বৃদ্ধাশ্রমকে নিয়ে যারা এভাবে বিরূপ মনোভাবে পোষন বা প্রদর্শন করে, তারা সেটি করে কেননা- তারা ধরে নিয়েছে যে, পিতা-মাতাকে বৃদ্ধাশ্রমে রাখার অর্থ হচ্ছে তাদের প্রতি নির্দয়, নিষ্ঠুর ও অসদাচরণ করা। উপরন্তু এর সাথে 'অকৃতজ্ঞতাবোধ' শব্দটিও যোগ করা যেতে পারে।

যারা এভাবে ভাবে তারা কি একবারও ভেবে দেখেছেন যে, বৃদ্ধাশ্রম না থাকার কারনে যে সন্তানটি পিতা-মাতাকে নিজের সঙ্গে রাখতে বাধ্য হচ্ছে, সেটিও প্রচ্ছন্নভাবে এক ধরণের অসদাচরণ? অর্থাৎ তার মন বিকল্প কিছু প্রত্যাশা করছে, কিন্তু উপায় নেই বলে একসঙ্গে রাখছে। তেমন একজন যে পিতামাতাকে ঘরে রেখেও অসদাচরণ করতে পারে সে সম্ভাবনাটিকে কি ভেবে দেখা হচ্ছে? আমরা কি কৃত্রিম উপায়ে বাধ্য করার মাধ্যমে একটি সমস্যার সমাধান করবো, নাকি স্বতঃস্ফুর্ততার সাথে সকলের গ্রহণযোগ্য কোন উপায়ে সমস্যা সমাধানের কথা বিবেচনা করবো? এগুলি কৃত্রিম সদাচরণ! যার ভেতরে প্রাণ নেই। নেই বিচার-বিবেচনা। আছে সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের চেষ্টা।

চাকুরীর প্রয়োজনে আজকাল দুধের শিশুটিকেও অনেকে কাজের লোকের কাছে রেখে বাসায় তালা দিয়ে অফিসে চলে যায়। এটি অনেক বেশী ঝুঁকিপূর্ণ। এটিকেও

শিশুর প্রতি অবহেলা বা অসদাচরণ ভাবা যেতে পারে। তবুও মানুষ জীবনের প্রয়োজনে তেমনটি করতে বাধ্য হচ্ছে। মাতা-পিতার ক্ষেত্রেও কিছু মানুষ বাধ্য হয় বৃদ্ধাশ্রমের স্মরণাপন্ন হতে। যেটি ওপরের উদাহরনটির চেয়ে কম ঝুঁকিপূর্ণ। উপরন্তু সঠিক ব্যবস্থাপনা বিষয়টিকে স্বাচ্ছন্দপূর্ণ করে তুলতে পারে।

আজকের পৃথিবীতে বৃদ্ধাশ্রম একটি প্রয়োজনীয়তা। এমন প্রয়োজনীয়তা যা পুরণের মধ্যে কোন পাপ নেই। বরং যথাযথভাবে বুঝতে জানলে পূন্য আছে।

স্থান-কাল-পাত্রভেদে কোটি মানুষের কোটি রকমের সমস্যা বা অসুবিধা আছে। কারও পক্ষে সকল প্রকারের সমস্যার কথা জানা সম্ভব নয়। সবরকম সমস্যার একটিই সমাধান হতে পারে না। তাহলে একই শর্করা জাতীয় খাদ্যের জন্য সৃষ্টিকর্তা এত রকমভেদের খাবার প্রেরণ করতেন না। মানুষের পছন্দ-অপছন্দেরও উর্ধ্বে উঠে এক এক প্রকার দেহ-মন তথা মানুষের জন্য, এক একটি খাবারের ভিন্ন ভিন্ন রকমের উপযোগীতা আছে। যার জন্য যেটি উপযোগী তার জন্য সেটিই প্রযোজ্য।

বিচিত্র পৃথিবীতে এমনও মানুষ আছে যারা নিজেরাই এ ব্যবস্থাকে নিজেদের বৃদ্ধ বয়সের জন্য পছন্দ বা যথাযথ বিবেচনা করে। কিছু মানুষ বৃদ্ধ বয়সে নিজেরাই বৃদ্ধাশ্রমে থাকতে ইচ্ছুক হতে পারে। তারা কেন তেমন মনোভাবাপন্ন হবে- সেটি এ লেখার আলোচ্য কিংবা বিবেচ্য বিষয় নয়। সেটি নিয়ে পৃথকভাবে গবেষনা করা যেতে পারে। কিন্তু আল্লাহর নির্দেশ তো শাশ্বত- চিরন্তন! ব্যাক্তিতে ব্যাক্তিতে জাগতিক বিষয়াবলীর বিচার বিশ্লেষন, ব্যাখ্যা ও অভিজ্ঞতা পার্থক্যপূর্ণ হওয়ার কারনে এমনটি হতে পারে। যে কারনেই হোক না কেন, উপলব্ধিবোধসম্পন্ন কিছু মানুষের কাছে সুন্দর একটি বৃদ্ধাশ্রম স্বপ্নের স্থান হতে পারে। তেমন মানুষের সংখ্যা আজকের দিনে কম হলেও এটি যে বৃদ্ধি পাবে না তা বলা যায় না। প্রত্যেকেরই স্বাধীনতা আছে তার পছন্দের স্থানটি বেছে নেয়ার। কিন্তু যদি বৃদ্ধাশ্রমকেই নিষিদ্ধ ঘোষনা করা হয়, তবে মানুষ কিভাবে তার পছন্দের স্থানটিকে বেছে নেবে? এখানে অবস্থান করাটি অশালীনও নয়, অবৈধও নয়। এমনকি নিষিদ্ধ হওয়ার মত এটি কোন অপরাধমূলক বিষয়ও নয়।

সন্তানের সঙ্গে একত্রে বসবাস করেও অনেক পিতা-মাতা কষ্টে দিনযাপন করে। কষ্টের সাথে সন্তানের সঙ্গে বসবাস করার চেয়ে বৃদ্ধাশ্রমে যদি তুলনামূলক ভাল থাকা যায় এবং সেটি যদি সকলের জন্য মঙ্গলকর হয় এবং সকলের স্বতঃস্ফুর্ত

সম্মতিতে হয় তবে তাতে বাধা কিসে? কিন্তু তার জন্য তো বৃদ্ধাশ্রম থাকতে হবে। তাকে নিষিদ্ধ ঘোষনা করলে তো উপায় বা পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

চাকুরিজীবি সন্তান পিতা বা মাতাকে একা একটি ঘরে নিঃসঙ্গ রেখে অফিসে যাওয়ার চেয়ে বৃদ্ধাশ্রমে রাখা শ্রেয়। সেখানে নার্সিং এর সুবিধা থাকে। কিছু সঙ্গী সাথীও পাওয়া যায়। অথচ অনেকে ঘরে থেকেও সারাদিনে সন্তানের মুখ দেখতে পায় না।

চাকুরীর প্রয়োজনে একমাত্র অবিবাহিত সন্তান বিদেশে চলে গেল। নির্ভরশীল তেমন পিতা-মাতার জন্য বৃদ্ধাশ্রমের ধারণা মন্দ নয়। যারা অবৈধ উপায়ে বা ছল-চাতুরী করে উপার্জন করেনি এবং বাড়ী নির্মান করেনি- তাদের জন্য এটি একটি ব্যবস্থা হতে পারে। এমনকি নিঃসন্তানদের জন্যও এটি একটি উত্তম স্থান হতে পারে। এভাবে এর উপকারীতার বিষয়ে বলে শেষ করা যাবে না। নানান কারনে বৃদ্ধাশ্রমের প্রয়োজনীয়তা আছে।

নিরূপায় হয়ে পিতামাতাকে আবার কোন নিকটাত্মীয়ের কাছেও রাখা যেতে পারে। বিষয়টি বৃদ্ধাশ্রমে রাখার মতোই। বরং সেক্ষেত্রে আরও বড় ধরণের সমস্যারও সৃষ্টি হতে পারে। নিকটাত্মীয়দের কাছে রাখার সমস্যা অনেক। ভূক্তভোগী জানে। সমস্যা সমাধানে প্রত্যেককে তাই নিজের মত করে ভাবতে দেয়া ভাল। এটি করা যাবে, এটি করা যাবে না এমন নিয়ম-কানুন, বিধি-নিষেধ আরোপ না করা উত্তম। বিপদগ্রস্তকে অধিকতর বিপদে ফেলে দেয়া ধর্মের বিধি-বিধানের কাজ না বা হতে পারে না।

যাদের নিজেদের বিবেক-বিবেচনা, বিচার-বুদ্ধি আছে, তারা এমন প্রচারণায় মোটেও বিচলিত নয়। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ যারা অন্যকে অনুসরণ করে চলে তারা এসব বার্তায় সমস্যায় পতিত হয়। এমনকি শেষোক্ত ধরণের লোকের কারনে প্রথমোক্তদেরকেও সামাজিকভাবে কিছুটা বিব্রতকর অবস্থায় পরতে হয়। আর এটি হয় বিবেচনাহীনভাবে অপ্রয়োজনীয় কিছু বক্তব্য প্রদানের কারনে।

পিতা-মাতা বৃদ্ধাশ্রমে থাকার মানে এই নয় যে তারা সন্তান থেকে বিচিছন্ন হয়ে গেল। যাদের ভাগ্যে বিচিছন্নতা আছে তারা একসঙ্গে থেকেও বিচিছন্ন। এমনকি একসঙ্গে থেকেও অনেকে দুর্ব্যাবহারের স্বীকার।

উন্নত যোগাযোগের বর্তমান যুগে বৃদ্ধাশ্রমের বিষয়টিকে আগের মত করে দেখার সুযোগ নেই। সামনে দিন আরও পরিবর্তন হতে পারে, উন্নত হতে পারে। কিন্তু আল্লাহর নির্দেশ তো শাশ্বত- চিরন্তন! তাই এভাবে না বলাই ভাল।

বৃদ্ধাশ্রমকে কষ্টের জায়গা বলে মনে করা সঠিক নয়। সুযোগ-সুবিধার অপ্রতুলতা বা অব্যবস্থাপনার কারনে তেমনটি মনে হতে পারে। এমন সুশাসনের অভাব তো হাসপাতাল থেকে শুরু করে সর্বত্র আছে। সেগুলি দুর করতে হবে। কিন্তু বৃদ্ধাশ্রমকে নিষিদ্ধকরণ নয়। বরং এখানে সমবয়সীদের একসঙ্গে আনন্দময় পরিবেশে বসবাসের সুযোগ আছে। বৃদ্ধাশ্রমের সুযোগ-সুবিধা ও ব্যবস্থাপনা কি করে আরও উন্নত করা যায়, সে বিষয়ে বরং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। সে বিষয়টিতে অধিক মনযোগ দেয়া যেতে পারে।

একটি বৃদ্ধাশ্রমকে কেমন পরিবেশে গড়ে তোলা হবে তার জন্য গাইড লাইন থাকতে পারে। সেগুলি মেনে চলার জন্য সময় সময় তদারকি থাকতে পারে। থাকা খাওয়ার উন্নত পরিবেশ, বিনোদনের ব্যবস্থা, লেখা-পড়ার ব্যবস্থা, নার্সিং এর ভাল ব্যবস্থা, উন্নত চিকিৎসা-সুবিধা থাকা, পরিবারের সাথে যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থার সুবিধা রাখা ইত্যাদি বিষয়গুলির উন্নতি সাধন করা যেতে পারে। সেখানে ইচ্ছুকদের জন্য কোন কর্মের সংস্থান করা যায় কিনা সেটিও ভেবে দেখা যেতে পারে। দুঃস্থদের জন্য বিনা খরচে বা স্বল্প খরচে থাকার ব্যবস্থা থাকতে পারে .. ইত্যাদি। যাদের যোগ্যতা আছে তারা সেখানে বসে কনসাল্টেন্সি করতে পারে। নিজের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে সমাজের কল্যাণে কাজে লাগাতে পারে। অর্থও উপার্জন করতে পারে ইত্যাদি .. ইত্যাদি। অর্থাৎ বৃদ্ধাশ্রমে থেকেও যেন কেউ অনুভব করতে না পারে যে, সে অসহায় অবহেলিত হয়ে বৃদ্ধাশ্রমে পরে আছে বা সন্তানদের থেকে দুরে আছে এবং সন্তানও যেন অনুভব না করতে পারে যে, পিতা-মাতা তার থেকে দুরে আছে বা তাদের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করা হচ্ছে। বৃদ্ধাশ্রমকে তেমনভাবে গড়ে তুলতে হবে। নেতিবাচক প্রচারণা মানুষের মধ্যে বৃদ্ধাশ্রম সম্পর্কে নেতিবাচক ভাবনা প্রবেশের জন্য দায়ী। বৃদ্ধাশ্রমে একজন দুঃখিনী মায়ের কষ্টের ছবি প্রদর্শন সব কথা বলে না। তেমন ছবি কোন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাকে রূদ্ধ করে দেয়ার কোন কারন হতে পারে না। সন্তানের ঘরে থেকেও কষ্টে দিনাতিপাত করছে তেমন ছবিও প্রদর্শন করা সম্ভব।

গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কোন একটি বিষয়কে আমরা কিভাবে গ্রহণ করছি বা উক্ত বিষয়টিকে কিভাবে উপস্থাপন করছি। অর্থাৎ সমাজে, মানুষের মনোজগতে কিংবা শিশুদের মস্তিস্কে বিষয়টিকে কিভাবে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হচ্ছে। আমরা নিজেরা যদি কোন একটি বিষয়কে নেতিবাচক না ভাবি, তবে সেটি মন্দভাবে প্রতিষ্ঠা পাবে না এবং সেখান থেকেও উপকারিতা পাওয়া সম্ভব হবে। আমাদের প্রত্যেকের ভূমিকা ইতিবাচক হলে সেটি আরও ত্বরান্বিত হবে।

সামাজিকভাবে বৃদ্ধাশ্রমের বিষয়টিকে সন্মানজনক, মর্যাদাপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য করে গড়ে তুললে এ সমস্যাগুলি থাকবে না। যেমন- ডে কেয়ার বা চাইল্ড কেয়ার সেন্টারগুলিকে নিয়ে কেউ এভাবে বলছে না। তাই ভাবছে না যে, শিশুদের প্রতি অবহেলা বা নিষ্ঠুরতা করা হচ্ছে। সুন্দর পরিবেশ দিলে, যথাযথ যত্ন নিলে বৃদ্ধাশ্রমে পিতা-মাতাকে রাখার বিষয়টি তাদের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন বলে মনে হবে না। তবে পিতা-মাতাকে বৃদ্ধ বয়সে বৃদ্ধাশ্রমেই রাখতে হবে বিষয়টি এমনও নয়। যতটা সম্ভব সেটি না করা ভাল, এটি বলা যেতেই পারে।

কোন ভাল ও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা না ছড়ানোই ভাল। ব্যাক্তিগতভাবে বিষয়টিকে কেউ পছন্দ না করলে সে তার মতামত জানাতে পারে। কিন্তু ইসলামের নামে তেমনটি না করা ভাল। ইসলামের নামে এভাবে প্রচার করা হলে সেটি বোধসম্পন্ন মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে। সমাজে নেতিবাচক ধারণা না ছড়ালে বৃদ্ধাশ্রমের মত একটি অতি প্রয়োজনীয় ধারণাকে মানুষ মন থেকে আপন ভাবতে শিখবে। কোন পরিবারের সমস্যা সমাধানের জন্য এটি আশির্বাদ হয়ে উঠতে পারে।

নিঃসন্দেহে পিতা-মাতাকে নিজের সঙ্গে রাখা সন্তানের জন্য সর্বত্তম পন্থা। সন্তান যেন বৃদ্ধ বয়সে পিতা-মাতাকে বৃদ্ধাশ্রমে প্রেরণ না করে নিজেদের সঙ্গে রাখে সে বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি ও উদ্বুদ্ধকরণে পদক্ষেপ অব্যাহত থাকা বাঞ্ছনীয়। কেবল অনন্যোপায় হলেই এ পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। বিপদাপন্নের প্রয়োজন বিবেচনায় তাই এটিকে ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম বা নিষিদ্ধ না বলা উত্তম। এটি নিষিদ্ধ হওয়ার মত কোন অপরাধমূলক কর্মকান্ড নয়।

পবিত্র কোরআনে পিতা-মাতার সঙ্গে সদাচরণ করতে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সেটি নিজ ঘরে রেখে করতে হবে এমন শর্ত নেই বা হতে পারে না। বহুদুরে বিদেশে অবস্থান করেও অনেকে পিতা-মাতার সঙ্গে সদাচারণ করে। নিজ ঘরে

রেখেও অসদাচরণ করা সম্ভব। সদাচারণ ও অসদাচরণের সঙ্গে বস্তুত বৃদ্ধাশ্রমের সম্পর্ক নেই। এটি ব্যাক্তিক শিক্ষা, আচরণ ও পারস্পরিক সম্পর্কের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়।

নিরুৎসাহিত করতে হবে পিতা-মাতার প্রতি অবহেলা বা অযত্ন প্রদর্শনকে। বৃদ্ধাশ্রমকে নয়। বিষয়টি যেন মাথা ব্যাথার কারনে মাথা কেটে ফেলার মত না হয়। বিকল্প উপায় থাকতেই হবে।

পিতা-মাতা স্পর্শকাতর বিষয়। প্রতিটি মানুষের আবেগ জড়িত এ শব্দটির সঙ্গে। এ বিষয়টি নিয়ে সহজে মানুষের আবেগকে নাড়া দেয়া সম্ভব। পিতামাতার প্রতি সন্মান, আদর, যত্ন, ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালবাসা ইত্যাদি জাতীয় কথা বলে মানুষের মনকে সহজে জয় করা যায়।

অধিকাংশ মানুষ সত্যকে বুঝতে চেষ্টা করে না। তারা আবেগতাড়িত হয়ে ভূল পথে চলতেও মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকে। আবেগি বক্তব্য দিয়ে সত্যকে চাপা দেয়া সম্ভব। বুদ্ধিমানরা এগুলিকে কাজে লাগায়। সত্যের স্বপক্ষের বক্তব্য শ্রুতিকটূ মনে হলেও এর ফল মিষ্ট। কিছু মানুষের আবেগ তাড়িত প্ররোচনায় চিরকালই সত্য চাপা পরে যায়।

গভীর মনযোগের সঙ্গে কোরআন অধ্যায়ন করলে বোঝা যায় যে ইসলাম আবেগকে অবহেলা করেনি। কিন্তু সত্যকে সবার ওপরে স্থান দিয়েছে। আবেগ তাড়িত ভাষন দিয়ে এ লেখা বা বক্তব্যের বিপক্ষে খুব সহজেই জনমত গড়ে তোলা সম্ভব। তথাপি ভূল বোঝার কিংবা বোঝাবার অবকাশ নেই। একটি সময় পর্যন্ত আবেগও গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু একটি সময় পর সত্যই সমুন্নত হতে বাধ্য।

এ লেখায় পিতা-মাতার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন নয়, বরং অধিক যত্নবান হওয়ার কথা বলা হয়েছে। সকল প্রকার উপায়ের দুয়ারকে খোলা রাখার কথা বলা হয়েছে। নিরুৎসাহিত করা হয়েছে বৃদ্ধাশ্রমে পিতা-মাতাকে রাখার বিষয়টিকে। কিন্তু যদি সেটি সকলের জন্য মঙ্গলকর হয় এবং অবস্থা বিবেচনায় মাতা-পিতাও তাতে সন্তুষ্ট থাকে বা সম্মতি জ্ঞাপন করে, তবেই এ পথ অবলম্বন করা যেতে পারে। কিন্তু তার জন্য তো বৃদ্ধাশ্রম থাকতে হবে। একবারে বিলুপ্ত করে দিলে বিকল্প পথ রূদ্ধ হয়ে যাবে। এ লেখায় বৃদ্ধাশ্রমের সেবা-যত্ন, সুযোগ-সুবিধা আরও বৃদ্ধি করার কথা বলা হয়েছে। একে আকর্ষনীয় করে গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। সু-ব্যবস্থাপনার কথা বলা হয়েছে।

জগতে কোনদিন আল্লাহ এমনও দিন বা বিধান প্রতিষ্ঠা করে দিতে পারেন যে, বৃদ্ধ বয়সে সবাই বৃদ্ধাশ্রমে চলে যাবে। বৃদ্ধাশ্রম হবে স্বপ্নের মত! আমরা জানিনা, আল্লাহ জানেন। আল্লাহর নির্দেশ তো শাশ্বত- চিরন্তন! এভাবে প্রচারণা করা হলে, তখন এ বাণীর মর্যাদার কি হবে? কেবল আবেগ নয়- ভেবে-চিন্তে, সত্য অনুধাবন করে আল্লাহর নির্দেশনাকে বুঝতে হবে।

প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে টিকে থাকা যায় না। বৃদ্ধাশ্রম এখন একটি প্রয়োজনীয়তা। প্রয়োজনীয়তাকে নিজ বিবেচনায় কেউ অস্বীকার করতে পারে। কিন্তু ইসলাম বা আল্লাহর নামে অস্বীকার করা হলে কিছু মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানে। কেননা এর স্বপক্ষেও যথেষ্ট যুক্তি আছে। বিষয়টিকে অনেকে আবার নিজেরাই পছন্দ করে। উপরন্তু এটি ইসলামে নিষেধও নয়। আবার নিষিদ্ধ হওয়ার মত এটি কোন অপরাধমূলক বিষয়ও নয়।

কোন কিছুকেই চিরদিনের জন্য একই নিয়মে বেঁধে দেয়া যায় না। সময় ও পরিবেশ পরিস্থিতি বলে দেবে কখন কি করতে হবে। এটিই ইসলামের শিক্ষা ও দিক নির্দেশনা। আবেগ তাড়িত হয়ে ইসলামের নামে প্রয়োজনীয় কোন বিষয়কে নিষিদ্ধ ঘোষনা করা হলে ইসলামকে ছোট করা হয়। বিতর্কিত করা হয়। বিপদগ্রস্তের কাছে বিরাগের কারনে পরিণত হতে হয়। সুস্পষ্ট মন্দ বা অশ্লীল ও অনৈতিক কাজ ব্যাতিত ইসলামে কোন পথ বা উপায়কে রুদ্ধ করার কথা বলা হয়নি।

পবিত্র কোরানের নির্দেশনা অনুযায়ী পিতা-মাতাকে স্বাচছন্দে রাখার প্রয়োজনে বিকল্প ব্যাবস্থা হিসেবে বৃদ্ধাশ্রম থাকা অতীব জরুরী। বৃদ্ধাশ্রমের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়া প্রয়োজন। সকল বিপদগ্রস্থ পিতা-মাতা ও সন্তানদের বিপদমুক্তির প্রয়োজনে বৃদ্ধাশ্রম একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। এ ধারণাকে সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে। ইসলামে এটি নিষিদ্ধ নয়। বরং এর মর্যাদা হতে হবে অতি উচ্চে। বৃদ্ধাশ্রমকে কি করে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্য আরও আনন্দময়-স্বাচছন্দময় করে গড়ে তোলা যায়, সে বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে।

গতদিন যা সত্য জেনেছি, সেভাবে চলেছি। আজ যা সত্য জানছি, সেভাবে চলতে হচ্ছে। ভবিষ্যতে যেটি সত্যরূপে আবির্ভূত হবে, তার সাথে চলতে হবে। আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে হবে। মন্দ বিষয়গুলিকে পরিহার করতে হবে। এটিই সমর্পন। এটিই কোরআনের শিক্ষা। কোরআনের

শিক্ষায় কোন জটিলতা নেই। জটিলতা যা- তা মানুষের নিজেদের সৃষ্ট ব্যাখ্যা-বিশ্লেষনে। প্রেক্ষিত ভিন্ন হলেও নিচের আয়াত থেকে একটি দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়।

"বল: তোমরা কি বিবেচনা করে দেখেছ যে, যা কিছু আল্লাহ তোমাদের জন্য জীবনোপকরণ হিসেবে দিয়েছেন, তোমরা নিজেরাই সেগুলির কোনটিকে বিধিসম্মত ও কোনটিকে বিধিসম্মত নয় বলে সাব্যস্ত করেছ; বল: আল্লাহ কি তোমাদের এ নির্দেশনা দিয়েছেন, নাকি তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যে আরোপ কর?" (আল কোরআন ১০:৫৯) (লেখা ২০১৭)

রাজনীতি

(Politics)

জীবন ও জগত নিয়ে সমাজে নানান দর্শন বিদ্যমান। পুঁজিবাদ-সমাজতন্ত্র, গনতন্ত্র-একনায়কতন্ত্র, বিশ্বাসীর দর্শন-অবিশ্বাসীর দর্শন, আস্তিক্যবাদ-নাস্তিক্যবাদ এমনি অনেক। একটি দর্শনের বিপরীতে রয়েছে আরও একটি দর্শন। সকলেই সত্য, সঠিক ও ন্যায়ের কথা বলে।



সত্য ও ন্যায়ের বোধটি এক এক জনের কাছে এক এক রকম। তাই সকল দর্শনের ছায়াতলেই কিছু না কিছু মানুষের সমাগম ঘটে। এতে দলগুলি শক্তি সঞ্চয় করে। সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় বিপরীতমুখী শক্তিগুলি মুখোমুখী অবতীর্ণ হয়।

সত্য ও ন্যায়ের স্বপক্ষে এত শক্তি বর্তমান থাকা সত্বেও সমাজে কি অন্যায় ও সত্যচ্যূত কর্মকান্ড ঘটছে না? কিভাবে সম্ভব হয়ে ওঠে অন্যায় ও সত্য বিচ্যূত কর্মকান্ড?

অন্যায় বা সত্য বিচ্যূতিকে সম্ভব করে তোলে মূলত 'জ্ঞান'! সূক্ষ জ্ঞানের মারপ্যাঁচ ব্যাতিত অন্যায় কর্ম সাধন কঠিন। জ্ঞান হচ্ছে পানির মত। পানি যেমন সব পাত্রের রং ধারণ করে। জ্ঞানও তেমন। সে সকল পক্ষের রং ধারণ করে। সে সকলের পক্ষে কথা বলে। আবার সকলের বিপক্ষেও কথা বলে। জ্ঞান ন্যায়ের কথা বলে। আবার সূক্ষ জ্ঞান ন্যায় বিচ্যূতিকে সম্ভব করে তোলে।

জ্ঞান কম্পিউটার প্রোগ্রাম তৈরীকে সম্ভব করে তোলে। সূক্ষ জ্ঞানই আবার ভাইরাস উৎপন্ন করে। হ্যাকিংকে সম্ভব করে তোলে!

জ্ঞানের কারনে বিচারক বাদি-বিবাদী উভয় পক্ষে রায় প্রদানের কঠিন যুক্তি তুলে ধরতে সক্ষম। ভূক্তভোগীর অন্তরের আকুতি তাই পরম সত্যের সন্ধানে বিধাতা পর্যন্ত ফিরে যেতে বাধ্য।

"... বস্তুত সব কার্যকলাপই আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে মীমাংসার জন্য।" (আল-কোরআন ২:২১০)

জ্ঞানের কারনে মানুষ বিশ্বাসী। আবার এ জ্ঞানের কারনে মানুষ অবিশ্বাসী। জ্ঞান মানুষের চালক। জ্ঞান যেভাবে বোঝায় মানুষ সেভাবে বোঝে। জ্ঞান খুবই গুরুত্বপূর্ণ সব সময়ের জন্য। বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকলেই জ্ঞানকে ব্যবহার করে।

মূলত মানুষ একটি ফাঁকা বাক্সের মত। এর ভেতরে জ্ঞান নামে যা কিছু প্রবেশ করিয়ে দেয়া যায়, সে তাই হজম করে ফেলে। অতপর সে শক্তিতে বলীয়ান হয়ে চলতে শুরু করে। সে অর্থে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী, আস্তিক-নাস্তিক, সত্য-অসত্যের পক্ষ শক্তি কেউই কোন দোষে দোষী নয়। ফাঁকা বাক্সের ভেতরে কি প্রকারের জ্ঞান প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়েছে বা হচ্ছে দোষের মূল কারন সেখানে।

জ্ঞান প্রবেশ করাবার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হচ্ছে 'শিক্ষা'। তাই জ্ঞানের চালক হচ্ছে শিক্ষা। হোক সেটি প্রাতিষ্ঠানিক কিংবা অপ্রাতিষ্ঠানিক। যার শিক্ষাটি যেমন, তার জ্ঞান তাকে সেভাবে চলতে উদ্বুদ্ধ করে। তাই একই দর্শনে বিশ্বাসী হয়েও দর্শন প্রতিষ্ঠায় কেউ জীবন রক্ষা করে। কেউ জীবন নাশ করে।

জ্ঞান সব দিকে যুক্তি খুঁজে পায়। ভাল-মন্দ সিদ্ধান্ত গ্রহণের গুরুভার তাই জ্ঞানের ধারকের। অর্থাৎ জ্ঞানীর। অন্যভাবে বলা যায় বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসীর। কিংবা আস্তিক বা নাস্তিকের নিজের। জ্ঞান সব পথ বাৎলে দেয়। পথ অবলম্বনের দায়িত্ব জ্ঞানীর। প্রাপ্তব্য ফলাফলও তাই জ্ঞানীর নিজের।

"... প্রত্যেক মানুষের কর্মফলকে আমি তার নিজ কাঁধে স্থাপন করেছি ...।" (আল-কোরআন ১৭:১৩)

ন্যায়কারী-অন্যায়কারী, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী, আস্তিক-নাস্তিক সকলকে জ্ঞানে জ্ঞানান্বিত করে গড়ে তোলে শিক্ষা। জ্ঞানীর ভাল মন্দের ফলাফলের দায়ভার তাই শিক্ষার। বলা যায় শিক্ষা ব্যবস্থা সৃষ্টিকারীদের।

জ্ঞানীকে গড়ে তোলে শিক্ষা। যে শিক্ষা জ্ঞানীকে শিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলে, সে শিক্ষাই আবার জ্ঞানীর হাতে পরে দুমড়ে-মুচড়ে যায়। পদদলিত হয়।

শিক্ষা যার দ্বারা পদদলিত হয় তিনি হলেন- 'স্বার্থ'। জ্ঞানী যখন স্বার্থের পেছনে ছুটে শিক্ষা তখন পদদলিত হয়।

কখনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কখনও দর্শন, কখনও প্রভাবক, কখনও জ্ঞান মানবের চালিকা শক্তি হয়ে কাজ করে। বস্তুত এগুলি আদর্শিক, দার্শনিক, তাত্ত্বিক কিংবা ভাবের কথা। বাস্তবে মানুষের চালক হল 'স্বার্থ'।

- স্বার্থ উদ্ধারে সে-ই সফল হবে যার হাতে আছে ‘অর্থ’।
- অর্থ তার হাতে যাবে যার হাতে আছে ‘ক্ষমতা’।
- ক্ষমতা কার হাতে যাবে সেটি নির্ধারণ করে ‘রাজনীতি’।
- রাজনীতি তার কাছে পরাস্ত যার আছে ‘শক্তি’।

মূল কথাটি হচ্ছে- ‘জোর যার মুল্লুক তার।’ টিকে থাকতে হলে বৃহৎ শক্তির কাছে নত হতেই হবে। সেটি সইতে না পারলে নিজেকে বৃহৎ শক্তি হয়ে আবির্ভূত হতে হবে। পরাস্ত হলে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার মানসিক প্রস্তুতিও থাকতে হবে।

যখন একক বৃহৎশক্তি আবির্ভূত হয়, সমপরিমান বিরোধী শক্তি থাকে না তখন সমাজে ভারসাম্য নষ্ট হয়। স্বার্থের কারনে শক্তিমান অন্যায় বা সত্যচ্যুত কর্মকান্ড অনায়াসে সংঘটন করতে পারে। শক্তিমান অন্যায় বা সত্য বিচ্যুতিকে ন্যায় ও সত্যরূপে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পায়।

বাস্তবতা হচ্ছে, স্বার্থের কারনে জগতে অন্যায় ও অসত্য প্রবেশ করে। একক বৃহৎশক্তি আবির্ভূত হলে অসত্যের প্রবেশ সহজ ও সম্ভব হয়ে ওঠে। পরিণাম সত্য বিচ্যুতি। সত্য ও অসত্য এ অবস্থায় মুখোমুখী অবস্থান নেয়। বস্তুত অবস্থান নিতে বাধ্য। কেননা একদল নিস্পেষিত হয়। তারা নতুন যৌক্তিকতা ও নতুন তত্ত্ব কিংবা নতুন দর্শন নিয়ে আবির্ভূত হয় এবং শক্তি সঞ্চয় করার চেষ্টায় লিপ্ত হয়। তাতে অন্যায়ের কি? বেঁচে থাকার প্রচেষ্টায় নিপীড়িতকে তো শক্তি সঞ্চয় করতেই হবে! অন্যথায় এ সমস্যার ন্যায় সম্মত ও দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের পথ খুঁজে বেড় করতে হবে মানুষকেই।

সত্যের ধারকরূপে কোন দর্শন বা কোন তত্ত্বই কোন কালে প্রতিষ্ঠা পাবে না, যদি না মানুষ তা বাস্তবায়নে এগিয়ে আসে। কিন্তু যখনই একদল মানুষ কোন কিছু প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসে, তখনই আপনা থেকে একটি বিরোধী পক্ষ দাড়িয়ে যায়।

বিরোধী পক্ষ ভিন্ন মত ও পথ প্রতিষ্ঠায় লিপ্ত হয়। সব ঘটে স্বার্থের কারনে। ফলে সত্য ও অসত্য বা দুটি সত্য বা যার যার দর্শন প্রতিষ্ঠায় দু-পক্ষের মধ্যে রাজনীতির খেলা শুরু হয়ে যায়। প্রথমে দর্শন দিয়ে শুরু হয়. অতপর সেটি নানান স্বার্থে গিয়ে গড়ায়। কিংবা স্বার্থ দিয়ে শুরু হয়, নানাবিধ দর্শনের কাঁধে ভর করে।

রাজনীতির কাছে এসে সত্য, তত্ত্ব, দর্শন সব কিছু নত হয়ে যায়। যদি কোন কিছু রাজনীতির খেলায় পড়ে যায় তো তার প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ন তার হাতে। আর

এ জায়গাটি হচ্ছে চরম বাস্তবতার স্থান। এটিই একমাত্র বাস্তব সত্যরূপে প্রতিভাত হয়। কেননা যত তত্ত্ব নিয়েই আলোচনা করা হোক না কেন, নিঃসন্দেহে সেটি মানুষের জন্য। আর রাজনৈতিক খেলার সর্বশেষ পর্যায়ে পৌঁছেই মানুষ তার সর্বশক্তি নিয়োগ করে, কোন কিছুকে প্রতিষ্ঠা কিংবা উৎপাটন করতে।

ধারণাগতভাবে রাজনীতি কোন পেশা নয়। সৃষ্টি পরিচালনার এক অবশ্যম্ভাবী ও অনস্বীকার্য শর্ত হচ্ছে রাজনীতি। একটি কর্ম সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে যা আপনা থেকে দাড়িয়ে যায়। এটিকে এড়ানো সম্ভব নয়। সচেতন যে কোন মানুষ, যে কোন ক্ষেত্রে এতে জড়িয়ে পড়তে পারে। তার জন্য রাজনীতিবিদ হওয়ার প্রয়োজন নেই। সৃষ্টির কর্মকান্ড পরিচালনার শর্তেই মানুষকে এ পথে টেনে আনে। সেটি ক্ষুদ্র পরিসরে পরিবারেই হোক কিংবা বৃহৎ পরিসরেই হোক।

কেবল তত্ত্ব কিংবা কল্পনায় নয়, বাস্তবেও কোন কিছুর বাস্তবায়নে রাজনীতি হচ্ছে শক্তির মূল উৎস বা চালক। যে প্রক্রিয়ার সর্বশেষ অনিবার্য পরিনতি হচ্ছে- 'সংঘর্ষ'। আলোচনাও হতে পারে। তবে তার জন্য মানুষের বোধ আরও উন্নততর পর্যায়ে উন্নীত হতে হবে।

রাজনীতিতে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষ হয় নতুনকে প্রতিষ্ঠা ও পুরোনোকে উৎপাটনে। সংঘর্ষ শক্তি উৎপাদন করে। সে শক্তি সত্যকে প্রতিষ্ঠা করে। সত্য সবকিছুকে চালনা করে। ঠিক যেমন ইঞ্জিনে উৎপাদিত সাংঘর্ষিক শক্তি পিষ্টনকে চালনা করে। অতপর পিষ্টনের সাথে সংযুক্ত সব কিছু নির্ধারিতভাবে চালিত হয়, বিষয়টি তেমন।

রাজনীতির মূল কাজ সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা ও সমুন্নত রাখা। এটি কোন আদর্শিক বক্তব্য নয়। সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত প্রক্রিয়াটি এমন যে, রাজনীতির খেলায় সত্যকে আপনা থেকে বেড় হয়ে আসতেই হবে। যতক্ষন সেটি হবে না, ততক্ষন খেলা চলতেই থাকবে।

রাজনীতিতে মানুষ দারুনভাবে সক্রিয় থাকে। বিতর্কিত বিষয়ের চুলচেরা বিশ্লেষন চলতে থাকে। যেটিকে দু'পক্ষের বিষোদগার ভাবা হয়, সেটি প্রকৃত অর্থে বিষোদগার নয়। সভ্যতার ঘাটতির কারনে বিষয়টি বিষোদগারের মত মনে হয়। কেবল কিছু শব্দ ও মুখচ্ছবির বিকৃত রূপ পরিহার করা সম্ভব হলে- একই বক্তব্য সভ্য হয়ে যাবে।

রাজনীতিতে বিতর্ক বা পারস্পরিক বিষোদগারের ছলে মূলত সত্যকে টেনে বেড় করে আনা হয়। মানুষের সামনে গোপন বিষয়গুলিকে প্রকাশ করে দেয়া হয়। এ খেলার উপস্থিতি ব্যাতিত সাধারণ মানুষ উপর মহলের অন্দরের অনেক সত্য জানতে সক্ষম হত না। সে কারনে এটি দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ। কেননা রাজনীতি সত্যকে উদঘাটন করে। খুঁজে পাওয়া সত্যই মানুষকে সঠিক পথ বাৎলে দেয়।

".. যারা সত্য নিয়ে আগমন করে এবং সত্যকে সত্য বলে জানে/বিশ্বাস করে তারাই দায়িত্বশীল।" (আল-কোরআন ৩৯:৩৩)

সত্য ও ন্যায়ের প্রতি মানবের কেন্দ্রীয় টান আছে। সে কারনে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায় প্রতিষ্ঠায় মানুষ এখানে দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে প্রচন্ড সক্রিয় থাকে। যতক্ষন সত্য স্পষ্টরূপে ধরা দেবে না, রাজনীতির খেলা ততক্ষন চলতেই থাকবে। সত্য স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হলেই কেবল এক পক্ষ অপর পক্ষকে বিতারণে প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগে উদ্যেগী হয়। এ সময়টিতে উদ্যোগী হয় কেননা এ সময়ে অন্যায়ের বিপক্ষে সত্য ও ন্যায় প্রচন্ড শক্তি অর্জন করে। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের সমর্থন পায়। প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ-

একদল ছলে-বলে-কৌশলে গোপনে কোন একটি স্বার্থ বা সুবিধা লুটে নিতে চায়। কিন্তু বঞ্চিত দল গোপন সত্যটি প্রকাশ করে দেয়। মূলত বঞ্চিত পক্ষ সে সুবিধাটি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এবং তারাও সে সুবিধাটির গোপন দাবীদার। কিন্তু বঞ্চিত হলে বা হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে গোপন সত্যটি প্রকাশ করে দেয়। সত্য প্রকাশের স্বার্থে সব সময় সত্য প্রকাশ করে না। প্রক্রিয়ার প্যাঁচে পরে হলেও সত্য প্রকাশ করে দিতে হয়। আর এটিই স্রষ্টা বলি কিংবা প্রকৃতি বলি তার কারুকাজ। এ প্রক্রিয়ার মধ্যে মানুষকে তিনি ফেলে দিয়েছেন। মানুষ নিজে প্রক্রিয়ার মধ্যে পরতে না চাইলেও সমাজের একটি সচেতন অংশ হিসেবে পরে যেতে হয়। তবে বাস্তবতা হচ্ছে, ন্যায়ের আড়ালে প্রত্যেকে আবার অতি সন্তর্পন ও সযতনে নিজ নিজ স্বার্থকে লালন-পালন করে। স্বার্থ উদ্ধারে সূক্ষ সূক্ষ জ্ঞানকে কাজে লাগায়। এতে রাজনীতিতে নোংরামির প্রবেশ ঘটে। তবে এটিও ঠিক যে, এই সূক্ষ জ্ঞানকে মানুষ কাজে লাগায় বিধায় রাজনৈতিক পরিবেশ আপাত শান্ত থাকে। এটিই এ্যাডজাষ্টমেন্ট। নয়ত প্রতিনিয়ত রাজনীতি হত সত্য ও ন্যায়ের পথে কিংবা স্বার্থের কারনে অনড় ও নিয়ত সাংঘর্ষিক। সেক্ষেত্রে ঘুরে ফিরে চলে আসতো সেই

একই তত্ত্ব- 'জোর যার মুল্লুক তার।' সভ্যতা ও শান্তি বলে জগতে কিছু থাকতো না।

সভ্যতা ও শান্তি টিকে আছে দুটি কারনে। শক্তির কাছে মস্তক পরিপূর্ণভাবে অবনতকরণের কারনে। নয়ত কমপক্ষে রাজনীতির এই এ্যাডজাষ্টমেন্টকে এক পক্ষ মেনে নেয়ার কারনে। প্রকৃতপক্ষে মেনে নেয়া নয়, মেনে নিতে বাধ্য হওয়ার কারনে। মূলত 'জোর যার মুল্লুক তার' এ তত্ত্বটিই সত্য।

সত্যিকারের নির্মম খেলায় পরাজিত পক্ষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ারই কথা। কিন্তু রাজনীতি তাদের কিছুটা সন্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার সুযোগ করে দেয়। খেলায় জড়িতদের মধ্যে পরাজিত পক্ষ হার স্বীকার করে নেয়। নিতে বাধ্য হয়। ফলে আপাত শান্তি বিরাজ করে। সাধারণ মানুষের বৃহৎ অংশ কথিত মুক্ত আলোচনার নামে যে স্বাধীনতার সুফল ভোগ করে, কিংবা স্বাধীনচেতা মনোভাব প্রদর্শন করে, তা তাদের পক্ষ হয়ে রাজনীতির কোন এক পক্ষ পরাজয় স্বীকার করে নেয় বিধায় সে সুবিধা ভোগ করতে পারে। নয়ত প্রত্যেককে প্রতিনিয়ত শক্তির মোকাবিলা করে টিকে থাকতে হত। জয়ী পক্ষ কখনই তার সরাসরি বিরোধীতাকারীকে সহ্য করে নিতে প্রস্তুত নয়। কেননা শক্তি ও ক্ষমতা তার হাতের মুঠোয়। সকলের বেঁচে থাকা কেবলি তার মহানুভবতা! শক্তিমান সে মহানুভবতা কখনও প্রদর্শন না করলেই হয়ে যাবে রক্তের খেলা।

রাজনীতি মানুষের সম্মিলিত শক্তি ধারণ করে এবং প্রয়োজনে ব্যবহার করে। ন্যায় প্রতিষ্ঠায় যত কৌশল অবলম্বন প্রয়োজন তার সবই তার ব্যবহার করার স্বাধীনতা থাকে। যা আসে মানুষের সম্মিলিত সম্মতি থেকে। কেবল জনগন নয়, প্রকৃতি বা অন্য অর্থে বিধাতা বা সৃষ্টিকর্তা তাকে সে সর্বময় ক্ষমতা প্রদান করেন। কিছু সময়ের জন্য। এটিও একটি পরীক্ষা।

প্রকৃতি বা সৃষ্টিকর্তাকে এখানে টানা হল কেন? প্রকৃতি বা সৃষ্টিকর্তাকে টানা হল এ কারনে যে, রাজনীতিতে কে নেতৃত্ব দেবে সেটি নির্ধারিত হয় পক্ষসমুহের পারস্পরিক চাপ দ্বারা। যা কারও একক নিয়ন্ত্রনে নয়। বিষয়টি সম্মিলিত মানুষের ইচ্ছের বহিঃপ্রকাশের ফল। সম্মিলিত মানুষের ইচ্ছের ওপর জীবন, জগত, সমাজ, পরিবেশ, প্রকৃতি, দর্শন, তাৎক্ষণিক পরিস্থিতি, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের মানসিক ও শারিরীক স্বাস্থ্য নানান কিছু প্রভাব ফেলে। যার হিসেব মিলানো কঠিন। যার সন্ধান কষতে গেলে কোন অদৃশ্য শক্তি বা অন্য কথায় বিষয়টি স্রষ্টা পর্যন্ত গড়ায়।

রাজনীতি যখন তার মূল কাজ থেকে সরে আসে অর্থাৎ কলুষিত হয়ে যায় বা সত্য বিচ্যূত হয়ে সংকীর্ণ স্বার্থের পেছনে ধাবিত হয়, প্রকৃতি আপনা থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। অলৌকিকভাবে নয়। মানুষকে কাজে লাগিয়েই প্রকৃতি সব ঠিক করে নেয়। পৃথিবী, প্রকৃতি, মানুষ, জগত সে নিয়মের মধ্যে সৃষ্ট। অন্যায় আঁচ করার সাথে সাথে মানুষের মধ্যে পরিবর্তন সূচিত হতে থাকে। মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে একটি শক্তিশালী প্রতিপক্ষ দাড়িয়ে যায়। প্রতিষ্ঠিত রাজা বা দর্শনের পতন ঘটে। তেমন স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সকল প্রোগ্রাম, সূত্র, কমান্ড বিধাতা কর্তৃক রচিত। সূত্রই সত্য। এগুলি সম্মিলিতভাবে প্রকৃতি ও মানুষের মাঝে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে।

"বিশ্ব জগতসমুহ ও পৃথিবী এবং এর অন্তর্বর্তী যাবতীয় সকল কিছু সত্য ভিন্ন সৃষ্টি করা হয়নি।" (আল-কোরআন ৪৬:৩)

এ জগত সত্য দিয়ে সৃষ্টি। সত্যের বাইরে যাবার তার কোন উপায় নেই। সত্যের পানে সে ছুটে যাবেই। ঠিক যেমন ক্ষুদ্র একটি পানির ফোটা, বৃহৎ কোন পানির ফোটার দিকে মিলিত হতে তীব্র গতিতে ধাবিত হয়, তেমন। ব্যাত্যয় ঘটলেও সত্য প্রতিষ্ঠা পাবেই। আবার ব্যাত্যয়ও ঘটে কোন এক সত্য বা সূত্রের কারনে। তবে সবাই সব সূত্র পর্যালোচনা করে না। যিনি সেটি বুঝতে সক্ষম হন তিনি কোন লোভের কারনেই সত্য বিচ্যূত হতে চান না। তিনি ভবিষ্যৎ দেখতে পান। পরিণাম সম্পর্কে পরিপূর্ণ ওয়াকিবহাল। তথাপি সত্যের পথে নিজেকে ধরে রাখা কঠিন।

রাজনীতিতে আবির্ভূত দর্শনের অনুসারিগন প্রত্যেকেই নিজেদেরকে সত্য, সঠিক ও ন্যায়ের পক্ষ শক্তি মনে করে। কেউ কারও কাছে নত হতে চায় না বা হতে পারে না। এমতাস্থায় কে প্রকৃত অর্থেই সত্য পথে পরিচালিত সে বিষয়টি অনিশ্চিত হয়ে দেখা দেয়। পক্ষগুলি মুখোমুখী অবতীর্ণ হয় এবং সেটি হওয়াই বাঞ্ছনীয়। নইলে সত্যের নাগাল পাওয়া হবে সুদুর পরাহত। পৃথিবী অন্যায়ে ছেঁয়ে যাবে। এমনই আল্লাহর পরিচালন প্রক্রিয়া।

"... যদি আল্লাহ মানবজাতির একদলকে দিয়ে অপর দলকে প্রতিহত না করতেন, তবে এ পৃথিবী অন্যায়ে ছেঁয়ে যেত। ...।" (আল-কোরআন ২:২৫১)

রাজনীতির মুখোমুখী পরিস্থিতি তখনই সম্ভব হয় যখন দু'পক্ষ রাজনীতিতে সম-পর্যায়ের চাপ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। ফলে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সত্য ও অসত্যকে দুটি সত্য বলা যেতে পারে। কেননা কে সত্য পথে অবস্থান করছে সে

বিষয়টি অনিশ্চিত। দুটি পক্ষরই সত্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এক পক্ষ অপর পক্ষের কাছে অসত্য প্রতীয়মান হলেও প্রত্যেকেই নিজেকে সঠিক, ন্যায় বা সত্যের পক্ষ শক্তি মনে করে। প্রকৃতপক্ষে ন্যায়ের বোধটি সকলের মাঝে কাজ করে। উপরন্তু নিজের স্বার্থের পক্ষে সকলেরই আছে কঠিন যুক্তি। ফলে চরম সত্য থেকে যায় অধরা। আমরা যে সত্য প্রত্যক্ষ করি তা 'আপেক্ষিক সত্য'।

বাস্তবে সত্য-অসত্য নির্ধারণ হয় মুখোমুখী পক্ষ সমুহের জয়-পরাজয় দ্বারা। সকলেই ন্যায় ও সত্য পথের দাবীদার। কে সত্য কেউ নিশ্চিত নয়। অ-উন্নত সমাজে সাংঘর্ষিক রাজনীতির জয়-পরাজয় কিংবা উন্নত সমাজে সংখ্যাধিক্যের মতামত অর্থাৎ গনতান্ত্রিক পদ্ধতি আপাত সত্য-অসত্য নির্ধারণ করে। অর্থাৎ বিজয়ী পক্ষ সত্যরূপে আবির্ভূত হয়। বিজয়ী পক্ষ সত্যরূপে আবির্ভূত হয় সময়ের প্রেক্ষিতে। সময়ের প্রেক্ষিতে বলা হচ্ছে কেননা প্রকৃত সত্য অনুধাবন ও নির্ণয় করা কঠিন। শক্তির খেলায় পরাজিত পক্ষও নিজেদেরকে ন্যায়ের পক্ষ মনে করে যেতে পারে। তাই পরম সত্য নয়, আপাত সত্য বর্তমান পরিবেশের ওপরই অনেকটা নির্ভর করে। যে কোন প্রকারেই হোক, মূলত সমসাময়িক সময়ে সংখ্যা ও শক্তির আধিক্যের দিকে সত্য আপাত ঝুঁকে থাকে। সময়ের প্রেক্ষিতে অবস্থার পরিবর্তনে বিপরীত শক্তিও কখনও সত্যরূপে আবির্ভূত হতে পারে।

যেহেতু কোন পক্ষ জয়ী হবে সে বিষয়টি অনিশ্চিত, ফলে সত্যের পক্ষ শক্তিকে পূর্ব থেকে স্বীকৃতি দেয়ার বিষয়টিও থেকে যায় অনিশ্চিত। বিভক্ত সমাজে এক একটি পক্ষ ভিন্ন ভিন্ন মেরুতে অবস্থান নেয়। চুম্বকের মত। সব দিকেই জ্ঞান ও বোধ সম্পন্ন মানুষের উপস্থিতি থাকে।

মুখোমুখী অবতীর্ণ সত্য ও অসত্য একে অন্যকে উৎপাটন করতে চায়। বাস্তবে যা কোনদিন সম্ভব নয়। কোন পক্ষ উৎপাটিত হলে নতুনরূপে নতুন নামে আরেকটি বিরোধী পক্ষ দাড়িয়ে যাবে। নিশ্চিহ্ন হবে না। রূপ পরিবর্তন করে টিকে থাকবে। যথাসময়ের অপেক্ষা করবে। আপাত প্রতীয়মান সত্য ভূল করলে পতন ঘটবে। এগুলি সৃষ্টির শর্ত। স্বয়ং বিধাতাপ্রসূত। এভাবেই তিনি সত্য ও ন্যায়কে সকলের হাত দিয়েই প্রতিষ্ঠিত রাখেন। তিনি চাইলে এমনটি নাও করতে পারতেন। বিধাতা নিজেই সেটি করেননি।

রাজনীতি

"... যদি আল্লাহ চাইতেন তবে তিনি মানুষকে একই জাতিসত্ত্বায় পরিণত করতেন, কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছে তাকে তাঁর মার্জনার অন্তর্ভূক্ত করেন। ...।" (আল-কোরআন ৪২:৮)

তিনি একেকে অপরের জন্য করেছেন পরীক্ষাস্বরূপ। এ পরীক্ষা একটি প্রক্রিয়া। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তিনি সত্যকে সমুন্নত রাখেন। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যারা রাজনীতি করেন, তাদের মধ্যে যারা প্রকৃতই জগৎ পরিচালনার সঙ্গে সম্পৃক্ত বা ভেতরের বিষয়গুলি জানেন বা বোঝেন, কেবল তারাই বিষয়টির গুরুত্ব হৃদয় দিয়ে অনুভব বা অনুধাবন করতে সক্ষম।

"সত্য প্রত্যাখ্যানে সব মানুষের এক মতাবলম্বী হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকলে, যারা দয়াময়কে অস্বীকার করে আমি তাদেরকেও দিতাম তাদের গৃহের জন্য রৌপ্য নির্মিত ছাদ ও সিড়ি ... এবং স্বর্ণ নির্মিত অলংকার। যদিও এ সবই কেবল পার্থিব জীবনের ভোগ-সম্ভার মাত্র। পরকালে তোমার পালনকর্তার কাছে আছে জীবিকার নানান উপকরণ, তাদের জন্য যারা (মন্দ কর্ম/পথ থেকে) নিজেদের রক্ষা করে চলে।" (আল-কোরআন ৪৩:৩৩-৩৫)

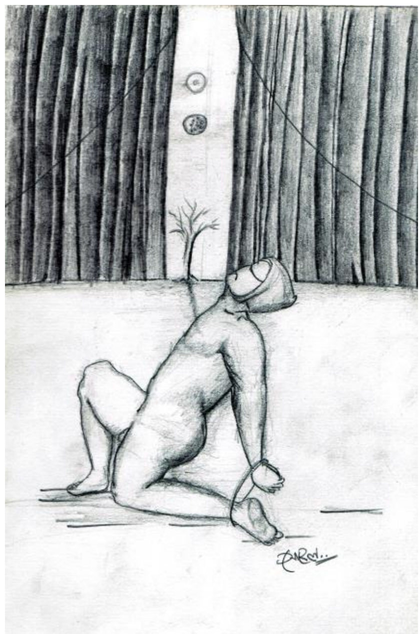
সত্যকে সমুন্নত রাখাই রাজনীতি তথা মানব জীবনের মূল কাজ। অপরাপর সকল কাজ এর সহযোগী।

যদি কোনদিন এক পক্ষ দ্বারা অপর পক্ষকে পরিপূর্ণরূপে উৎপাটন করা সম্ভব হয়, বিধাতা বা প্রকৃতির অনুমোদন ব্যাতিত যা আদৌ সম্ভব কিনা জানা নেই, তবে জগৎ সেদিন নিশ্চল-নিশ্চুপ হয়ে যাবে। অনু, পরমানু- ইলেক্ট্রন, প্রোটন, নিউট্রন বা শক্তির যে কোন এককগুলির চরিত্র সেদিন নতুনভাবে লিখিত হতে হবে। (লেখা ২০১৭)

মুক্ত চিন্তা

(Free Thinking and Free Expression)

স্বাধীনভাবে নিজের চিন্তা প্রকাশ করতে চাই। প্রকাশ করে যেতে চাই। এটিই সমাজের স্বাভাবিক নিয়ম হওয়া চাই। নিয়ত স্রষ্টার সৃষ্টির আগমন ঘটবে, সে তার পর্যবেক্ষন ব্যাখ্যা করবে। চলে যাবে। আবার আসবে, আবার চলে যাবে। যেমন রক্তের কনিকারা আসে আবার যায়। একটি প্রক্রিয়া।



জগতে এসে বিবিধ বিষয় পর্যবেক্ষন করে তার ব্যাখ্যা বা মতামত প্রকাশ করে যাওয়াটি একটি দায়িত্বশীলতা। বলা যেতে পারে অনেকগুলি মূল কাজের একটি। অনেকটা মনে করা যেতে পারে রিপোর্টিং এর মত। একটি ভাল রিপোর্ট সামাজিক বা সার্বিক অবস্থার একটি ভাল ডায়াগনোসিসও বটে। ডায়াগনোসিস কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করে। যতবেশী মতামত প্রকাশিত হবে, ততবেশী বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে একটি বিষয়ের ভাল ও মন্দ দিক বেড়িয়ে আসবে। ভালর পথে এগিয়ে যেতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সঠিক ও সহজ হবে। এর ব্যাত্যয় ঘটলে প্রক্রিয়া প্রলম্বিত হবে। সমাজে মুক্ত চিন্তা ও স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের নিয়মটি তাই অবারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এটি খুবই কষ্টের বিষয় যে, মানুষ পৃথিবীতে এসে তার ভেতর থেকে উৎসারিত চিন্তা মুক্তভাবে প্রকাশ করতে সবসময় পেরে ওঠে না। পরিবার ও সমাজ অনেক ক্ষেত্রেই বাঁধা হয়ে দাড়ায়। এগুলি নতুন ভাবনাকে নিরুৎসাহিত করে। যেভাবে আছে সেভাবেই আরও কত উন্নততর কলা ও সুখ স্বাচছন্দে চলা যায় সে ভাবনাটিই পছন্দ করে।

রেষ্টুরেন্টে খাবারের মেনু যেমন প্রকাশিত, যার যেটি পছন্দ সে সেটি গ্রহণ করে। তেমনি সকল চিন্তা প্রকাশিত হওয়ার সুযোগটি হতে হবে অবারিত। যার যেটি পছন্দ সে সেটি গ্রহণ অথবা পরিত্যাগ করবে। বেশীরভাগের গ্রহণকৃত চিন্তাটিই লিড দিবে। সেটিই কল্যাণকর।

যারা মুক্তভাবে নতুন চিন্তা প্রকাশে বাঁধা দেয়, একই সাথে তারা জবরদস্তি অন্যের ওপর নিজের মতাদর্শ চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করে। এরা প্রকৃত শিক্ষায় এবং মানসিকভাবে পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠি, নয়ত স্বার্থান্বেষী। তারা তাদের প্রতিষ্ঠিত স্বার্থের ক্ষতির আশংকা করে। হে আল্লাহ, সকলকে মুক্তভাবে তার মনের কথাটি প্রকাশ করার পরিবেশ দাও। আমীন।

একটি মন্দ ভাবনারও মুক্তভাবে প্রকাশ হওয়া প্রয়োজন। অন্যথায় এ ভাবনা অপ্রকাশিত থেকে জনম জনম ঘুরতে থাকবে। ঘুরে ঘুরে এ চিন্তার আগমন ঘটবে। আরও বড়, প্রকট ও জটিল আকার ধারণ করবে। মন্দকে বুঝতে ও তাকে নির্মূল করতে হলেও সেটিকে প্রকাশিত হতে দিতে হবে।

ভাল-মন্দ নির্বিশেষে সমাজে মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকতে হবে। দীর্ঘমেয়াদে এর সুফল আছে। সাময়িকভাবে যে মন্দ, সে মন্দ চিন্তায় গা ভাসাতে চাইবে। তাকে চিহ্নিতকরণটিও বিশেষ প্রয়োজন। এই চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া সহজ হলে পরবর্তী সংশোধনমূলক কাজ সহজ হয়ে যায়। তাই মত প্রকাশ করতে দিতে হবে ভাল-মন্দ নির্বিশেষে। কিন্তু যে উত্তম তাকে টলানো সম্ভব নয়।

"উত্তম অধমের সাথে চলে নিশ্চিতে
তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে।"

সত্য হচ্ছে- না জেনে-বুঝে, সত্যকে অন্তরে ধারণ না করে কখনও কোনদিন উত্তম হওয়া যায় না।

মানুষে মানুষে দৃষ্টিভঙ্গীর মিল আছে, আবার পার্থক্যও আছে। লিখন এবং কোন এক কলিমুল্লাহর মিলটি হচ্ছে- তারা দু'জনেই নবীকে ভালবাসে। পার্থক্য হচ্ছে- নবীর প্রতি কটূক্তি শুনে ভালবাসায় অন্ধ কলিমুল্লাহ রাজপথে জান-মালের ক্ষতি সাধন করেছে। ভালবাসা থেকে উৎসারিত এ আচরণ স্বয়ং আল্লাহর কাছেও গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এটি আল্লাহ, নবী এবং ধর্মকে ছোট করে। ধর্মপ্রাণ মানুষের আচরণ সম্পর্কে ভূল বার্তা দেয়। মনে হয় যেন জবরদস্তি মানুষকে ধর্মের

পথে নিয়ে আসতে চায়। ধর্মের পথে মানুষ তো আসবে জেনে-বুঝে অন্তরের আকর্ষনে, অভিভূত হয়ে!

যারা কটূক্তি করছে তারা কোথায় কোথায় ত্রুটি খুঁজে পেল? কেন তারা এমন আচরণ করছে? তার সন্ধান করা এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া সঠিক আচরণ। কটুক্তিগুলিকে বন্ধ না করে আরও বেশী করে তুলে আনা প্রয়োজন। সমাজে কোথায় কোথায় আক্ষেপ আছে, তা জানা ও বোঝা প্রয়োজন। এটিই ডায়াগনোসিস। আর এ কারনেই মুক্ত চিন্তা ও স্বাধীন মত প্রকাশ গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক চিকিৎসার জন্য রোগের সঠিক নির্ণয় জরুরী।

যার হিম্মত ও জ্ঞান আছে, সত্যকে যে সঠিকভাবেই জানে ও বোঝে, সে তো অবুঝ মানুষদের এমন আচরণে বিচলিত হবে না। সে যথাযথ জ্ঞানে সত্যকে প্রকাশ করবে, মানুষের ভূল ধারণাকে দূরীভূত করার প্রয়াস চালাবে। কিন্তু যার উত্তর জানা নেই, সত্যকে যে সঠিকভাবে জানে না বা বোঝে না, সে পথ খুঁজে পায় না। তাই সে বিরোধীকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে চায়। এভাবে কি সমস্যার সমাধান সম্ভব? কতজন বিরোধীকে পৃথিবী থেকে সরাবে? অগনিত বিরোধীর সৃষ্টি হবে! এগুলিও আল্লাহর খেলা। তিনি মানুষকে পরীক্ষা করেন।

"... তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান যে, তোমাদের মধ্যে কর্ম/আচরণে কে শ্রেষ্ঠ!" (আল-কোরআন ১১:৭)

মানুষে মানুষে দৃষ্টিভঙ্গীর মিল আছে, আবার পার্থক্যও আছে। লিখন ও কলিমুল্লাহর চিন্তার পার্থক্য এখানে। মুক্ত চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা ভিন্ন বিভিন্নজনের বিভিন্ন উপলব্ধিবোধ তুলে আনা সম্ভব নয়।

একটি উপলব্ধি হল- কিছু মানুষ কেবল নিজেদেরকে ধার্মিক মনে করছে। তার মত না হলে অন্যদেরকে অধার্মিক ভাবছে। আবার কিছু মানুষ সত্য ও ন্যায়ের পথে থেকেও যেটি ধর্মের মর্মবাণী, ধার্মিক হিসেবে সমাজে পরিচিতি প্রাপ্তদের দিক থেকে অধার্মিক আখ্যা লাভ করছে। এতে ঐসব লোকদের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ হতে গিয়ে মনে হচ্ছে যেন তারা ধর্মের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ হয়ে উঠছে। ধর্মপ্রাণ মানুষ দিয়ে এভাবেই ধর্মপ্রাণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। প্রতিটি মানুষের অন্তরে লালিত তাদের নিজ নিজ বিধাতা থেকে বা একই বিধাতা থেকে, কিছু পরিচিত ধার্মিক মানুষ এভাবেই ভূল আচরণ ও বক্তব্যের মাধ্যমে মানুষকে ধর্ম থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। (লেখা ২০১৩)

সিদ্ধান্ত ও ধর্ম

(Decision and Religion)

বিষয় হিসেবে ব্যাবস্থাপনা বেশ মজার। প্রথম যখন ব্যবস্থাপনা বিষয়ে লেখাপড়া করছি তখন বেশ আনন্দ পেতাম। প্রতিনিয়ত প্রতিদিন আমরা কত শত কাজ করে ফেলছি, কিন্তু কর্ম সম্পাদনে ব্যবস্থাপনীয় প্রক্রিয়াটি কখনও এভাবে ভেঙ্গে ভেঙ্গে ভেবে দেখিনি। হেনরী ফয়েল সেটি দেখিয়েছেন। প্রথমেই আমরা কাজের একটি পরিকল্পনা করছি, তারপর প্রয়োজনীয় সবকিছু সংগঠিত করছি, দিচ্ছি নেতৃত্ব, প্রয়োজনে অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছি, সম্পূর্ণ কাজটি নিয়ন্ত্রনে রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছি ইত্যাদি।



একই রকম অনুভূতি হয়েছিল যখন পরিসংখ্যান বিষয়টি পড়ছিলাম। প্রতিদিন প্রতিনিয়ত আমরা কত শত সিদ্ধান্ত নিয়ে চলেছি, কিন্তু কখনই ভেঙ্গে ভেঙ্গে এভাবে ভেবে দেখিনি যে, একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এগিয়েই আমরা সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করে চলেছি।

পরিসংখ্যান এমন একটি পদ্ধতি যা আমাদেরকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। অন্যভাবে বলা যায় যে, আমরা যখন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি তখন আমাদেরকে পসিংখ্যানের এ পদ্ধতি পাড় হয়েই যেতে হয়।

কোন বিষয়ে যখন আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি তখন প্রথমেই আমরা ঐ বিষয় সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় যাবতীয় সকল তথ্য সংগ্রহ করি, অতপর প্রাপ্ত তথ্যগুলিকে একটি নিয়মের মধ্য দিয়ে সাজাই। যাকে বলা হয় তথ্যের প্রক্রিয়াকরণ। সাজানো তথ্যগুলি যখন আমরা বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করি, তখন তা দেখে উক্ত বিষয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তথ্য সংগ্রহ অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ভূল তথ্যের কারনে গৃহীত সিদ্ধান্তটি ভূল হতে পারে। সংগৃহীত তথ্য যত সঠিক ও পুর্ণাঙ্গ হবে গৃহীত সিদ্ধান্তটি তত সঠিক হবে।

এবার কম্পিউটারের কথা বলি। কম্পিউটারের বিভিন্ন ইনপুট ডিভাইস যেমন- কী বোর্ড, মাউস, স্ক্যানার ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা কি করি? এগুলির মাধ্যমে মূলত আমরা কম্পিউটারে প্রয়োজনীয় তথ্যের অনুপ্রবেশ ঘটাই। অর্থাৎ কম্পিউটারে তথ্য সরবরাহ করা হয়। অথবা বলা যায় ইনপুট ডিভাইসের মাধ্যমে কম্পিউটার তথ্য সংগ্রহ করে।

সিপিইউ বা কম্পিউটারের মস্তিস্কের মাধ্যমে সেই তথ্যের প্রক্রিয়াকরণের কাজটি সম্পন্ন হয়। অতপর প্রক্রিয়াকৃত তথ্য আউটপুট ডিভাইস যেমন মনিটর বা প্রিন্টারের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয় যা সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমাদেরকে সহায়তা করে।

মানুষ আমরা প্রতিনিয়ত নানান সিদ্ধান্ত নিয়ে চলেছি। মানুষের ক্ষেত্রে আমরা চোখ, কান, নাক, জিহ্বা, ত্বক বিবিধ ইনপুট ডিভাইসের মাধ্যমে ইউনিভার্স থেকে প্রয়োজনীয় বিষয়ের ওপর তথ্য সংগ্রহ করছি। মস্তিস্ক বা সিপিইউ-তে সংগৃহীত তথ্যের প্রক্রিয়াকরণ হচ্ছে। অতপর আউটপুট ডিভাইস যেমন হাত, পা, মুখ ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা আমাদের গৃহিত সিদ্ধান্তের বহিঃপ্রকাশ ঘটাচ্ছি।

আমরা আমাদের জীবন চলার পথে বিন্দু থেকে মহাসমুদ্র পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে মুহূর্তে মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে চলেছি। যদি টেইলরিজমের দৃষ্টিতে দেখি, তবে একটি আঙ্গুল নাড়াতেও আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি। গৃহীত সিদ্ধান্তই আমাদের চালক। এর আলোকেই পরবর্তী কর্মকান্ড পরিচালিত। এত গুরুত্বপূর্ণ যে সিদ্ধান্ত তার মূল কোথায়? এর সৃষ্টির কাঁচামাল কি?

কোন দ্রব্য উৎপাদনে কাঁচামাল প্রয়োজন হয়। কাঁচামালের গুণাগুণ যত ভাল হয় উৎপাদিত দ্রব্যও তত ভাল মানের হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাঁচামাল হচ্ছে তথ্য। সিদ্ধান্ত গ্রহণে এই কাঁচামাল খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কাঁচামালের গুণাগুণ যত সঠিক ও মানসম্মত হয়, গৃহীত সিদ্ধান্তও তত সঠিক এবং মানসম্মত হয়ে থাকে।

সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পরিসংখ্যান পদ্ধতিতে, কম্পিউটারের সিপিইউ-তে কিংবা মানুষের মস্তিষ্কে সত্য, সঠিক ও পুর্নাঙ্গ তথ্যটি পৌঁছানো চাই। মিথ্যে বা ভূল তথ্য এবং অসম্পূর্ণ তথ্য কখনই আমাদেরকে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাবে না।

ভূল সিদ্ধান্ত ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং বৈশ্বিক জীবনকে করে তুলবে দুর্বিসহ।

ধর্ম আমাদের জীবনকে ভীষনভাবে প্রভাবিত করে। আমরা কে কি ধর্ম গ্রহণ করব সেটি আমাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত। জেনে বুঝে এ সংক্রান্ত সকল তথ্য সংগ্রহ করে সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন। সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে এ সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ ও যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। একপেশে তথ্য একপেশে সিদ্ধান্তে আমাদেরকে উপনীত করবে। অসম্পুর্ণ তথ্য ধর্মের মর্ম বাণীকে বুঝতে কোনভাবেই সহায়তা দেবে না।

আমাদের মুসলমান হওয়ার মধ্যে আমাদের কোন কৃতিত্ব নেই। মোঃ ... এবং মোসাম্মৎ ... এর ঘরে জন্ম নিয়েছি বলে প্রাপ্ত পরিবেশ আমাদেরকে মুসলমান বানিয়েছে। পারিবারিক পরিবেশ থেকে আমরা কেবলমাত্র একটি ধর্মের বা বলা যায় একপেশে তথ্য পেয়েছি। জেনে-বুঝে-পড়ে, উপলব্ধি বা হৃদয়ঙ্গম করে আমরা মুসলমান হই নাই। যখন কিছুই বুঝি না তখনই মুসলমান হয়ে গিয়েছি। একটি অবুঝ শিশুকে যা বোঝানো হয়েছে তাই বুঝেছি। অর্থাৎ মস্তিস্কে একমুখী তথ্যের প্রবেশ ঘটানো হয়েছে। এটা এক ধরণের প্রতারণা। সব তথ্য জানতে দেয়া হয় নাই। সমাজের বেশীরভাগ হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টানদের এই একই অবস্থা। সকল ধর্ম সম্পর্কে তথ্য না জেনেই আমরা হিন্দু-মুসলিম হয়ে যাচিছ। পূর্ণাঙ্গ তথ্য না জেনে হিন্দু-মুসলিম হওয়ার কারনে ধর্মের বিষয়ে আমরা ভূল সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছি। অন্যের স্বার্থের দ্বারা সহজেই পরিচালিত হয়ে যাচ্ছি। সহজেই মানুষে মানুষে শত্রুতা সৃষ্টি করা সম্ভব হচ্ছে। সেক্ষেত্রেও ভূল বা মিথ্যে তথ্য দিয়ে প্রভাবিত করা হচ্ছে।

যে শিশু মুসলিম পরিবারে জন্ম নিয়েছে, সে উত্তরাধিকার সূত্রে মুসলিম, যে শিশু হিন্দু পরিবারে জন্ম নিয়েছে, সে উত্তরাধিকার সূত্রে হিন্দু, যে শিশু বৌদ্ধ পরিবারে জন্ম নিয়েছে, সে উত্তরাধিকার সূত্রে বৌদ্ধ, যে শিশু খ্রীষ্টান পরিবারে জন্ম নিয়েছে, সে উত্তরাধিকার সূত্রে খ্রীষ্টান হয়ে যাচ্ছে। পরবর্তীতে সে যেটি সমর্থন করছে, সেটি তার নিজের সমর্থন নয় বলে মনে করা যেতে পারে। এটি পরিস্থিতির ফল। আমাদের হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান হয়ে যাওয়া- কোন ধর্মের কোন অনুসারির ঘরে জন্ম গ্রহণের ফল। বলা যেতে পারে- কোন কালে, কোন কারনে, কোন পূর্ব-পুরুষের ঐ নির্দিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করার ফল। তিনি সে সময়ে কোন পরিস্থিতির কারনে হিন্দু কিংবা মুসলমান হয়েছেন আমরা জানিনা। কার দ্বারা

কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছেন আমরা জানিনা। তবে অগ্রগতির এই সময়ে আমাদের সে ভূল করে অনর্থক শান্তির সম্ভাবনাময় এ জীবন ও জগতকে দুর্বিসহ করে তোলার অর্থ হয় না।

প্রতিটি মানুষের মধ্যে সকল ধর্মের তথ্য প্রদান করতে হবে। কেউ যদি তার নিজের ধর্মকে সঠিক ও ক্রটিমুক্ত বলে জানে ও বিশ্বাস করে, তবে তেমন সত্য ও সঠিক পথের অনুসারীর জন্য ভয় কিসে? সে অন্যদেরকে তার নিজ ধর্মে যৌক্তিক ও উন্মুক্তভাবে আহ্বান করবে। এটিই তো বড় সুযোগ! জেনে বুঝে মানুষ তো দলে দলে তার দলেই অর্থাৎ সত্যের পথে ভিড়বে!

"ধর্মের বিষয়ে কোন জোর-জবরদস্তি বা বাধ্য-বাধকতা নেই...।" "ধর্মের ক্ষেত্রে সত্য ব্যাতিত অন্য কিছুকে প্রাধান্য দিও না ...।" (আল-কোরআন ২:২৫৬ ও ৫:৭৭) (লেখা ২০১৩)

নাস্তিক ব্লগার ও আস্তিক হাফেজ!

(Atheist Bloger and Theist Hafez)

যিনি ব্লগার হলেন, তিনি কেন ব্লগার হলেন? কেন তিনি কোরআনে হাফেজ হলেন না? যিনি কোরআনে হাফেজ হলেন, তিনি কেন হাফেজ হলেন? তিনি কেন ব্লগার হলেন না? জ্ঞানের পরিমান অধিক হলেই কি মানুষ ব্লগার হয়? কিংবা কেবল জ্ঞানের পরিমান অধিক হলেই কি মানুষ হাফেজ হয়?



বাংলাদেশের রহিম মুসলিম হল কেন? ভারতের সুনীল কেন হিন্দু হল? ইসলাম ধর্ম কি কেবল একা রহিমই বোঝে? সনাতন ধর্ম কি সুনীল ছাড়া আর কেউই বোঝে না? এগুলো কি কেবল অধিক জ্ঞান বুদ্ধির কারনে হয়?

যে ব্লগার আজ ব্লগার হয়ে নানামুখী প্রতিভায় প্রতিভাবান, যদি সে জন্মের পর এতিম হয়ে কোন ব্লগারের কাছে আশ্রয় না পেয়ে কোন এক মাদ্রাসায় আশ্রয় পেয়ে বড় হত, তবে বড় হয়ে তার কি করণীয় ছিল?

যে হাফেজ আজ হাফেজ হয়ে বড় ধার্মিক, সে যদি ধনীর দুলাল হত, তবে তার হাফেজ হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু ছিল? সেও তো ব্লগার হতে পারতো।

যিনি ব্লগার তিনি ব্লগার হয়েছেন তার পেছনে তার জন্মগত কিছু সুবিধা-অসুবিধা প্রাপ্তি রয়েছে। যিনি হাফেজ হয়েছেন তার পেছনেও জন্মগত কিছু সুবিধা-অসুবিধা প্রাপ্তি রয়েছে। তবে কার দোষে নিজেরা একে অপরকে নিয়ে কুৎসা করছি? দোষ তো জন্মের? সে হিসেবে সৃষ্টিকর্তার। দোষ যদি দিতেই হয় তবে সৃষ্টিকর্তাকে দিতে হয়।

সৃষ্টিকর্তা তো দোষ নেবেন না। তিনি চান মানুষ আচরণে সভ্য হোক। সত্যকে খুঁজে বের করে সত্য পথে চলুক। তাই মানুষকে তিনি বুদ্ধিমান প্রাণী হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তো বলেই দিয়েছেন যে,

“... যেন আমি দেখি তোমরা কেমন কর্ম/আচরণ কর।” (আল-কোরআন ১০:১৪)

মানুষকে স্রষ্টা নিষ্পাপ করে সৃষ্টি করেছেন। নিষ্পাপ হল শূন্য। অর্থাৎ নিষ্পাপ মানুষের স্মৃতিতে বা মেমোরিতে ভাল-মন্দ কিছুই নেই। ভাল না থাক যেহেতু মন্দ নেই তাই নিষ্পাপ। তার মধ্যে ধারণ করার মত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ছাড়া, পরিচালন বা রান করার মত কোন প্রোগ্রাম ইনষ্টল করা হয়নি। অনেকটা বাজার থেকে কিনে আনা একটি নতুন কম্পিউটারের মত, যার মধ্যে তখনও কোন প্রোগ্রাম ইনস্টল করা হয় নাই। কোন ভাইরাসেরও অনুপ্রবেশ ঘটেনি। নিষ্পাপ বা শূন্য অবস্থায় তাকে একটি পরিবেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। সামগ্রীক পরিবেশ থেকে তার ভেতরে প্রয়োজনীয় প্রোগ্রামের অনুপ্রবেশ ঘটে। সেভাবে সে রান করে বা পরিচালিত হয়।

আমরা ব্লগার হই কিংবা হাফেজ হই, হিন্দু হই কিংবা মুসলিম হই, সব হই পরিবেশের কারনে। যে যেই পরিবেশ পাই সে সেই পরিবেশ উপযোগী হয়ে গড়ে উঠি। এটি মানুষের ভেতরের যন্ত্রপাতিগুলির ভৌতিক ও রাসায়নিক ধর্ম। আজ যে ব্লগার কিংবা হাফেজ, অথবা হিন্দু কিংবা মুসলিম- পরিবেশ পাল্টে দিলে ব্লগার হাফেজ হয়ে যাবে, হাফেজ ব্লগার হয়ে যাবে।

পরিবেশ রক্ষার দায়িত্বে যারা নিয়োজিত, তারা উভয়ের জন্য সাম্য পরিবেশ নিশ্চিত করবে, অথবা ভিন্ন মতাবলম্বী হলেও প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতে থেকে সহাবস্থানে চলতে পারবে- সে পরিবেশ নিশ্চিত করবে। সেটিই কাম্য। পরিবেশ সৃষ্টির একটি বড় হাতিয়ার হচ্ছে শিক্ষা।

ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে বেড়ে ওঠা দুটি দল যখন মুখোমুখী হয়, তখন একে অন্যকে স্পেস বা স্থান দিতে চায় না। দোষের কিছু নেই। এটিই মানুষরূপী যন্ত্রের অভ্যন্তরের যন্ত্রাংশগুলির ধর্ম। এখানেই ধর্মের শেষ নয়। আরও ধর্ম আছে। নতুন পরিবেশে সে খাপ খাওয়াতে জানে। তার জন্য প্রয়োজন সহনশীলতা, সুস্থ্য আচরণ, ত্যাগের মনভাব ও আলোচনা। তবেই সহাবস্থান সম্ভব।

যে গাছ বাঁকা হয়ে বড় হয়েছে তার নীচে দাড়িয়ে মন্দ কথা বললে কি সে সোজা হয়ে যাবে? ভবিষ্যতে যেন কোন গাছ বাঁকা না হয় সে ব্যবস্থা নিতে হবে। বর্তমানের বাঁকা গাছগুলিকে তবে কি করতে হবে? সত্যি সত্যি গাছ হলে কেটে ফেলা যেত। কম্পিউটার হলে প্রোগ্রাম ডিলিট করে দেয়া যেত, কিংবা ফরমেট করা যেত। কিন্তু মানুষকে তো মানুষ মেরে ফেলার অধিকার রাখে না। এ কাজ স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার। তিনি বলেন,

“যদি তিনি ইচ্ছে করেন, তিনি তোমাদেরকে অপসৃত করতে পারেন এবং কোন নতুন সৃষ্টিকে নিয়ে আসতে পারেন।” (আল-কোরআন ৩৫:১৬)

আরেকটি বিষয়। গাছ কোনটি বাঁকা সেটিও একটি বিতর্কের বিষয়। গোলাকার পৃথিবীতে উলম্ব হয়ে বেড়ে উঠা প্রতিটি গাছই সোজা, আবার প্রতিটি গাছই বাঁকা। নিজ অবস্থান থেকে কে কোন কোণে বিষয়টিকে দেখছে সেটিই মূল বিষয়। ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োজন এমন শিক্ষা ব্যবস্থা- যেখানে সব বিষয়ই আলোচিত হবে। সবাই সমভাবে তাতে অংশগ্রহণ করবে। ধীরে ধীরে অপ্রয়োজনীয় অংশ আপনা থেকেই মানুষের অন্তর থেকে ডিলিট হয়ে যাবে।

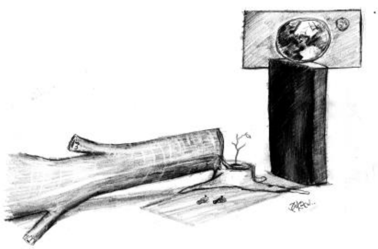
অধীর হওয়ার উপায় নেই। উন্নয়ন সর্বদাই ধীর প্রক্রিয়া। মাটি ভাগ হয়ে মহাদেশগুলি যদি একদিনে সৃষ্টি হয়ে যেত, তবে মানুষ বাঁচতে পারত না। অগ্রগতি ধীর-স্থির ও সহনীয় প্রক্রিয়ায়ই হয়। সৃষ্টিকর্তার নিদর্শনসমুহ সে শিক্ষাই দেয়। একটি ধারণাও কয়েক পুরুষ পর্যন্ত চলতেই থাকে। তাকে একদিনে নিঃশেষ করে দেয়া যায় না। যেমন ব্রেক করে গাড়িকে হঠাৎ থামিয়ে দেয়া যায় না। আবার এটিও সত্যি যে, আজ যাকে বাতিল বলে মনে হচ্ছে একদিন সেটিই অতি প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল বলেই তার সৃষ্টি। প্রয়োজনেই কোন কিছু সৃষ্টি হয়। প্রয়োজনেই নিঃশেষ হয়। প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ অংশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে অবদান রাখে। তাই সৃষ্টিকর্তার প্রত্যাশা অনুযায়ী বোধসম্পন্ন প্রাণী হিসেবে মানুষের মত আচরণ করি। সহনশীল হই। একে অপরের জন্য কিছু স্বার্থ ত্যাগ করি। আলোচনা করি। আলোচনার বিকল্প শুধুই যুদ্ধ, রক্তপাত আর ধ্বংস। লাভের খাতা শূন্য।

“... তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমন কর এবং দেখ তোমাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছিল।” (আল-কোরআন ৩০:৪২) (লেখা ২০১৩)

আস্তিক-নাস্তিক !

(Theist - Atheist)

ভাল লাগা বা বাসা বিষয়টিই বুঝি এমন যে, কে কাকে কেন কখন কিভাবে ভালবাসবে কেবল তার অন্তরই জানে। আর যদি একবার ভালবেসেই ফেলে, যদি সেটি ভূলও হয়, তবুও সেটিতে আঘাত করা যায় না। আঘাত করা ঠিক নয়। তবে পরিকল্পিত ডায়াগনোসিসের ক্ষেত্রে বিষয়টি অবশ্য ভূল নয়।



যেখানে কোটি হৃদয়ের ভালবাসা পুঞ্জিভূত, সেখানে আঘাত করা কোন বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের আচরণ হতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ, গৌতম বুদ্ধের মত মহামানবকে নিয়ে কটু কথা বলতে কোন সুস্থ্য চিন্তার মানুষ বা সত্যিকারের মুসলমানেরও সঠিক আচরণ বলে গন্য হবে না। সেখানে মহানবীকে নিয়ে কটুক্তি করা কতটুকু বিবেক-বুদ্ধিসম্মততার পরিচায়ক সেটি একটি প্রশ্ন সাপেক্ষ বিষয়। এমন আচরণ-সম্পন্ন মানুষের আদর্শের পেছনে কে ছুটবে?

অন্ধকার যুগে এসব মহামানবগণ প্রবল সামাজিক প্রতিবন্ধকতার মুখে সমাজকে এতটুকু এগিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। সেই ভিত্তির ওপর দাড়িয়েই আজ আমরা আরও সুন্দর আগামীর স্বপ্ন রচনা করি। অন্যথায় সে কাজগুলি হয়তো আজও আমাদের কাঁধেই বর্তাত। দেড়-দু হাজার বছর ধারাবাহিক প্রচেষ্টা সত্বেও অনেক সামাজিক সমস্যা আজও সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়নি। সামাজিক সংস্কার সহজ বিষয় নয়। যারা আমাদের পথ দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, তাদের অবদানকে না জেনে-বুঝে অবজ্ঞা প্রদর্শন ভূল।

যারা এ ধরণের আচরণ করে তাদের সে আচরণ সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। আবার যারা এ আচরণ করেছে এ সমাজ তাদেরকেও সঠিকভাবে প্রতিপালন করেনি। নবীকে ভালবাসার শিক্ষা যেমন পরিবার-সমাজ দিচেছ, তেমনি ঘৃণা করার শিক্ষাও সমাজেরই আরেকটি অংশ দিচেছ।

পরবর্তী প্রসংগ ...

একজন আস্তিক দূর্ণীতি করে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুললো। একজন নাস্তিক সৎ ভাবে জীবন যাপন করলো। একজন আস্তিক ধর্ষন করলো। একজন নাস্তিক ধর্ষন করলো না। একজন আস্তিক মানুষ হত্যা করলো। একজন নাস্তিক কোন মানুষ হত্যা করলো না। আস্তিকের কাছে প্রশ্ন আল্লাহ এর কি বিচার করবেন? অথবা আস্তিক নিজেই এর কি বিচার করবেন?

আস্তিক-নাস্তিক হওয়াটি আদৌ কোন বড় বিষয় নয়। বড় বিষয় সত্য, ন্যায় ও সঠিক আচরণের পথে আছি কি নেই।

“ধর্মের ক্ষেত্রে সত্য ব্যাতিত অন্য কিছুকে প্রাধান্য দিও না ...।” (আল-কোরআন ৫:৭৭)

যারা আমরা নিজেদেরকে আস্তিক দাবী করি, মূলত সত্যকে সামনে রেখেই আমরা আস্তিক হই। প্রত্যেকের নিজ পথ বেছে নেয়ার অধিকার আছে। যার ইচ্ছে সে আস্তিক হবে, যার ইচ্ছে সে নাস্তিক হবে। নাস্তিক হওয়ায় সমস্যা কি, যদি অন্যায় বা কোন মন্দ কাজ না করে। অন্যায় বা মন্দ কাজ করলে আস্তিক হয়েও বা লাভ কি? অন্যায় করলে আল্লাহ আস্তিককেও ছাড়বেন না। কোরআন সে বার্তা দেয়।

স্রষ্টা আমাদের সম্মুখে তাঁর নিদর্শন সমুহ উপস্থাপন করেছেন। কেউ খুঁজে পাই কেউ পাইনা। একটি নিদর্শনের কথা বলি। বাবা-মা’র দুই সন্তান। একজনের আদর ভালবাসার প্রকাশ এমন যে, জগত তার প্রকাশিত ভালবাসা দেখতে পায়। অন্যজনকে মা-বাবা কাছে পেতে চাইলেও দুরে দুরে থাকে। এর মানে এই নয় যে, তার প্রতি মা-বাবার ভালবাসা কমে গেছে। কিংবা মা-বাবার প্রতি সন্তানটির ভালবাসা নেই। ভক্তি-ভালবাসার প্রকাশ একেক জনের একেক রকম।

যাকে নাস্তিক বলে মনে করি, অন্তরের কোন অন্তস্থলে কোন বিশ্বাসে তার বসবাস আমরা জানিনা। জানেন অন্তর্যামী। কার ভালবাসা প্রার্থনা তিনি গ্রহণ করছেন সেটি আমরা কেউই জানিনা। মানুষে মানুষে চিন্তা-ভাবনা, বিশ্বাসে-ব্যাখ্যায় পার্থক্য আছে এবং থাকবে, এটিও আল্লাহর বৈচিত্রময় সৃষ্টির নিয়ম ও নিদর্শন। তিনি চাইলে সব সমস্যার সমাধান করে দিতেন। তিনি নিজেই সেটি করেন নি। সে কথাটিও তিনি জানিয়ে দিয়েছেন।

"যদি তোমার পালনকর্তা চাইতেন, তবে পৃথিবীর বুকে যারা আছে তাদের সবাই একসঙ্গে বিশ্বাস স্থাপন করতো ...।" (আল-কোরআন ১০:৯৯)

মানুষের সত্য-সুন্দর, সঠিক ও ভদ্র আচরণই আল্লাহর কাছে প্রত্যাশিত। এটিই পরীক্ষা। কে আস্তিক, কে নাস্তিক সেটি জানেন কেবল অন্তর্যামী? বিচার দিবসে তিনি রায় দেবেন।

এ দুনিয়ায় সকলেই আমরা পরীক্ষার্থী। একজন পরীক্ষার্থী যেন আরেকজন পরীক্ষার্থীর ফলাফল ঘোষনা না করে ফেলি। আল্লাহর রায়ের ক্ষমতাকে আমরা যেন নিজ হাতে তুলে না নেই। ভয় হয় এই ভেবে যে, সেটি 'শিরক' এর পাপের সমান হয়ে যেতে পারে। আল্লাহ সব মাফ করলেও এই পাপ মাফ করেন না।

একে অন্যকে আস্তিক-নাস্তিক না বলে আল্লাহর রায়ের অপেক্ষায় ধৈর্য্যধারণ করি। বিশ্বাসের সাথে বিচার দিবসের অপেক্ষায় থাকি। যদি আমরা আল্লাহতে সত্যিকারের বিশ্বাসী হই।

এমনও হতে পারে যে, আমরা কোন আস্তিককে নাস্তিক বলে ভূল করে ফেলছি এবং নিজেকে পাপে জড়িয়ে ফেলছি। আল্লাহর প্রতি অতি ভালবাসা দেখাতে গিয়ে হয়তো পাপে জড়িয়ে পরতে পারি। অতিরিক্ত কোন কিছুই ভাল না। সব বিষয়েই সীমালংঘন করতে বারণ করা হয়েছে।

অন্তরাত্মা যার জাগ্রত। যার ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় বিচারের সক্ষমতা আছে- সে বিশ্বাস দ্বারা ভাল ও সঠিক পথে চালিত হয়। আস্তিক-নাস্তিক এগুলি কেবলই মস্তিস্কের ধারণা প্রসূত কিছু বিষয় থেকে সৃষ্ট। একেক জনের একেক বিশ্বাস। সকলের ধারণা হুবহু আমার মত হতে হবে এমনটি ভাবাও বুদ্ধিমান বা ভাল মানুষের বা ভাল মুসলমানের লক্ষণ নয়। দু'জন মুসলমানের মনোজগতেও আল্লাহ সম্পর্কিত ধারণা এক নয়। আর ধারণা প্রসূত বিশ্বাস নিয়ে নিজেদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলা অর্থহীন। বিষয়টি বর্তমানের চেয়েও বেশী কষ্টকর মনে হয় এই ভেবে যে, পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আমরা সন্দেহ ও শত্রুতার সৃষ্টি করে দিয়ে যাচিছ। যার মন্দ ফলাফল আমাদেরই সন্তানেরা ভোগ করবে।

যে কোন ছুঁতোয় হানাহানি উস্কে দেয়া পাপ। এমনকি হত্যার চেয়েও গুরুতর পাপ।

"... নিন্দা-নির্যাতন/দাঙ্গা-হাঙ্গামা/বিশৃংখলা সৃষ্টি করা হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ।।" (আল-কোরআন ২:১৯১)

আস্তিক-নাস্তিক!

নিজ নিজ স্থানে যারা নেতৃত্বের আসনে আসীন, তারা তাদের অনুসারিদেরকে নিবৃত্ত করবেন, সুস্থ্য সাধারণ মানুষ নেতৃত্বের কাছে সেটিই প্রত্যাশা করে। (লেখা ২০১৩)

সৃষ্টিকর্তা

(God)

আমি মানুষ। আজ প্রশ্ন করবো না কে আমার স্রষ্টা। কেননা স্রষ্টা কে তা আমি জানি। যিনি আমায় সৃষ্টি করেছেন তিনিই আমার স্রষ্টা।

আজ জানতে চাই ক'জন আমার স্রষ্টা। ঐ যে পিপড়েটি হেঁটে হেঁটে চলে যাচ্ছে তার স্রষ্টা ক'জন? গাছের স্রষ্টা ক'জন। সাদা মানুষের স্রষ্টা আর কালো মানুষের স্রষ্টা কি এক? নারীর স্রষ্টা ক'জন? পুরুষের স্রষ্টা ক'জন? হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান প্রত্যেকের জন্য কি আলাদা আলাদা স্রষ্টা? মোট কতজন স্রষ্টা এ জীবন ও জগতের?

হিন্দু কাকে উপাসনা করে? মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান কাকে উপাসনা করে? কে চেনে স্রষ্টাকে? কে দেখেছে? কি তার রূপ? কার কথা সঠিক?

সত্য হচ্ছে, যার কাছে যে বার্তা পৌঁছেছে, যে যেভাবে বিশ্বাস স্থাপন করেছে তার কাছে সেটিই সঠিক। বিশ্বাসের প্রতিস্থাপন সহজ নয়। চাইলেই সব হিন্দুকে মুসলিম কিংবা সব মুসলিমকে হিন্দু বানানো সম্ভব নয়।

কি বিশ্বাস করি আমরা? কোথায় কিভাবে পেলাম বিশ্বাসের সেসব দর্শনগুলি? বার্তাবাহকদের মাধ্যমে। বার্তাবাহকেরা কি কেবল আরবেই এসেছেন? তারা যে বার্তাসমুহ এনেছেন সে বার্তাগুলি কার? কি আছে সেসব বার্তায়? মানুষের চলার দিক নির্দেশনা। ধর্ম। কি বলে ধর্ম? এক মানবের কত ধর্ম প্রয়োজন? তাহলে সত্য কোনটি?

দেশে ব্যাংক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। প্রথমে একটি ব্যাংক; অতঃপর দু'টি তিনটি চারটি, এভাবে আজ অনেক ব্যাংক। বস্তুত সকলের কাজ একই। অথচ কত নামের ব্যাংক! শহরে ও গ্রামে এবং আরও ছড়িয়ে যাবে। দেশব্যাপি একটি ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটছে। ব্যাংকগুলির মধ্যে সেবাদানের প্রতিযোগীতা। একের চেয়ে অন্য ভাল। প্রতিযোগীতা ভিন্ন পারফেকশন বা উৎকর্ষতা অর্জন হয় না। যখন প্রত্যেকের লক্ষ্য পুরণ হয়ে যায়, তখন প্রয়োজন হয় সমন্বয়ের। সব একীভূত হয়ে যায় বা করা হয়। বড় লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয়।

এক সময় এক ব্যাংকের এটিএম মেশিন অন্য ব্যাংক ব্যবহার করতে পারতো না। এখন সবাই সবারটা ব্যবহার করতে পারে। যার হাতে সকল কিছুর চাবি সে

সব করতে পারে। প্রতিযোগীতা সৃষ্টি করে শ্রেষ্ঠ উপায়ে লক্ষ্য অর্জন করা হয়। প্রতিযোগীতা দিয়ে শুরু। প্রক্রিয়াটিই এমন।

এক সময় দেশগুলির মধ্যে দুরত্ব ছিল। একে অন্যকে জানতো না। ছিল সন্দেহ-অবিশ্বাস ও ঘৃণা। হয়েছে যুদ্ধ-বিগ্রহ। প্রতিযোগীতা। আজ জাতিসংঘ সমন্বয় করছে পুরো পৃথিবীর।

পৃথিবীর যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পন্ন হলে দুরের গ্রহের সাথে যোগাযোগের কাজ শুরু হবে। যেন এক কোষের সাথে অন্য কোষের সংযোগ। যোগাযোগ এক সময় পূর্ণতা পাবে। তার পূর্বে হয়তোবা যুদ্ধ-বিগ্রহ হতে পারে গ্রহগুলির অধিবাসিদের মধ্যে। গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যোগাযোগ স্থাপিত হবে। এই যোগাযোগ ব্যবস্থাই স্নায়ুতন্ত্র বা নার্ভ। এক পর্যায়ে দেখা যাবে হয়তোবা আসমানে একটি হাতের আকৃতির মত কিছু সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের হিসেবে বিশাল বড়। যেমন আনুবীক্ষণিক জীবের হিসেবে আমরা অনেক বড়। মানুষ আবার খুঁজে বেড়াবে নতুন কাজের সন্ধান। আবার নতুন কোন কোষে প্রবেশ করবে। হয়তোবা আরও উন্নত কোথাও, যেখানে পাওয়া যেতে পারে স্বর্গীয় সুখ। এক সময় পরিপূর্ণ কিছু একটা সৃষ্টি হবে। যেমন মায়ের পেটে এক সময় আমরা সৃষ্টি হয়েছি। সেখানেও কাজ করেছে কারিগর।

যারা আমাদের মায়ের পেটে সৃষ্টিতে কাজ করেছে, তারা আমরাই। তখন তখনকার উপযোগী ভিন্ন আকৃতি ধারণ করে হয়তোবা কর্ম সম্পাদন করেছি। এখন করছি এখনকার উপযোগী হয়ে। ভবিষ্যতে ভবিষ্যতের উপযোগী হয়ে কাজ করে যাব। নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করি। নিজেই নিজেকে ভক্ষন করি। ধ্বংস করি। রূপান্তর ঘটাই। তাই কোন আদি নেই কোন অন্ত নেই।

তখন ছিলাম দুরে- বহুদুরে। ধর্মে ধর্মে পার্থক্য ছিল বিশাল। ছিল হানাহানি। বোধও কম ছিল। জানাজানি কম ছিল। একে অন্যকে সহ্য করার মত অবস্থা ছিল না। ঘৃণা ও ভয় কাজ করতো। একের কাছে অন্যকে অস্পৃশ্য মনে হত। মানুষ যতই একে অন্যের কাছাকাছি এসেছে, একে অন্যের সাথে মিশেছে- মনটা বড় হয়েছে। ধ্যান-ধারণায় পরিবর্তন এসেছে। অপরকে গ্রহণ করতে শিখেছে। ভাষায়-ভাষায়, আচার-আচরণে, খাদ্যাভ্যাসে, রীতি-নীতিতে পার্থক্য আছে। কিন্তু মর্ম কথা এক। সত্যের পানে ছুটে চলা। সত্যই লক্ষ্য। বিধাতাই সত্য। সকল সত্যের

বা সূত্রের তিনিই ধারক। সত্যের পথে চলাই মানুষের ধর্ম। সকল ধর্মের লক্ষ্য বা মর্মকথা এটি।

এক সময়ের প্রয়োজনে দুর-দুরান্তে জাতিতে-জাতিতে নানান ধর্ম গড়ে উঠেছে। আবার সময়ের প্রয়োজনে সমন্বয়ও ঘটবে। সত্য খুঁজে পাওয়া যাবে। যে স্রষ্টাকে কেউ কোনদিন দেখেনি, চেনেনা, জানেনা এবং যাকে বোঝাও সম্ভব নয়- তিনি এক। মানুষও একই জাতি। একই মানুষের ধর্মও এক; অর্থাৎ স্রষ্টার প্রতি বা অন্য কথায় তাঁর দিক নির্দেশনার প্রতি সমর্পন।

সৃষ্টিকর্তার আকৃতি-প্রকৃতি, গুণাগুণ নিয়ে বিভাজন নির্বুদ্ধিতা। এগুলো নিয়ে হানাহানি করা আরও নির্বুদ্ধিতা। তবে স্বার্থের কারনে তেমনটি হয়ে থাকলে তার মধ্যে যৌক্তিকতা আছে; আছে বুদ্ধিমত্তা, আছে বাস্তবতা এবং কৌশল। যারা এসবের সঠিক ব্যবহার জানে তারাই বাস্তববাদী। বাস্তব জগতে তারাই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। এমনকি স্ত্রী-পুত্র-কন্যা থেকে শুরু করে সমগ্র জনগনের কাছে তারাই পূঁজনীয়। তবে সৃষ্টির মূল সত্য যিনি বোঝেন এবং সে পথে মানুষকে চলতে উদ্বুদ্ধ করেন, তার জন্য এ জগতে আছে ধিক্কার তথা গঞ্জনা, অবশেষে হয়তোবা 'ক্রুশ'।

পর্দা

(Veil)

ছেলে বেলায় পরিকল্পনা করে টিভি দেখতাম। লেখাপড়ার সময় ঠিক রেখে কখন কোন অনুষ্ঠান আছে সেভাবে বুঝে শুনে টিভির সামনে বসতাম। আজকালের মত তখন কম্পিউটার ছিল না। ঘরে ঘরে টেলিভিশন এত সহজ প্রাপ্য ছিল না। টিভির এত চ্যানেল ছিল না। ছিল কেবল একটাই চ্যানেল। বিটিভি। তাও আবার সাদাকালো। সেটিও আবার চব্বিশ ঘন্টা চলত না। যতদূর মনে পড়ে, বিকেল পাঁচটায় শুরু হয়ে রাত বারোটার মধ্যে শেষ হয়ে যেত। দেশের সর্বত্র নেটওয়ার্ক ছিল না। সব বাসায় টিভি ছিল না। সন্ধ্যায় কমিউনিটি সেন্টারগুলোর সামনে ভিড় জমতো। বিটিভিতে যদি কোনদিন একটা ভাল অনুষ্ঠান হবে তো সারা দেশে তার খবর ছড়িয়ে যেত।

এখন ঘরে ঘরে টিভি। সেটিও আবার রঙ্গিন। অসংখ্য দেশী বিদেশী চ্যানেল। যতটা না টিভি দেখি তার চেয়ে বেশী চ্যানেল পাল্টাই। পছন্দ হলে একটু থেমে দেখি।

সেদিন ঘুরাতে ঘুরাতে এক চ্যানেল উপস্থিত। যিনি কথা বলছেন তিনিও বিখ্যাত। কিন্তু যে কথাটি বললেন সেটি মনঃপুত হল না। তাই লিখতে বসা।

একটি উদাহারণ তুলে ধরলেন। মনে করেন লন্ডনের কোন রাস্তা। দু'জন মহিলা হাটছেন। একজনের শরীর পর্দায় আবৃত এবং অপরজন মিনি কিংবা মিডি পরিধান করেছেন। পাশে দিয়ে একজন বখাটে ছেলে যাচ্ছে। সে আক্রমন করলে কাকে করবে? নিশ্চয়ই সেই মিনি ড্রেস পরিধান করা মহিলাটিকে। তাই পর্দা মেনে চলা উচিৎ।

কোরআনের বাণী সঠিক সেটি প্রমাণের আন্তরীক চেষ্টা করা হয়েছে। আন্তরীকতায় ঘাটতি নেই। কিন্তু সাধারণ বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কাছে উদাহারণটি সহজে গ্রহণযোগ্য নয়।

বক্তব্য শেষে টিভি ক্যামেরা দর্শকদের দিকে যখন ঘুরিয়েছে, চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে অনেকেই অন্যান্য যুক্তিগুলির মত এ যুক্তিটিকে তেমন স্বতঃস্ফুর্তভাবে মন থেকে মেনে নিতে পারছে না। তবুও চুপ করে শুনে যাওয়া। এত মানুষের মাঝে, এত বড় মাপের মানুষের বক্তব্য নিয়ে আলোচনা করার

পরিবেশ নেই। এত সু-সংগঠিতদের সম্পর্কে এক দু'জনের পক্ষে কথা বলাও সম্ভব নয়। আবার বলেও লাভ নেই। কেউ সে কথা শুনবে না। জগতের বুদ্ধিমান মানুষগুলো এমন যে তারা কথা শোনে না। তারা দেখে কোন দিকে বেশী মানুষের উপস্থিতি! কোন দিকে লাইক বেশী। আবার তারা সত্যকেও খুঁজে না, তারা নিজের লালিত বিশ্বাসকে সত্য প্রমাণে যুক্তি খুঁজে বেড়ায়।

তারপরও সমসাময়িক সময়ে দোর্দন্ড প্রতাপে অবস্থানকারীদের সামনেও সৃষ্টিকর্তা ছোট্ট প্রতিবাদের সুর তুলে দেন। যেন কেউ গর্ব না করে। নিজেকে নির্ভূল না ভাবে। নিজেকে পরম প্রতাপশালী না ভাবে। সে কারনেই আমরা খ্রীষ্ট ধর্ম পেয়েছি। মুসলিম ধর্ম পেয়েছি। বৌদ্ধ ধর্ম পেয়েছি। একদিন এগুলোও ক্ষুদ্র ছিল। আজ বড় হয়েছে।

বখাটে হলেই রাস্তায় দু'জনকে দেখে কেউ কারো ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে না বা পড়তে পারে না। বিষয়টি এতটাই সহজ না। আবার ঝাঁপিয়েই যদি পরে তবে সেটি ছিনতাইয়ের জন্যও পড়তে পারে। সেক্ষেত্রে কে পর্দাওয়ালা বা কে পর্দাওয়ালা না বখাটে সেটি বিবেচনা নাও করতে পারে।

এটা বুঝতে পারছি যে এখানে ছিনতাই বা অন্য কিছু বোঝান হয়নি। এখানে সম্ভবত ধর্ষন চেষ্টাকে বোঝান হয়েছে। বখাটে হলেই যখন তখন রাস্তায় ধরে সহজেই একজনকে ধর্ষন করে ফেলতে পারে না। বিষয়টি এত সহজ না। যদি না পূর্ব-পরিকল্পিত হয়। মাথায় এমন অগ্রীম ভাবনা আনার প্রয়োজনীয়তা নেই।

পর্দার পক্ষে কথা বলতে গিয়ে বলা হচ্ছে বখাটে মিনি পরিহিত মহিলাকে আক্রমন করবে। এটি নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয় যে বখাটে মিনি পরিহিত মহিলাকেই আক্রমন করবে। বিষয়টি নির্ভর করে বখাটের সে মুহুর্তের তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তের ওপর। বখাটের যদি অজানা-অদেখাকে আবিস্কারের নেশা চেপে বসে, সেক্ষেত্রে পর্দা পরিহিত মহিলাকেই আক্রমন করার সম্ভাবনা বেশী। আজকাল সুন্দর-সুন্দর দামি পর্দা বাজারে দেখা যায়, যা সাধারণ পোষাকের চেয়েও বেশী উত্তেজক, যদি বিষয়টিকে এভাবে ভাবি? আসলে কটু বা নেতিবাচক দৃষ্টি নিয়ে কোনটিই অগ্রীম ভাববার প্রয়োজন নেই।

যখন বাড়তি পর্দা ব্যবহার করা হয়, তখন অবচেতনভাবে মন বলে দেয় তুমি বাইরে পথে-ঘাটে ধর্ষনের স্বীকার হতে পার। একটা নিস্পাপ ছোট্ট মেয়ে শিশু সেভাবে পরিবার ও সমাজ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে বড় হয়। স্রষ্টার সৃষ্ট এ সুন্দর

পৃথিবীকে শৈশব থেকেই অন্তরে নোংরা ভাবতে শেখে। পিঠাপিঠি বোনটিকে বাড়তি পর্দা পরিধান করতে দেখে ছোট্ট ভাইটিও জগৎ সম্পর্কে ধারণা গ্রহণ করে। এগুলি মনের ওপর পৃথিবী সম্পর্কে ভীষন নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। অল্লাহর সৃষ্ট এ সুন্দর পৃথিবীতে সঠিক নির্দেশ না মেনে যে দু'চারজন সমাজটাকে নোংরা করছে, তাদের বিরুদ্ধে কথা বলার মানসিক শক্তিকে এ ব্যবস্থা নষ্ট করে দেয়। মনে মনে সে নষ্ট মানুষদের কাছে পরাজয় স্বীকার করে নেয়। তাদের নষ্ট কাজ করাকে নিরবে স্বীকৃতি দিয়ে দেয়। প্রতিবাদ করার ক্ষমতাকে প্রথমেই মানসিকভাবে পর্যুদস্ত করে রাখে।

পৃথিবীর বহু দেশের প্রধানমন্ত্রি পৃথক পর্দা ব্যবহার করছেন না। তারা তো এরকম উদ্ভট আতংকে ভূগছেন না? লক্ষ লক্ষ মহিলারা পথে-ঘাটে, অফিসে-আদালতে পৃথক কোন পর্দা ব্যবহার না করেই চলাফেরা করছেন, কই তারা তো এমন আতংকে ভুগছেন না? তবে কেন আমরা সমাজে এমন আতংক ছড়িয়ে দিচ্ছি? আতংক ছড়ানোটাই যত সমস্যার মূল। উদ্ভট আতংক না ছড়ালে হয়তো বিষয়টি নিয়ে কেউ এভাবে ভাবতও না।



সম্পূর্ন দেহটিকে স্বেচছায় কেউ বাড়তি পর্দা ব্যবহার করে আবৃত করতে চাইলে করবে। সেটিও তার অধিকার। আবার অনেকে এ ব্যবস্থায় অভ্যস্তও হয়ে গেছে। অন্যথায় অস্বাচছন্দ্য বোধ করে। সে করবে। তবে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্যে শিক্ষাটি হওয়া প্রয়োজন অন্তরকে কলুষমুক্ত করা। কোরআন বলছে-

"হে আদম সন্তান! আমি তোমাদেরকে দিয়েছি পোষাক-পরিচ্ছদ, যেন তোমরা লজ্জা নিবারণ কর এবং এবং দিয়েছি সাজ-সজ্জার নানাবিধ বস্ত্র; কিন্তু মন্দ কর্ম/পথ থেকে নিজেকে নিবৃত রাখার পরিচ্ছদ সর্বোত্তম। ...।" (আল-কোরআন ৭:২৬)

আলেচিত উদাহরনটিতে রাস্তায় যেভাবে ধর্ষনাতংকের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, বাস্তবে পথে চলতে গিয়ে কি অহরহই তা সেভাবে ঘটছে? তহলে কি পৃথিবীময় লক্ষ কোটি নারী কর্ম শেষে নিরাপদে প্রতিদিন ঘরে ফিরে আসতে পারত? যুগ পাল্টেছে। তার চেয়েও বড় বিষয় মানুষের মন-মানসিকতা ও চিন্তা সবকিছুই উন্নত হয়েছে। আরও হবে। কিন্তু যারা আতংক ছড়ায় তাদের কারনে অগ্রগতি পিছিয়ে

যায়। তাদের শক্তি বিপরীতমুখী না হয়ে যদি সমমুখী হত, তবে হয়তো আরও দ্রুত অগ্রগতি সম্ভব হত।

বিকৃত ভাবনার প্রয়োজন নেই। অবশ্যই এটি স্বীকার করতেই হবে যে প্রতিদিনই এ বিশাল পৃথিবীতে কিছু দুর্ঘটনা ঘটেই চলেছে। শতকার হিসেবে নগন্য। সেটিও কাম্য নয়। পৃথিবীতে ভাল মানুষের সংখ্যা অনেক অনেক বেশী। কিন্তু যখন দুর্ঘটনা ঘটে সে সময় ভালরা প্রস্তুত থাকে না বা সু সংগঠিত থাকে না। যারা দুর্ঘটনা ঘটায় তারা থাকে সংগঠিত। তাদের পূর্ব-পরিকল্পনাও থাকতে পারে। তাই নষ্টদের সাথে তাৎক্ষনিক পেরে ওঠা সম্ভব হয় না। আবার নষ্টরা আইন মানে না। তারা দ্রুত ঘটনা ঘটাতে পারে। অথচ নষ্টদের অপরাধের বিচার করতে হলেও আইন মেনে চলতে হয়। তবে সব ঘটনায়ই পরিশেষে সত্যের জয় হয়।

দুর্ঘটনার ওপর কারও হাত নেই। কখন ঘটবে কেউই বলতে পারে না। আবার দুর্ঘটনা তো অনেক রকম হতে পারে। গাড়ির নীচে চাপা পরে মানুষ মারা যেতে পারে। পথে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে মানুষ মেরে ফেলতে পারে। কই সেজন্য তো লোহার পর্দা পরিধানের কথা বলা হচেছ না? জীবন সবার ওপরে!

প্রয়োজন মানসিকতার পরিবর্তন। যে সময়, অর্থ ও শ্রম পর্দার পক্ষে যুক্তি আবিষ্কারে ব্যবহার করা হচ্ছে- তা মানবের মানসিকতা, দৃষ্টিভঙ্গী ও অন্যায়ের বিপক্ষে প্রতিবাদী হয়ে গড়ে ওঠা ইত্যাদি পরিবর্তনের পেছনে ব্যায় করা প্রয়োজন। আরও ব্যায় করা প্রয়োজন সমাজ যাদেরকে সঠিকভাবে লালন করতে পারে নাই তাদের সংশোধনের জন্য। পর্দার প্রয়োজন নেই- এ লেখাকে তেমন ভূলভাবে বুঝে নেয়ারও অবকাশ নেই। তবে পর্দা ব্যাহারেরও একটি মাত্রা বা সীমা থাকা বাঞ্ছনীয়।

পবিত্র কোরআনে পর্দার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে কি কোরআন ভূল বার্তা দিয়েছে? নিশ্চয়ই না। কোরআন ভূল বার্তা দেয়নি। কোরান বলছে-

"আমি যাদেরকে গ্রন্থ প্রদান করেছি, তাদের মধ্যে যারা তা সঠিকভাবে পাঠ করে (যথার্থ অনুধাবন করে), তারাই তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। ...।" (আল-কোরআন ২:১২১) (লেখা ২০১৩)

মাহে রামজান

(Month of Ramadan)

অফিস থেকে বাসায় ফিরছে সবাই। রাস্তায় ভীড়। গাড়ীতে ভীড়। হয়তোবা ঠাঁ ঠাঁ রোদও আছে। ক্ষুধা না থাক পিপাসায় ভেতরটা ফেটে যাচেছ। তবুও ভাবতে ভাল লাগে- ঘরে ফিরে গোসল দিয়ে শরীর মনে পবিত্র হব; মা-বাবা, ভাই-বোন, স্ত্রী-পুত্র-কন্যাসহ ইফতারী নিয়ে বসে আছি; সূর্যাস্তের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা। অপেক্ষারত অবস্থায় বসে মহান সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করছি। রোজাদার ভিন্ন এ আনন্দের অনুভূতি অর্জন সম্ভব নয়।

ইফতারী রোজার দিনের এক অনবদ্য আকর্ষন। রোজার দিনে ইফতারীর হরেক রকম আয়োজন। বিখ্যাত বিখ্যাত নামকরা সব জায়গায় নামকরা সব ইফতারীর আয়োজন। বড় বড় মুরগীর ফ্রাই, কাবাব, পরটা, নান, হরেক পদের হালিম, হরেক পদের জিলাপী, ছোলা পেয়াজু বেগুনী, হরেক পদের চপ, নানান সব ফল, নাম জানা ও না জানা কিংবা নতুন আবিস্কৃত নামের নতুন নতুন চোখ ধাঁধাঁনো মন ভোলানো নানান সব ইফতারী!

সূর্য্য অস্তগামী। আকাশটা লাল। আঁধার নেমে আসছে। একটু পরেই শোনা যাবে আযানের ধ্বনি। এখনও রাস্তায় লাইন দিয়ে মানুষ হুড়োহুড়ি করে ছুটোছুটি করছে, কেনা কাটা করছে। এ যেন এক আনন্দদায়ক আবেশ ও পরিবেশ।

সারাদিন না খেয়ে হঠাৎ করে এক সাথে অনেক বেশী ইফতারী গ্রহণ শরীরের জন্য ভাল নয়। এটি মন ও আত্মার উন্নয়নের জন্যও ভাল নয়। এটি রোজার শিক্ষার সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। যেহেতু রোজার শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, তাই দেখতে কিংবা দেখাতেও সামাজিকভাবে ভাল বোধ হওয়ার কথা নয়। অনেক ক্ষেত্রে অপচয় হতেও দেখা যায়। এসব আচরণ মন্দ সমালোচনার সুযোগ তৈরী করে দেয়। বিশেষত যারা সত্যিকারভাবে আল্লাহকে স্মরণ করেন, এমনকি অন্য ধর্মাবলম্বীদেরও।

রোজা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। একটি বয়সে সে উপকারটি সরাসরি বুঝতে পারা না গেলেও, বয়সের আরেকটি পর্যায়ে সেটি ভালভাবে অনুভব করা যায়। যদি কেউ অনুভব করতে চায়।

রোজা কেবল রোজাই নয়, পূর্ণাঙ্গ ধর্মীয় রীতিনীতির একটি অংশ হিসেবে ধর্মের অপরাপর নির্দেশসমুহ মেনে চলার পথে শক্তির সমাবেশও বটে। যা সামাজিক শৃংখলা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখে। আত্মিক উন্নয়নের প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে নানান অপকর্ম থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে মানসিক শক্তির যোগান দেয়। বিশ্বব্যাপী একই নিয়ম ও রীতিতে চলা মানুষের সাথে মানুষের ভ্রাতৃত্ববোধকে সুসংহত করে। আত্মিক যোগাযোগ স্থাপন করে মানুষে মানুষে ও স্বয়ং বিধাতার সাথে। রোজা ক্ষুধার্তের ক্ষুধার জ্বালা বুঝতে সাহায্য করে। কিন্তু এ জ্বালা বুঝে লাভ কি?

পৃথিবীতে যখন বহু শিশু খাদ্য-বস্ত্র-চিকিৎসা-বাসস্থান ও লেখাপড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত, তখন ইফতারীর অতি আয়োজন ক্ষণিকের জন্য হলেও ইফতারীর আনন্দকে ব্যাহত করে। এটি পৃথিবীর অসংখ্য মানুষকে ভুভূক্ষ রেখে স্বর্ন-খচিত মিনার তৈরীতে খরচ করার মতোই মনে হয়। যার পেটে ভাত আছে সে মিনার বানাবার মত ভাবনা ভাবতে পারে। কিন্তু যার পেটে ভাত নেই তার জ্বালা অনেকে রোজা রেখেও অনুভব করে না। এমন রোজা কোন শিক্ষা দেয় না। ক্ষণিকের আনন্দ ও সাময়িক সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করে। ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য তাতে অর্জিত হয় না।



উন্নত যোগাযোগের আজকের পৃথিবীতে কিছু মানুষ না খেয়ে, না পড়ে থাকবে- মেনে নেয়া যায় না। তথাপি মেনে নেয়া যেত যদি সম্পদের অভাব থাকত। পৃথিবীতে কি সম্পদের অভাব আছে? মোটেও না। আছে বৈষম্য। কিছু মানুষ কিছু মানুষকে না খাইয়ে রেখে হলেও নিজেদের নিরাপত্তা বিধান কিংবা মর্যাদার লড়াইয়ে ব্যাস্ত। সম্পদের প্রবাহ সেদিকেই বেশী। যদিও এত আয়োজন শেষে না আসে মরণশীলের জীবনের নিরাপত্তা, না আসে মর্যাদা। বরং ইতিহাস বলে যে এ দুটি আচরণ দিয়েই মানুষ নিজ হাতে তার নিজের ধ্বংস ডেকে আনে।

ক্ষুধার্তের ক্ষুধার জ্বালা বুঝে রোজাদারের শিক্ষাটি কি? কিংবা করণীয় কি? ইফতারীর সময় থালা হাতে বাড়ীর গেটের সামনে যে শিশুটি দাড়িয়ে আছে তার পাতে খাবার তুলে দেয়া? এটিই কি সমাধান? এমন মহত্ব প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তা কি?

ব্যাক্তি হিসেবে রোজাদারের যেমন কিছু দায়িত্ব আছে, তেমনি সামষ্ঠিকভাবেও রোজাদারগণের কিছু দায়িত্ব আছে। আজকের পৃথিবীতে সেটিই মুখ্য।

একটি জাতিকে ভিক্ষুক বানিয়ে রাখা যদি অপরাধ হয়, তবে একটি ব্যাক্তিকে ভিক্ষুক হয়ে থাকতে উৎসাহ দেয়াও অপরাধ। খাবার চাইতে আসা শিশুটির পাতে খাবার তুলে দেয়া তাকে ভিক্ষুক হতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষন দেয়ার সামিল। তাছাড়া তাকে ভিক্ষে চাইতে হবে কেন? সৃষ্টিকর্তা সকলের জন্য বরাদ্দ রেখেছেন। পৃথিবীতে খাদ্য ও সম্পদের অভাব নেই। সমস্যা হচেছ শিশুটির ভাগের অংশটি তার কাছে যেভাবে পৌঁছে যাওয়ার কথা, পথিমধ্যে কোথাও সেটি বাধাপ্রাপ্ত হচেছ। কিংবা কেউ না কেউ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করছে। কোথাও না কোথাও অন্যায় ঘটে যাচেছ যুগের পর যুগ। মানুষের ভালবাসা আর ক্ষমা করে দেয়ার বৈশিষ্টের সুযোগ নিচেছ কেউ না কেউ।

মানুষ না খেয়ে আছে, ডাষ্টবিনে শিশুরা কাক কিংবা কুকুরের সাথে খাবার নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে- এ দৃশ্যগুলি মানবীয় ব্যবস্থাপনার কোথাও অন্যায় ও অবহেলা ঘটে যাওয়ার নির্দেশক।

বার-বি-কিউতে বসে মুরগীর রোষ্ট সামনে নিয়ে বন্ধুরা যখন ব্যাবসা বাণিজ্য, বাড়ি গাড়ীর অগ্রগতির আলোচনায় মশগুল, সেখানেও নিভৃতে কিছু হৃদয়কে ভাবনাগুলি নাড়া দিয়ে যায়। বলতে পারে না। এতে সমাজে অপাংতেয় হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। অবুঝ স্ত্রী-পুত্র, বন্ধু-বান্ধবের কাছে মর্যাদা হারাবার ভয় আছে। আবার নিরাপত্তাহীনতায় পরারও সম্ভাবনা আছে। সমাজের সূক্ষ বুদ্ধিসম্পন্ন ক্ষমতাবান মিষ্টভাষীরা জীবনের স্বাদকে বিস্বাদে পরিণত করে দিতে পারে বেফাঁস একটি শব্দ উচ্চারনের অপরাধে।

মনে হয় অন্যায়গুলি অনেক বেশী হয়ে যাচ্ছে। মানুষ এখন আর সহ্য করতে চাইছে না। নিজ থেকে যাদের করার দায়িত্ব বিশ্বাসে ঘা দিয়ে তারা তার সুযোগ নিয়েছে। কোটি মানুষের জীবন আর জীবনের কষ্টের বিনিময়ে গুটিকয়েক মানুষ

সুখ-স্বাচছন্দ, নিজ স্ত্রীর মুখের হাসি, নিজ সন্তানের সুখ আর নিজেদের মধ্যে মর্যাদা মর্যাদা খেলার লড়াইয়ে লিপ্ত।

ভিক্ষা দিয়ে নয়। স্রষ্টা প্রদত্ত অফুরন্ত ভান্ডার থেকে সকলের ন্যূনতম প্রাপ্য সঠিক বন্টন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে মানুষ স্রষ্টার প্রতি দায়িত্ব পালন করতে পারে। এটি বড় ইবাদাত। রোজা সে শিক্ষা দেয়। রোজা সে শিক্ষার দ্রুত বাস্তবায়নে মানবের উপলব্ধিবোধে নাড়া দিয়ে যায় বছর বছর। যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত, তারা সে কাজ সঠিকভাবে করবেন বা করছেন, সেক্ষেত্রে সচেতনতা সৃষ্টি করা ও সহযোগীতা করাও নাগরিকের দায়িত্ব। বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনায় রোজাদারগন সরব হবেন রোজার শিক্ষার মধ্যে এসবও অন্তর্ভূক্ত। সঠিক কাজ কারার মধ্য দিয়েই আল্লাহর সান্নিধ্য ও স্বর্গ অর্জন করতে হবে।

কারও খাবার পাতে খাবার তুলে দিয়ে কোন ব্যাক্তি আপাতত যে সহযোগীতা করছেন সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে সেটি অব্যাহত থাকতে পারে, তবে সেটি চিরস্থায়ী কোন বন্দবস্ত হতে পারে না। এমন কাজকে উৎসাহ দেয়া যায় না।

কেবল নিজের মুনাফা নয়। জীবন দর্শনে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। প্রয়োজন প্রতিটি কোষে প্রবাহিত রস পৌঁছে দেয়া। যে রসের মালিক আমরা নই, স্বয়ং বিধাতা। নিয়ম বহির্ভূত জোর-জবরদস্তীর দখলদারিত্ব বন্ধ করতে হবে। সামগ্রীক মংগলের স্বার্থে।

ইসলামের জীবন ঘনিষ্ট ও প্রয়োজনীয় বিষয়সমুহের শিক্ষা নিয়ে বেশী বেশী আলোচনা প্রয়োজন। সমাজ থেকে অন্যায় ও বৈষম্য দূরীকরণে যা ভূমিকা রাখতে পারে। অন্যথায় ক্ষুধার্তের ক্ষুধার জ্বালা বুঝবার প্রয়োজনটা কি? রোজা সে কথাও বলে।

বর্তমানে আলোচনা বেশী হচেছ- কত সহজে কাকে ধরে বেহেস্ত পাওয়া যাবে, কিংবা দোজখের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে; কটা নেকী হল আর কটা পাপ হল- অতপর সরল অংকের মত কাটাকুটি করে কোন দিকে পাল্লা ভারী হল .. .., কে আস্তিক, কে নাস্তিক, কে মুরতাদ এসব নিয়ে জীবনের মূল্যবান সময় নষ্ট করা, মিলাদ পড়া জায়েজ কি জায়েজ না, দাড়িয়ে মিলাদ পড়লে হবে কি হবে না, রোজা রেখে পেষ্ট ব্যবহার করা যাবে কি যাবে না, ফটো তোলা হারাম না হালাল, ইহুদি-নাছারাদের কি কি দোষ ইত্যাদি সব বিষয়ে।

ইমাম কিংবা ধর্মীয় আলোচকরা জোর দিয়ে বলেন না যে, ওখানে মানুষটির খাবার নেই কেন? পারমানবিক বোমা তৈরীর প্রয়োজনীয়তা কি? পৃথিবীময় অস্ত্র কারখানাগুলি বন্ধ হচেছ না কেন? মাদক-বিরোধী কার্যক্রম মূল জায়গায় না চালিয়ে কেন নিরীহদের হেনস্তা করা হচ্ছে? ধর্ষনের মত সামাজিক ব্যাধির বিষয়ে তাদের কোন বক্তব্য নেই। মসজিদে সমসাময়িক সামাজিক সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা হয় না। যেখানে একে অন্যের সম্পদ অবৈধভাবে দখল নিয়ে নিচ্ছে, এসব কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে তারা তেমনটি সোচ্চার নন!

"এবং তুমি দেখবে তাদের অনেকেই (যারা অন্যায় করে) পাপ ও সীমালংঘনে এবং অন্যায়ভাবে অর্জিত কোন কিছু ভক্ষণে একে অন্যের সাথে প্রতিযোগীতা করছে। অবশ্যই তারা যা করে তা অত্যান্ত মন্দ। ধর্মযাজক এবং পন্ডিত ব্যাক্তিগন কেন তাদেরকে মন্দ কথা বলতে এবং অন্যায়ভাবে অর্জিত কোন কিছু ভক্ষণ করতে নিষেধ করে না? তারা যা করে সেটিও মন্দ।" (আল কুরআন ৫:৬২-৬৩)

রোজা স্রষ্টার নির্দেশকে সত্য ও সঠিকভাবে বোঝার, উপস্থাপনার ও সঠিক আচরণে সঠিক কাজটি করার মানসিক শক্তি অর্জনের হাতিয়ার হয়ে কাজ করুক। আমীন। (লেখা ২০১৩)

স্যাকরিফাইস

(Sacrifice)

পাশের বাড়ীর রাস্তাটির সামনে রক্ত। কেবল রক্ত বললে বিষয়টি ভালভাবে বোঝানো গেলো না বলে মনে হচেছ। বলা যায় রক্তে ভেসে গেছে। বড় বড় তিনটি গরু কুরবানি হয়েছে। এক একটির মূল্য লাখের কাছাকাছি। মাথাপিছু আয়ের দর্শনের হিসেবে হয়তো এতগুলি অর্থ সঠিক হাতে গিয়ে পৌঁছুতে পারেনি। মাঝ পথে আটকে গেছে।

শুনেছি প্রিয় কিছু কুরবানী দিতে হয়। গরুগুলির প্রতি মালিকের কোন দরদ নেই। তৈরীও হয়নি। রাতে ক্রয়, সকালে কুরবানি। সম্পর্কহীন কারও প্রাণ নির্দ্বিধায় নিয়ে নেয়া যায়। ভেতরে কম্পনটুকুও অনুভূত হয় না। এটিও একটি শিক্ষা।



তবে কি এখানে, প্রিয় কিছু কুরবানী হয়নি? নিশ্চয়ই হয়েছে! যিনি কোরবানি দিয়েছেন তিনি অজান্তে হলেও প্রিয় কিছু কুরবানি দিয়েছেন। অর্থের কুরবানি হয়েছে। অর্থ মানুষের কাছে অনেক প্রিয়।

নিম্ন মধ্যবিত্ত যখন কুরবানী দেয়, সে সত্যিকার অর্থেই তার কষ্টে অর্জিত ও সঞ্চিত অর্থ কুরবানী দেয়। কিন্তু যার অঢেল আছে? যখন প্রতিযোগীতা দেখা দেয় তখন কুরবানীর উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। বলা হচ্ছে,

"... সম্পদ ও মিথ্যে মর্যাদার বাসনা দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে, তারা (অসুর ব্যাক্তিগণ) ... কেবলমাত্র নামের জন্য কখনও কখনও উৎসর্গীকরণ, কোরবানী বা যজ্ঞ অনুষ্ঠান পালন করে।" (গীতা ১৬:১৭)

আবার অনেকে কুরবানী দেয় কিন্তু কেন দেয় জানে না। স্রষ্টা চান তাঁর সৃষ্টি তাকে এতটাই ভালবাসবে যেন তাঁর কারনে সবচেয়ে প্রিয় বস্তুটি কুরবানি দিতেও দ্বিধাবোধ করবে না। যৌক্তিকভাবে সেটি হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এমন কি আল্লাহর কারনে শেষ পর্যায়ে বান্দার নিজের জীবনটিও! অর্থাৎ তাঁর সৃষ্টি এতটুকু বুঝতে

শিখেছে যে, যে তার স্রষ্টা- তার কাছে তাঁর ওপরে আর কেউই প্রিয় হতে পারে না। স্রষ্টা সৃষ্টি করেছেন বলেই সৃষ্টি অপরাপর অনেক কিছুকে ভালবাসতে শিখেছে। সেটি মায়া। মিছে মরিচীকাকে ছিন্ন করতে শিখতে হবে। স্রষ্টা ভিন্ন সৃষ্টির সকল ভালবাসা ব্যার্থ। স্রষ্টাকে তাই নির্দ্বিধায়, নিঃসংকোচে, বিনা প্রশ্নে সর্বোচ্চ ভালবাসা প্রদর্শন করতে হবে। তথাপি প্রতিনিয়তই নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে ফেলতে হবে না। প্রস্তুতি থাকতে হবে। কুরবানী হচ্ছে সে মানসিক প্রস্তুতিরও একটি মহড়া।

যে এভাবে ভাবতে শিখেছে স্রষ্টা তাকে ভালবাসেন। স্রষ্টার মধ্যে ভালবাসা প্রাপ্তির এ প্রত্যাশাজনিত গুণটির উপস্থিতির কারনে প্রতিটি মানুষের মধ্যেও রয়েছে এমন প্রবণতা। মানুষের ভেতরে এমন বৈশিষ্টের বিদ্যমানতার জন্য মানুষের নিজের কোন হাত নেই।

কুরবানীর আছে নানান রকমভেদ। লিখনের বাড়ীর উঠোনে কোন রক্ত নেই। সেখানে কোন প্রাণী কুরবানি হয়নি। পাশের বাড়ীর দিকে তাকিয়ে তার কোন দুঃখবোধও নেই। যতকিঞ্চিৎ দুঃখবোধ তার স্ত্রী ও সন্তানদের মুখের দিকে তাকিয়ে। কেননা তাদের কাছে কুরবানীর উদ্দেশ্য বড় নয়। তবে সে দুঃখবোধও লিখন জয় করেছে নিজ উপলব্ধিবোধ দিয়ে।

সামাজিক কারনে লিখন কুরবানি দেয় না। সামাজিক প্রতিযোগীতাবোধ তার ভেতরে কাজ করে না। কুরবানির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই মুখ্য।

ক্রুটিযুক্ত সমাজে সামষ্ঠিকভাবে সকল উপাসনা ব্যার্থ। কেননা সকল ক্রুটির জন্য মানুষ নিজেই দায়ী। কোন ক্রুটির জন্য যে বা যারা দায়ী তাদের উপাসনা স্রষ্টার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়- অন্তত চরম উৎকর্ষতার ভাবনার দিক থেকে।

যে সমাজে ছোট্ট শিশুটি ডাষ্টবিনে কাকের সাথে খাবার সংগ্রহের প্রতিযোগীতা করে, সে সমাজ ক্রুটিযুক্ত। বিশ্ব সমাজের কথা বলছি। সামাজিক সিস্টেমের কথা বলছি।

ক্রুটিপুর্ণ সামাজিক সিস্টেমের কারনে কেউ তিনটি গরু কুরবানি দিতে পারছে, কেউ নিজের আহারটুকুও সংগ্রহ করতে পারছে না। অথচ এমনতর উপার্জনে যতটা না যোগ্যতা আছে, তার চেয়ে অধিক আছে ছল ও চতুরতা।

নিয়মের ছল চতুরতার নানান অনিয়মে উপার্জিত অর্থ, মানুষকে মহিমান্বিত করে না। অথচ সামাজিক মর্যাদার নামে মানুষ সেটিই হতে চায়। চায় শ্রদ্ধার পাত্র

হতে। চায় স্মরণীয়-বরণীয় হয়ে থাকতে। অথচ মানুষকে কোনভাবেই মানুষ মনে রাখতে পারে না। মনে রাখে কেবলি তার নামের অক্ষরগুলি, কিংবা তার কীর্তি বা বইয়ের পাতায় কিংবা ভিডিওতে ধারণ করা ছবি। যার ভেতরে প্রাণ নেই। ভেতরের আসল মানুষটিকে কেউ জানেনা।

সবার ভেতরে হতে পারে সে এক। আমি যখন বঞ্চিত করি তখন আমি নিজেকেই বঞ্চিত করি- সময় ও প্রজন্মের প্রেক্ষিতে। আমি যখন দান করি- তখন আমি নিজেই পাই, সেই একই নিয়মে। অন্তর্নিহিতে কাজ করে এক গোপন বিচার ব্যবস্থা। এতটুকু ত্রুটি নেই সেখানে। তাতে যা হয় তা হল ভারসাম্য রক্ষা পায়। ভারসাম্য রক্ষিত হলে সঠিকরূপে দায়িত্ব পালিত হয়। ভারসাম্য রক্ষার জন্য দেহের ভেতরের প্রতিটি কোষে রস পৌঁছে দিতে হবে। সামগ্রীক মংগলের জন্য। তখন সে কীর্তি হবে অর্থপূর্ণ। যাদের হাতে বৈশ্বিক ব্যবস্থাপনা এগুলি তাদের কাজ।

নিজ জ্ঞানে নিজের হৃদয়ে দহন। নিজ জ্ঞানে আবার নিজেরই তৃপ্তি। অনুভূতিটুকু প্রকাশ করতে পারাতেও তাই প্রশান্তি অনেক।

কুরবানীর আছে নানান রকমভেদ। সে হিসেবে কুরবানি লিখনও একটি দিয়েছে। রাস্তায় রক্ত ঝরেনি। হৃদয়ে কিঞ্চিৎ রক্তক্ষরণ হয়েছে। স্রষ্টাকে স্মরণ করে দিয়েছে। বুঝে দিয়েছে। তাঁর দেয়া প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দিয়েছে।

যে চিন্তাটি মস্তিস্কে প্রতিনিয়ত ঘুরপাক খায়, সেটি লিখনের নিজের নয়। লিখন নিজেও তার নিজের নয়। নিজেকে নিজে সৃষ্টি করেনি। প্রসেসর যেটি মস্তিস্কে কাজ করে চলেছে সেটিও তার নিজের নয়। জগতের নানান রূপ দর্শনে যে প্রতিক্রিয়া সে প্রদর্শন করে তাতে অজান্তেই কর্মে জড়িয়ে যায়। এতটুকু বুঝতে পারার কারনে কর্ম ও কর্মের ফল তার নিজের, এভাবে ভাবতে পারে না লিখন।

মানুষ তবুও তার বৈশিষ্টের বাইরে যেতে পারে না। ভাবনার যিনি মালিক, তিনি যখন বলেন সকলের মাঝে ভাবনা ছড়িয়ে দিতে। অন্তর বিনিময় প্রত্যাশা করে। মনে হয় ভাবনাটি নিজের। ঐ যে বলেছি মানুষের বৈশিষ্ট!

পৃথিবী যার, নিজেই যার, চিন্তা যার, ভাবনা যার সে নিজেই যখন ভাবনাটিকে ছড়িয়ে দিতে অনুপ্রাণীত করে- তখনও হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়। অতপর নির্দেশনাটি যখন পালিত হয়- তখন সেটিও ‘স্যাকরিফাইস’। প্রিয় কিছু বিসর্জন!

স্যাকরিফাইস

কুরবানি লিখনও একটি দিয়েছে। অতি নগন্য। ছোট্ট একটি লেখা। বিনিময় মূল্য নেই। কেননা ভাবনাগুলি সেই- 'একজনার'।

"... বস্তুগত উৎসর্গীকরণ অপেক্ষা জ্ঞান উৎসর্গীকরণ মহত্তর ...।" (গীতা ৪:৩৩) (লেখা ২০১৩)

কুরবানি

(Qurbani or Sacrifice)

আমি তোমার জন্য করেছি। তাই তুমি আজ ভাল আছ। আজ তুমি সব অস্বীকার কর। জনসমক্ষে সত্য প্রকাশ কর না, কিংবা প্রকাশ করতে দ্বিধা কর। গোপনেও অস্বীকার কর। কেবল সুবিধাজনক সময় এলে বলো, 'স্বীকার করি'। গোপনে। চাতুর্য্যতায় ভরা তোমার সুবিধাবাদী আচরণ!

তোমার কি দায়িত্ব নেই আমার জন্য করার? অন্তত বিপদের দিনে? আমার যে বিপদ তুমি নিজেই ডেকে এনেছ।

একদিন তোমার জন্য যে নিঃস্বার্থভাবে করেছে, সহজ-সরলভাবে করেছে, আন্তরিকতা নিয়ে করেছে- চাতুর্য্যতায় ভরা তোমার আজকের অকৃতজ্ঞ আচরণে চিত্ত তার অশান্ত। অতৃপ্ত। বিভ্রান্ত। জীবনের স্বতঃস্ফুর্ততা - জীবনের উচ্ছাস - জীবনের স্বপ্নগুলো তার হারিয়ে গেছে। জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আজ সে ক্লান্ত। অপারগ। থমকে দাড়িয়েছে তার জীবন। সব তোমারি কারন।

তবে শিখেছে। ভেতরে পরিবর্তন এসেছে। আজ তাকে অন্যের দ্বারে চাইতে হয়। তোমার দেয়া প্রতিদান। তুমি এগিয়ে আসনি। অথচ তারই কারনে ভাল আছ।

সততার সাথে সহজ-সরলভাবে যে সহযোগীতা করে, তার জন্য করার প্রয়োজনীয়তা আছে। কেবল গোপনে মুখে স্বীকার করলে হয় না। কর্মে তার ছাঁপ থাকতে হয়। তবেই আত্মা তুষ্ট হয়। কৃতজ্ঞতাবোধ সবাইকে তুষ্ট করে। বিপদ চিরদিনের জন্য চলে যায় না। ঘুরে ঘুরে আসে। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে। বিধাতার পরীক্ষা সব।

নিজের সুবিধাটুকু নিয়ে দুরে সরে গিয়ে লাভবান হওয়া যায়। কি লাভ তাতে? কতটুকুই বা লাভ? ক'দিনের জন্য? এ লাভ চিরস্থায়ী নয়। কিন্তু আচরণটি চিরস্থায়ী। এর ফল কোন একদিন ভোগ করতে হতে পারে।

যে ঠকে, বস্তুত তার কোন ক্ষতি নেই। কেননা যেদিন কোন কারনে সে ঠকেছে, তার আগের মুহুর্তেও তার কোন প্রাপ্তি ছিল না। সেই না থাকাতেও তার জীবন চলেছে। আবার যেদিন কারও আচরণের কারনে ঠকেছে, তার পরের মুহুর্ত থেকে হিসেব করলে সে আর কতদিনই বা লাভবান হত? মৃত্যুর পর লাভের স্বাদ

ফুরিয়ে যাবে। বছরের হিসেবে হয়তো এক'শ বছরও নয়। কোন রকম এক'শ বছর ঠকে জীবন পার করে দিতে পারলে, কোন দুশ্চিন্তা নেই।

যে ঠকেছে অকৃতজ্ঞতায় ভরা কোন মন্দ আচরণে কাউকে ঠকিয়ে সেও লাভবান হতে পারতো। কিন্তু যদি পরবর্তিতে বিচারের সম্ভাবনা থাকে, আর সেটা যদি চিরস্থায়ী হয়, তবে ঠকিয়ে লাভের কারনে হয়তো নিজেকেই ঠকে যেতে হতে পারে। কোন কোন বোকা এভাবেও ভাবে। তবে জাগতিক বুদ্ধিমানেরা নগদ লাভটাই পছন্দ করে। বিশ্বাসী আর অবিশ্বাসীর আচরণে এখানেই পার্থক্য।

অকৃতজ্ঞতা একটি বড় অন্যায় আচরণ। যার সাথে করা হয়েছে তার হৃদয় ভিন্ন এ অন্যায় আচরণের ভয়াবহতা বা সম্ভাব্য পরিণাম কেউ উপলব্ধি করতে পারবে না। আর যে এমনতর অন্যায় আচরণ করে লাভবান হয়েছে সে তো বুঝবেই না।

অন্যায় আচরণের প্রতিকার দু'রকম হতে পারে। এক: অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে যথাযথ বা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া। দুই: প্রকৃতি বা সৃষ্টিকর্তার বিবেচনায় ছেড়ে দেয়া। এক এক মানুষের এক এক রকম পছন্দ। আবার একই মানুষের এক এক সময়ে ও ক্ষেত্রে এক এক রকম পছন্দ।

নিজ প্রয়োজনে উপকার গ্রহণ করে নিলে, যে উপকার করে তার জন্যও নিজ থেকে করা দায়িত্ব ও কর্তব্য। কেবল মুখে নয়। কর্মে তার প্রতিফলন থাকতে হয়। কর্মের মাধ্যমে সে যা ব্যায় করবে সেটিই কুরবানী। হতে পারে সময়, অর্থ কিংবা প্রিয় কোন কিছু।

"তোমরা কখনই বিশ্বস্ততা অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা তা ব্যায় কর যা তোমরা ভালবাস।" (আল-কোরআন ৩:৯২)

এ চেতনা মানুষের মধ্যে জাগরিত করার জন্যই 'কুরবানী'। জগতেও এ আচরণ শান্তি প্রতিষ্ঠা করে। নইলে অকৃতজ্ঞ আচরণের ফলাফলস্বরূপ ধ্বংস অনিবার্য। পরিণাম ভয়ংকর! কখনও দীর্ঘমেয়াদী, বুঝতেও পারা যায় না। অকৃতজ্ঞ আচরণ মানুষের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ ও প্রতিশোধপরায়ণতার আগুন ছড়িয়ে দেয়।

ব্যাক্তি মানুষের উদাহরণ তুলে ধরে বিষয়টিকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি। তাই ওপরের আলোচনাটুকু। কারও ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতার সাথে মিলে যেতে পারে, তবে লেখকের সেটি জানা নেই।

যিনি সৃষ্টি করেছেন, লালন-পালন করে চলেছেন তাঁর জন্যও তেমনি কিছু ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। কিন্তু আমরা জানি না কে সৃষ্টি করেছেন। জানি না পেছন থেকে কে লালন-পালন করে চলেছেন। তাই প্রতীকী 'কুরবানী'র বিধান।

কুরবানীর অনেক ধরণ হতে পারে। এবাদতের মাধ্যমে আমরা ‘সময়’ কুরবানি দেই ‘তাঁর জন্য’ যিনি প্রাণের স্রষ্টা- এ জীবন যার। কৃতজ্ঞতার প্রকাশ এটি। বিধাতার আদেশ পালনের মধ্য দিয়ে আমরা নিজেদের ‘অহম’ কুরবানি দেই। আরও অনেক রকম কুরবানি হতে পারে।

সৃষ্টিকর্তার প্রতি নিজেদের উৎপাদিত ফসল উৎসর্গ করেছে হাবিল ও কাবিল। যিনি মানবের জন্য অফুরন্ত দান করেছেন এটি তার প্রতি কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ। এ প্রকাশ থাকতে হয়। প্রদর্শিতও হতে হয়। এর প্রদর্শন অপরাপরদেরকেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের শিক্ষা দেয়, অনুপ্রাণীত করে। তবে শিক্ষা বা দর্শনটি যথার্থ হতে হবে।

গীতায় বিভিন্ন প্রকারের উৎসর্গীকরণের কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে উৎসর্গীকরণ ভিন্ন মানুষ এ পৃথিবীতে এবং এ জীবনে সূখী হতে পারে না। ওপরে কাল্পনিক উদাহরণ তুলে ধরে তেমন ক্ষেত্রে ব্যক্তি মানুষের মনের অবস্থা বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। নিজেকে বোঝার মধ্য দিয়ে স্রষ্টাকে বুঝতে হয়। স্রষ্টার নানান গুণের মাঝে তাঁর রুদ্র রোষও একটি গুণ। তিনি কখন ক্ষমা করবেন এবং কখন ও কেন প্রতিশোধ নেবেন বা শস্তি প্রদান করবেন কেউ জানতে বা বুঝতেও পারে না।

মানবের কাজ হচ্ছে পার্থিব জীবনে তার নানাবিধ দায়িত্ব পালন করা। কিন্তু এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়েই তার নানাবিধ ফলাফল প্রাপ্তি ঘটে। যা তাকে পার্থিব বন্ধনে আবদ্ধ করে ফেলে। সকল কর্ম ও তার প্রাপ্ত ফলাফল পালনকর্তার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা না হলে বা করতে না জানলে, সেটি তাকে মরিচীকার বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারে না। কিন্তু সে গুণ অর্জন করা সহজ কাজ নয়। উৎসর্গীকরণ, যজ্ঞ অনুষ্ঠান, কুরবানি বা স্যাকরিফাইস- মানুষকে বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয় ও ধীরে ধীরে সে পথে চলতে শিক্ষা দেয়। যদিও সকলেই মূল শিক্ষাটি অর্জন করতে পারেনা। কুরবানি হচ্ছে সকলের বা অধিক সংখ্যক মানুষের জন্য সে শিক্ষা, পথ বা সে লক্ষ্য অর্জনের লক্ষ্যে একটি নিয়মমাত্র। কিন্তু এ নিয়ম পালন ভিন্নও তা অর্জন সম্ভব। কিন্তু সেটি সবার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই এ নিয়ম।

গীতায় বলা হয়েছে যে, উৎসর্গীকরণ মানবের প্রয়োজনীয় সকল কিছু প্রাপ্তিকে সম্ভব করে তোলে। এটি ‘গিভ এন্ড টেক’ এর মত। যিনি প্রদান করেন তাকে উৎসর্গ করা হলে তিনি তুষ্ট হয়ে আরও দেন। কিন্তু যে তা করে না, বস্তুত সে চুরি করে নেয়। বিনিময়ে সে কিছুই দেয় না (দ্রষ্টব্য গীতা ৩:১২)।

যারা খাদ্য গ্রহণ করে অথচ তার দাতাকে তা উৎসর্গ করে না, সে যেন তা চুরি করে। তারা পাপ অর্জন করে। অর্থাৎ অন্যায় করে। এ অন্যায় অকৃতজ্ঞতা থেকে শুরু।

মানুষ যা উৎসর্গ করে বিধাতা তার কিছুই পান না। কিন্তু তিনি মানুষের কর্ম, আচরণ তথা মানসিকতাকে বুঝে নেন। উপরন্তু তাঁর প্রতি এ উৎসর্গের কারনে দুঃস্থরা যখন পায়- বস্তুত তিনিই পান! আল্লাহ বলেন,

"এসবের (উৎসর্গীকৃত) মাংশ ও রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছে না, কিন্তু পৌঁছে তোমাদের অন্তরের ভালবাসা (কৃতজ্ঞতাবোধ)।" (আল-কোরআন ২২:৩৭)

গীতায় যৌক্তিকতা তুলে ধরে এভাবে বলা হয়েছে যে, সকল জীবকেই বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। যা আসে বৃষ্টি বর্ষনের মাধ্যমে বা পানি থেকে। যা আবার আসে এই উৎসর্গীকরণের প্রতিদানস্বরূপ। অর্থাৎ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কারনে। তাই এটি একটি দায়িত্ব পালন। যে দায়িত্ব মানবের জন্য বিধাতা কর্তৃক নির্ধারিত। যারা নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করে না, তারা অন্যায় করে। অর্থাৎ পাপ অর্জন করে। তারা দায়িত্বের কথা ভূলে গিয়ে কেবলি জাগতিক ভোগে মত্ত হয়ে যায়। বস্তুত তাদের জীবন দায়িত্ব-জ্ঞানহীনদের মত- অর্থহীন, লক্ষ্যবিহীন। তাদের বেঁচে থাকা না থাকা কোন অর্থ বহণ করে না।

".. যে ব্যাক্তি ... বিধাতা প্রবর্তিত উৎসর্গীকরণ, কুরবানী বা যজ্ঞ অনুষ্ঠানের এ পথ অনুসরণ করে না, নিশ্চিতভাবেই সে পাপের পথ অনুসরণ করে; কেননা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির জন্য উৎফুল্ল হয়ে বেঁচে থাকা কোন মানুষের জন্য বৃথা জীবনধারণ।" (গীতা ৩:১৬)

"যদি মানুষ সঠিক পথে চলতো অর্থাৎ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতো, তবে আমি তাদের অফুরন্ত পানি বর্ষনে সিক্ত করতাম।" (আল-কোরআন ৭২:১৬)

উৎসর্গীকরণ হতে হয় দায়িত্ববোধ থেকে। কোনরূপ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় নয়। তখন সে উৎসর্গ হয় ভাল মানসিকতা থেকে। কিন্তু যখন তা কোন প্রাপ্তির প্রত্যাশায় বা অহমবোধ থেকে করা হয়, সেটি হয় মনোবেদনা বা যাতনা থেকে সৃষ্ট হয়ে। আর যে উৎসর্গের পেছনে কোন দর্শন নেই- নেই কোন বিশ্বাস, তা করা হয় মূর্খতাজনিত কারনে (দ্রষ্টব্য গীতা ১৭:১১-১৩)।

গীতায় একটি ধারাবাহিক যৌক্তিকতার মধ্য দিয়ে উৎসর্গীকরণ বিষয়টিকে তুলে ধরা হয়েছে। বিশ্বাস করি কিংবা না করি পড়তেও ভাল লাগে। ওপরে এতগুলি

কথা বলা হল অর্থাৎ গীতার উদাহরণ তুলে ধরা হল, নিচের দর্শনের সাথে তার তুলনামূলক একটি পার্থক্য নিরূপনের জন্য।

একটি জীবন্ত পশুকে জবেহ করে দিয়ে কিভাবে মানবের ভেতরের পশুত্বকে কুরবানি দেয়া সম্ভব? এ কেমন দর্শন বা যৌক্তিকতা? সামাজিক-মানসিক চাপের কারনে, যথাযথ উত্তর খুঁজে না পেয়ে, প্রচলিত একটি সামাজিক রিতিকে যৌক্তিকতা দান করার জন্য মানুষ এমন যুক্তি দাড় করিয়েছে। যা কিনা সম্পূর্নরূপেই মনগড়া। পেছনে কোন যথার্থ দর্শনের উপস্থিতি নেই, কিংবা মানুষ তুলে ধরতে পারছে না।

প্রকৃতপক্ষে মানুষ এমন এক প্রাণী, তাকে যা বোঝানো যায় বা তাকে দিয়ে যা বিশ্বাস করানো যায়, সেটি দিয়েই তাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়া সম্ভব। হতে পারে সেটি ভাল কিংবা মন্দ। মানুষ গ্রহণ করে নিলেই হলো। সাধারণ মানুষ সত্য-মিথ্যা, ভূল-শুদ্ধ বা কার্যকারণ নিয়ে ঘাটাঘাটি করে না। তারা মহা-মানবরূপী মানুষদের অনুসরণ-অনুকরণ করে।

একটি জীবন্ত পশুকে জবেহ করে দিয়ে তো ভেতরের পশুত্বকে আরও জাগিয়ে তোলাও সম্ভব হতে পারে। বিষয়টিকে তো সেভাবেও ভেবে নেয়া যেতে পারে! সেভাবেও প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে!

সাধারণ মানুষ সত্যের সন্ধান করে না। তারা গড্ডালিকায় গা ভাসিয়ে দেয়। বুদ্ধিমানেরা তার সুযোগ নেয় এবং মনগড়া যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করে। তবে কখনও কখনও সমাজকে সঠিকভাবে চালনা করার জন্যও করে, তবে সত্যকে না জেনে-বুঝে।

আমরা অন্যকিছু ভাববো না। সত্যেরও সন্ধান করবো না। কেননা এটি আমাদের পূর্ব-গৃহীত সিদ্ধান্ত। আমরা এটিকেই সঠিক প্রমাণ করে ছাড়বো। যেন যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা। অর্থাৎ অন্য কিছুই আর আমাদেরকে দিয়ে বিশ্বাস করানো যাবে না। আমরা অন্য কিছু শুনতেও চাই না।

উৎসর্গীকরণ, কুরবানি, যজ্ঞ বা স্যাকরিফাইস আদিকাল থেকেই চলে আসছে। তা না হলে গীতায় তার উল্লেখ থাকতো না। ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের পূর্বেও এ বিধান ছিল। অতএব এটি কেবল মুসলিমদেরই করণীয় বা পালনীয় বিষয় না। তবে রিতি-নীতিতে পার্থক্য আছে। কিন্তু মূল দর্শন এক। সকল উৎসর্গীকরণ হতে



হবে বিধাতার নামে। এমন কি প্রথম মানবের সন্তান হাবিল-কাবিলও বিধাতার নামে তাদের বিষয়াদি উৎসর্গ করতো। গীতায় বলা হয়েছে,

"আমিই হচ্ছি সকল যজ্ঞ, উৎসর্গ বা কুরবানীর একমাত্র লক্ষ্য ...।" (গীতা ৯:২৪)

মুসলিমদের পালনকৃত কুরবানীর পেছনের দর্শনটি আবার ইব্রাহীম (আঃ) এর একটি স্মরণীয় ঘটনার সাথে সম্পর্কিত বলেও বলা হয়ে থাকে। সে ঘটনাটিকে স্মরণ করার জন্যই নাকি আমরা এটি করে থাকি। বিষয়টিকে এভাবেও প্রচার করা হয়ে থাকে। একটু আলোচনা করি।

বাইবেলে বলা হয়েছে, আব্রাহাম ছিলেন নিঃসন্তান। তার স্ত্রী সারাহ্ ছিলেন বন্ধ্যা। স্ত্রীর পরামর্শে আব্রাহাম মিশরীয় পরিচারিকা হাগার বা হাজেরাকে বিবাহ করেন- সন্তান গ্রহণের জন্য। হাজেরার গর্ভের সন্তান 'ইসমাইল'।

সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদে, ইসমাইলের জন্মের কিছুদিন পর প্রথম স্ত্রী সারাহর গর্ভেও সন্তান আসে। তখন তাঁর বয়স নব্বই! আব্রাহামের বয়স এক শ বছর। সন্তানের নাম 'ইসহাক' বা আইজ্যাক। শুরু হয় দ্বন্দ্ব। সংসারে অশান্তি। সারাহ হাজেরাকে কোনভাবেই মেনে নিতে পারছিল না। সে তার নিজ সন্তানের সাথে হাজেরার সন্তানের উত্তরাধিকারে অংশীদার হওয়ার বিষয়টিকে কোনভাবেই মেনে নিতে পারেনি। দ্বন্দ্ব চরম পর্যায়ে উপনীত হয়। হাজেরাকে নিয়ে আব্রাহামকে বীরসেবা চলে যেতে হয়। তারা সেখানে বসবাস করতে থাকে। সারাহর মৃত্যুর পর তাকে কবরস্ত করতে আব্রাহাম কানানে ফিরে আসে।

বাইবেলে এটিও উল্লেখ আছে যে, আব্রাহাম আইজ্যাককে তার সকল সম্পদ দান করে। অন্যদেরকে উপহারস্বরূপ সামান্য কিছু প্রদান করে। কোরআনে ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে,

"ইব্রাহীম অবশ্যই ধৈর্যশীল, কোমল হৃদয় ও সতত আল্লাহমুখীন ছিলেন।" (আল-কোরআন ১১:৭৫)

সারাহ ও হাজেরার দ্বন্দ্ব কোমল হৃদয়সম্পন্ন আব্রাহামকে মানসিকভাবে বিচলিত করে। বিচলিত হৃদয়ের ফলশ্রুতি তার স্বপ্ন দর্শন হওয়া খুবই স্বাভাবিক। স্বপ্ন

দর্শনকে তৎকালীন সময়ে বিধাতার নির্দেশ বা দিক নির্দেশনা বলে মনে করা হতো। জ্ঞান-বিজ্ঞান তখন আজকের মতো ছিল না। আব্রাহামের বিচলিত অন্তর যে কারনে দ্বন্দ্ব, সে কারনকেই নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়। সন্তানকে কুরবানী দিতে উদ্যত হয়। সমস্যার আপাত সমাধান বা সমাপ্তি। দ্বন্দ্বের শেষ। তবে এমনটি নাও ঘটতে পারতো। আব্রাহাম শক্ত হস্তে এ দ্বন্দ্ব মোকাবেলা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন কোমল হৃদয় সম্পন্ন মানুষ। এ কারনেই তার হৃদয়ের কোমলতার বিষয়টিকে এত গুরুত্ব দিয়ে কোরআনেও তুলে ধরা হয়েছে।

আরও বিতর্ক আছে। মুসলিমরা প্রচার করে সন্তানের নাম ইসমাইল, যাকে কুরবানী বা উৎসর্গ করতে আব্রাহাম উদ্যত হয়েছিল। যদিও কোরআনে সন্তানের নাম উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু বাইবেলে স্পষ্টতই ইসহাকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

পিতার জীবনের ছোট একটি ঘটনার ফলাফল সন্তানের জীবনে অনেক বড় বিষয়। তারা আমাদের এত পূর্বের পুরুষ যে, তাদের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনার রেশ আজও আমাদের মাঝে রয়ে গেছে। বড় আকারেই রয়ে গেছে। বলা হয়, এ উৎসর্গীকরণের মধ্য দিয়ে আমরা সে ঘটনাকে স্মরণ করি। এ ঘটনাকে স্মরণ করার জন্য জগতব্যাপি এত বড় কুরবানী আয়োজনের প্রয়োজন কি? এখান থেকে আমরা কি শিক্ষা পাই বা নেই? একটি শিক্ষা নিলে তবুও এর গুরুত্ব ছিল বলে মনে করা যেত। অর্থাৎ এমন শিক্ষা যে, সম্পদ বা পার্থিব কোন কিছু প্রাপ্তির লালসায় নিজেদের জীবনের বর্তমান সুখ বিসর্জন দেয়া উচিত নয়, যা সারাহ ও হাজেরার কারনে আব্রাহামের জীবনে ঘটেছে। কিন্তু আমরা তো সে কারনে এটি করি না! ফলে এ কুরবানী করার পেছনে মুসলিমদের আদৌ ভাল কোন দর্শন নেই!

আরেকটি দর্শন আছে। কোরআনে যার সরাসরি উল্লেখ নেই, তবে অন্তর্নিহিতে আছে। সেটিকে গ্রহণ করে নিলেও অন্তত একটি যুতসই দর্শন প্রতিষ্ঠা পায়। কিন্তু আমরা তো সেভাবে ভাবি না! আমরা রূঢ় সত্যের চেয়ে মায়াবী আবেগ ভালবাসি। সূরা আল-বাকারার ৬৭ থেকে ৭১ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

"(স্মরণ কর) যখন মূসা স্বীয় সম্প্রদায়কে (ইসরাইল জাতিকে) বললো, আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গরু উৎসর্গ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তারা বললো, তুমি কি আমাদের সঙ্গে উপহাস করছো (কেননা গরু তাদের কাছে অত্যান্ত পবিত্র,

পূঁজনীয় ও দেবতাতূল্য ছিল। তারা তা করতে প্রস্তুত ছিল না।)? মূসা বললো, অজ্ঞদের অন্তর্ভূক্ত হওয়া থেকে আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি।

তারা বললো, তুমি তোমার পালনকর্তার কাছে আমাদের হয়ে প্রার্থনা কর, যেন সেটির রূপ বিশ্লেষন করা হয়। মূসা বললো তিনি বলেছেন, সেটি হবে এমন যা বৃদ্ধও নয়, অল্প বয়স্কও নয়- মধ্য বয়সী। অতএব যা আদিষ্ট হয়েছ তা পালন কর।

তারা বললো তোমার পালনকর্তার কাছে আমাদের হয়ে প্রার্থনা কর যে, তার রঙ কি হবে? মূসা বললো, তিনি বলেছেন যে, উজ্জল গাঢ় হলুদ বা সোনালী রঙের গাভী, যা দর্শকদের চমৎকৃত করে (কেননা এমন গরু তারা উপাসনার জন্য নির্বাচন করতো। অর্থাৎ যতই তারা গরু কুরবানী দিতে গড়িমসি করতে চাইছে, ততই তাদেরকে কঠিন শর্ত দেয়া হচ্ছে)।

তারা বললো, তুমি প্রভূর কাছে প্রার্থনা কর যে, সেটি কিরূপ? কেননা সকল গরু আমাদের কাছে সাদৃশ্যশীল (একইরকম) মনে হয়। আল্লাহ ইচ্ছে করলে নিশ্চয়ই এবার আমরা পথপ্রাপ্ত হব। মূসা বললো, তিনি বলেছেন যে, এ গাভী এমন হবে যা জমি চাষে ও পানি সেচের কাজে ব্যবহৃত হয়নি- সুস্থ্য, নিখুঁত।

তারা বললো, এবার তুমি যথার্থ বলেছ। অতঃপর তারা সেটিকে উৎসর্গ করলো, যদিও তারা সেটি করতে ইচ্ছুক ছিল না।" (আল-কোরআন ২:৬৭-৭১)

মিশর, ফিলিস্তিন ও আশে-পাশের দেশগুলিতে গরু উপাসনা করার প্রচলন ছিল। এটি তাদের কাছে ছিল অত্যান্ত পূঁজনীয়- দেবতাতূল্য। এক আল্লাহর উপাসনার পূর্বে ইসরাইলিরা সে ধারণা দ্বারা প্রভাবিত ছিল। তাদের অন্তরে সে নিয়মের প্রতি টান ছিল। ফলে ইসরাইলের সন্তানেরা যখন গরু উৎসর্গ করার জন্য আদিষ্ট হলো, তখন এটি তাদের জন্য ছিল এক কঠিন পরীক্ষা। তারা মূর্তীর আরাধনা পরিত্যাগ করে আল্লাহর ধারণা মন থেকে গ্রহণ করতে পেরেছে কিনা সেটি যাচাই করা ছিল এ আদেশের উদ্দেশ্য। কিন্তু তারা যখন গরু উৎসর্গ করতে নির্দেশিত হলো, তারা তা পরিপালনে গড়িমসি করতে লাগলো। এখানে সে বিষয়টি উঠে এসেছে।

এটি মূলত যে কোন প্রকার কু-সংস্কার তথা কোন জীব বা মূর্তীর আরাধনা মন থেকে দুর করার জন্য তাদের প্রতি একটি কঠিন পরীক্ষা ছিল। বস্তুত এটি মানবজাতিকে 'শিরক' এর দুষ্টচক্র থেকে মুক্ত হতে শিক্ষা দেয়। কিন্তু বর্তমানে সে

ধ্যান-ধারণা ও দর্শনও মুসলিমদের কুরবানীকরণের মধ্যে নেই। তাহলে বিশ্বব্যাপি এত ঘটা করে কেন কুরবানী করা হয়?

ধর্মে এখন ধর্মীয় চিন্তা বা বোধ নেই। দর্শন নিয়ে ভাবনা নেই। আছে বাণিজ্য। হিসাববিদরাই এখন দর্শন প্রতিষ্ঠা করে। অথবা প্রতিষ্ঠিত দর্শনকে তারা তাদের দর্শনে একীভূত করে ফেলে।

আসমানি গ্রন্থ ও কৃতজ্ঞতা

(Revealed Scripture and Gratitude)

আমি কৃতজ্ঞ তাঁর কাছে যিনি এ কিতাব নাজিল করেছেন। তাই আমি কিতাব পেয়েছি। কিতাব পেয়েছি বলেই পেয়েছি চলার পথের দিক নির্দেশনা।



আমি কৃতজ্ঞ তাঁর কাছে যিনি এ কিতাব রাসুল পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন। আমি কৃতজ্ঞ তাঁর কাছে যার কারনে এ কিতাব মানবজাতির কাছে পৌঁছেছে।

আমি কৃতজ্ঞ তাঁর কাছে যিনি এ কিতাব আরবী থেকে ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন। অন্যথায় কোনদিনই এ কিতাব বুঝতে পারতাম না।

আমি কৃতজ্ঞ তাঁর কাছে যিনি সেই সকল টেকনোলজি উদ্ভাবনের সাথে জড়িত, যার কারনে এ কিতাব আমা পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। অন্যথায় কোনদিনই এ কিতাব আমি হাতে পেতাম না।

আমি কৃতজ্ঞ তাঁর কাছে যিনি বুঝে কিংবা না বুঝে এ কিতাব প্রচার করেছেন। কেননা যে কোন প্রকারেই হোক তিনি একে মহিমান্বিত করেছেন।

আমি কৃতজ্ঞ তাঁর কাছে যিনি এ কিতাবের নাম ব্যবহার করে ত্রাস কিংবা নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছেন। কেননা তিনিও এ কিতাবের গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছেন।

আমি কৃতজ্ঞ তাঁর কাছে যিনি সন্ত্রাস দমনে আলোড়ন তুলেছেন। কেননা তিনি এর গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছেন। আমি কৃতজ্ঞ তাঁর কাছে যিনি এ কিতাব নিয়ে খেলা সৃষ্টি করেছেন। তিনিও এর গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছেন।

আমি কৃতজ্ঞ তাঁর কাছে যিনি যে কোন প্রকারেই হোক এ কিতাবের পক্ষে কথা বলে একে সমুন্নত রেখেছেন। যার কারনে বিরুদ্ধবাদীর সৃষ্টি হয়েছে।

আমি কৃতজ্ঞ তাঁর কাছে যিনি এর বিপক্ষে কথা বলে এর গুরুত্বকে অধিকতর বৃদ্ধি করেছেন। কেননা-

এতসব কারন না ঘটলে এ কিতাব পড়ার প্রয়োজন অনুভব করতাম না। যারা এর ভেতরের বিষয় জানার আগ্রহ সৃষ্টি করেছেন, তাদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তাদের কারনেই ভেতরে এ কিতাবকে জানার ও এর মর্ম বাণী অনুধাবন করার আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। অথচ শত চেষ্টা করেও এ কিতাব পাঠ করানো সম্ভব হয়নি, যখন শৈশবে সবাই আত্মস্থ করেছে। আজ নিজ চেষ্টায়, নিজ তাগিদে অনুপ্রাণীত হয়ে কাজ করে চলেছি। তারাই আমাকে আসমানি কিতাব 'কোরআন' পাঠ করিয়েছেন। বলা যায়, পাঠ করতে বাধ্য করেছেন। যদিও সত্য হচ্ছে, পেছনের মহান কারিগর একজনই। তিনি কৌশলে সব সম্পন্ন করেন (আল কোরআন ১২:১০০)।

এ কিতাব পাঠ করে যদি পূণ্য হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে, সে পূণ্যের ভাগ যদি আমি পেয়ে থাকি, তবে তারাও সে পূণ্য প্রাপ্তির ভাগীদার, যাদের কথা ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে। হোক তারা হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান কিংবা ইহুদী বা নাস্তিক।

এ কিতাব পড়ার কারনে শুধু শুধু কৃতজ্ঞ হওয়ার কারন ছিল না। কত কিতাবই তো জীবনে পড়ি এবং পড়েছি। তাতে কৃতজ্ঞ হয়েছি বলে তো ঘোষনা করি না। এবার কেন ঘোষনা দিতে হল?

এর প্রতিটি শব্দ যেভাবে অনুভব করেছি তাতে অভিভূত হয়েছি। এটা না জানলে জানাই হত না যে পৃথিবীতে এমন ইংগিতপূর্ণ একটি গ্রন্থ অবতীর্ন হয়েছে। এভাবে ভাববার বেশ কারন আছে। তবে প্রচলিত ব্যাখ্যায় তুষ্ট নই। নিজ বোধে এ কিতাবে অনুরক্ত আমি। (লেখা ২০১৪)



ষাঁড়ের লড়াই

(Bull Fight)

খুব ঝাল করে মুড়ি বানিয়েছি। সাথে পেঁয়াজ-মরিচ-চানাচুর আর সামান্য খাঁটি সঁরিষার তেল। আছে ফ্লাস্ক ভর্তি চা। দু'বন্ধু টিভির সামনে বসে আছি।

গতকাল 'এ্যাডমিরাল ইয়ামামাতো' মুভিটা দেখেছি। কেবলমাত্র 'নরমেন্ডি ল্যান্ডিং' মুভিটি দেখা শেষ করেছি। ক'দিন ধরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ছবিগুলি দেখা নেশার মত পেয়ে বসেছে। একটু পর চলবে 'দ্যা থিন রেড লাইন'। আছে ভিয়েতনাম যুদ্ধের ছবিসহ আরও কিছু। ইদানিং কালের কথা নয়।

যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। পাহাড়ের ওপর থেকে বৃষ্টির মত অবিরাম কামান আর মেশিন গানের গুলিবর্ষন চলছে। উর্ধ্বমুখী সৈন্যদল হেলমেট মাথায় নীচু হয়ে শুয়ে আছে। কাঁশবনের মত জংগলে মিশে যাওয়া সৈন্যদের দেখা যাচেছ না। জংগলের ভেতরে সাপ, ব্যাঙ চলাচল করছে। বাতাসের সাথে সমুদ্রের ঢেউয়ের মত ঢেউ খেলে যাচ্ছে পাতাগুলি। মিষ্টি রোদ খেলা করছে। নীল আকাশে ভাসছে সাদা মেঘ।

ছবির মত এত সুন্দর প্রকৃতির ভেতরে চলছে হিংস্র তান্ডব। চলছে রক্তের হলি খেলা। ইতিমধ্যে অনেকের হাত-পা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সহ যোদ্ধারা আহতকে সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে। গ্রেনেডের আঘাতে ঝলসে গেছে অনেকের মুখমন্ডল। রক্ত গড়িয়ে পরছে। তুমুল যুদ্ধ চলছে ...।

যাদের জীবনে এ ঘটনা সত্যি হয়ে দেখা দিয়েছিল সেটি কত নিষ্ঠুর, ভয়ংকর আর মর্মান্তিক ছিল! অথচ দেখতে আজ কত আনন্দদায়ক মনে হচ্ছে!

ফ্লাস্ক থেকে চা ঢাললাম। কি নির্মম! কি মর্মান্তিক এ যুদ্ধ! সাত সমুদ্র তের নদী দুরত্বে সৈন্যদের মা-বাবা, ভাই-বোন, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা স্বজন কেউ জানছে না আজ সকালে তাদের লালিত অনেক স্বপ্ন একটু আগেই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে।

না-হ। আর দেখব না। অসুস্থ হয়ে যাচিছ। ডিভিডিটা বন্ধ করে টিভি চালালাম।



ঝনঝন করে একটি শব্দ বেজে উঠল। শব্দটি অতি পরিচিত এবং পছন্দের। পিঠে বাঁধা খাপ থেকে এক টানে তরবারি বের করে আনার শব্দ। দৃষ্টি সরাতে পারলাম না। মাটিতে ধরাশায়ী রক্তমাখা ক্ষত-বিক্ষত এক নিগ্রো। জীবন বাঁচানোর আঁকুতি। বিজয়ী গ্ল্যাডিয়েটরের হাতে তরবারি চকচক করছে। দর্শক সারিতে উৎফুল্লতার চিৎকার। হত্যা করার জন্য বলা হচেছ। নিরাপদ দুরত্বে অবস্থানকারি রাজার হাতের একটি ইশারার অপেক্ষায় সবাই।

বুকের মধ্যে ধারালো তরবারি ঢুকিয়ে দিতেই রক্ত ছিটিয়ে গেল চারিদিকে। চারিদিকে উল্লাসের ধ্বনি। এ কোন যুগ! এ কোন খেলা ! বর্বর...।

বর্বরতার এসব যুগ পেরিয়ে মানুষ আজ অনেক সভ্য। তার জন্য অবশ্য অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে। চ্যানেল পাল্টালাম। খবর চলছে। অমুক জেলায় ঐতিহ্যবাহি ষাঁড়ের লড়াইয়ের আয়োজন ...। ইদানিং কালের ঘটনা।



একটি ষাঁড় অপর একটি ষাঁড়কে শিং দিয়ে গুতিয়ে রক্তাক্ত করে ফেলছে। চারিদিকে সভ্য মানুষদের আনন্দের উল্লাস। দুর্বল ষাঁড়টি পালাতে চেষ্টা করছে। তাকে পালাতে দেয়া হচ্ছে না। পিটিয়ে বাধ্য করা হচ্ছে খেলায় অংশগ্রহণ

করতে। যত আঘাত তত আনন্দ। দর্শকদের উল্লাস। আয়োজকদের সার্থক আয়োজন।

সময়ের সাথে সাথে ভেতরের মনবৃত্তি কি একটুও পাল্টেছে? রাজার মনবৃত্তি আজ প্রজার মাঝে প্রবাহিত। তবে আর রাজার দোষ কিসে?

"যত প্রকার প্রাণী পৃথিবীতে বিচরণশীল আছে এবং যত প্রকার পাখি দু'ডানাযোগে উড়ে বেড়ায়, তারা তোমাদেরই মত। গ্রন্থ লিপিবদ্ধকরণে কোন বিষয়কেই আমি উপেক্ষা করিনি। অতপর সবাই স্বীয় প্রতিপালকের নিকট সমবেত হবে।" (আল-কোরআন ৬:৩৮)

"... আমিই সেই পালনকর্তা, আত্মারূপে সকল জীবের অন্তরে বসবাস করার মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করি।" (গীতা ৪:৮) (লেখা ২০১৩)

ইন্দ্রিয়

(Senses)

টিভিতে এ্যানিমেল প্ল্যানেট দেখছি। ওয়াইল্ডারবিষ্টগুলো দল বেঁধে প্রচন্ড বেগে ছুটে চলেছে। এক অঞ্চল ছেড়ে অন্য অঞ্চলে যাচ্ছে। একটা নদীর কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। এখানে এসে গতি হারিয়ে ফেলেছে। মনে হচ্ছে চিন্তিত। নামবে কি নামবে না? দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাজ করছে। কতগুলি কুমির পথ আগলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তবুও জীবন তো থেমে থাকবে না। ঝুঁকি নিয়ে হলেও ঝাঁপিয়ে পরতে হবে।

ঝাঁকে ঝাঁকে ওয়াইল্ডারবিষ্ট ঝাঁপিয়ে পরছে পানিতে। দ্রুত পার হয়ে ওপারে তীরে ওঠার চেষ্টা। ধীর-স্থির কুমিরগুলো চোখ উঁচিয়ে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। সুযোগের অপেক্ষায়। কতগুলি প্রাণ ঝড়ে গেল।



কিছুদুরে একটি নিথর দেহ নদীর স্রোতের সাথে ভেসে চলে যাচ্ছে। পেট ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। মরদেহের পেটের ওপর দাঁড়িয়ে আছে ক'টা শিকারী পাখি। ঠোটগুলি চোখা। সরু ও বাঁকানো। চোখের দৃষ্টিতে আছে তীক্ষ্ণতা ও সতর্কতা। তারাও ভেসে যাচ্ছে মহা আনন্দে ভোজন করতে করতে। মরদেহের পেটের বেশ খানিকটা অংশ খুলে ফেলেছে। নাড়ি-ভূড়ি থেকে শুরু করে- বাছাই করে ভেতর থেকে নরম অংশগুলি বেড় করে আনছে। মহাভোজ হচ্ছে।

একজন মানুষের পক্ষে বেশিক্ষণ এসব দৃশ্য তাকিয়ে দেখতে ভাল লাগে না। এমনকি তার নিজের খাবারের রুচিও নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এসব দৃশ্য দেখে অনেকে অনেকদিন মাংশ খেতে পারে না। কেমন কেমন যেন লাগে। কেউ কেউ তাই স্থায়ীভাবে নিরামিষভোজী হয়ে যায়। নিরামিষভোজী হওয়ার পেছনে যৌক্তিকতা আছে; তবে যারা বিষয়গুলি নিয়ে ভাববে তাদের জন্য।

ইন্দ্রিয়

আচ্ছা, পাখিগুলি কেমন করে এমন অপরিচ্ছন্ন পঁচা-বাঁসি, আবার তারই মত আরও এক প্রাণীর দেহ খেয়ে যাচ্ছে! তাদের কি একটুও খারাপ লাগছে না? কোন বাজে গন্ধ লাগছে না! অরুচি লাগছে না?

এভাবে একদিন মানুষও নিশ্চয়ই মশলা ছাড়া, রান্নাবিহীন খাবার খেয়েছে। আদিম যুগে। তখন এমন পঁচা খাবারও হয়তোবা খেয়েছে। যেমন এখন বাঘ-সিংহরা খায়। আমরা দেখি। বস্তুত কোন প্রাণ না খেয়ে আরেকটা প্রাণ বেঁচে থাকতে পারে না।

বিদ্যুৎ তো সর্বত্র একই। বৈদ্যুতিক পাখায় সংযোগ দিলে পাখা ঘোরে। বাতাস দেয়। গাড়িতে সংযোগ দিলে চাকা ঘোরে, একস্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়া সম্ভব হয়। বাতিতে দিলে আলো জ্বলে। অন্ধকারে সব দেখতে পাই। একই বিদ্যুৎ। কেবল কারুকাজে ভরা বিভিন্নভাবে তৈরী বিভিন্ন যন্ত্রের পার্থক্যের কারনে একেক রকম কাজ করে যাচ্ছে- সেবা দিয়ে যাচ্ছে।

সকল জীবনের ভেতরে একই জীবনের গতি- প্রাণ। একেক রকম বা ধরণ বা আকৃতির জীবে প্রবাহিত। একেকটা একেক কাজ করে যাচ্ছে। যিনি সৃষ্টি করেছেন তার প্রয়োজন পুরণ করে চলেছে। তাকে সেবা দিয়ে চলেছে।

“... সকল জীব সত্ত্বায় আমিই জীবনের গতি ... ।” (গীতা ১০:২২)

বিদ্যুৎ যখন যন্ত্রসমুহের ভেতরে কাজ করে তখন যন্ত্রসমুহ কোন স্বাদ পায় কিনা জানিনা। কিন্তু জীব পায়। ইন্দ্রিয়ের কারনে পায়। ইন্দ্রিয় কি? যন্ত্রসমুহ হয়তোবা সেটি জানে না। যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি তাকে সে জ্ঞান দেননি। বিষয়টির সাথে তাকে পরিচয় করিয়ে দেননি। জানলে হয়তোবা সেও স্রষ্টার কাছে সেটি দাবী করে বসতো, কিংবা পাওয়ার আকুতি জানাতো। এর পরিণাম সে জানেনা।

মানুষও অনেক কিছু স্রষ্টার কাছে দাবী করতে পারছে না, যার সাথে স্রষ্টা তাকে আজও পরিচয় করিয়ে দেননি। পরিচয় করিয়ে দেওয়া মাত্রই সে দাবী করতে শুরু করবে। জানলেই যন্ত্রনার শুরু। ইন্দ্রিয়ের বিষয় ইন্দ্রিয়কে তথা জীবনকে উপদ্রপ করে। জীবনকে অস্থির ও বিচলিত করে তোলে।

“ইন্দ্রিয়সমুহ এতটাই শক্তিশালী, স্বতঃস্ফুর্ত ও দুর্বার যে, তারা এমনকি অতি যত্নশীল বিবেকবান মানুষ, যে তাদেরকে নিয়ন্ত্রনের চেষ্টায় রত, তার অন্তরকেও জোরপূর্বক তার পথে টেনে নিয়ে যায়। শক্তিশালী বাতাসে নৌকা যেমন এদিক-ওদিক দোলে, তেমনই মনের মধ্যে বিচরণকারী যে কোন একটিমাত্র ইন্দ্রিয়ের

আকর্ষনেও, অসংযত ব্যাক্তির বুদ্ধিমত্তা তিরোহিত হতে পারে। একজন বুদ্ধিমান ব্যাক্তি দুঃখ সৃষ্টির কারনে অংশ নেয় না, যা আসে বস্তুগত বিষয়ের সাথে ইন্দ্রিয়ের সংযোগের ফলে।” (গীতা ২:৬০,৬৭, ৫:২২)

মানুষ যখন হরেক রকমের মসলা মিশিয়ে মহাসুখে খাসীর কাচ্চি খায়, সে তার জিহ্বা, নাসিকা নানান ইন্দ্রিয় দিয়ে এর চমৎকার স্বাদ পায়। জগতে এমন কোন উচ্চ পর্যায়ের প্রাণী কি আছে যে তা দেখে ঘৃণাবোধ করে? একদেহ তারই মত আরও এক দেহকে খেয়ে ফেলছে এই ভেবে? যেমন এখন পাখিগুলিকে দেখে মনে হচ্ছে!

পাখির জীবন্ত দেহ একটি মরদেহের ওপরে দাড়িয়ে দিব্যি ভোজন করে চলেছে। কি করে বুঝবো যে সে কাচ্চির মত স্বাদ-ঘ্রান পাচ্ছে না?

ঐ মরদেহে আমরা যে গন্ধ পাই, যা দেখে আমাদের অরুচি হয়, ঐ পখিগুলিকে এমন শর্তে ও পরিবেশে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, সে তা পায় না। সে আনন্দই উপভোগ করে। এমন কি মানুষের মধ্যে আজও এমন মানুষ আছে যাদের খাদ্যাভ্যাস অন্য মানুষদের অপছন্দ। কীট-পতঙ্গ বড় বড় প্রাণীর বিষ্ঠা নিয়ে মহা কাড়াকাড়ি শুরু করে দেয়। তাদের ইন্দ্রিয় তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে। ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়ে তারতম্য আছে। একেকটা একেকটাকে আকর্ষন বা বিকর্ষন করে।

“জীবসত্ত্বাসমুহ এইভাবে অন্য দেহ ধারণ করে একটি নির্দিষ্ট প্রকারের কর্ণ, জিহ্বা এবং নাসিকা ও স্পর্শের অনুভূতি লাভ করে, যা মনের সাথে একসাথে সম্পৃক্ত হয়। এই প্রকারে সে একটি নির্দিষ্ট ধরণের অনুভূতির গুণাগুণ লাভ করে ও উপভোগ করে।” (গীতা ১৫:৯) (লেখা ২০১৩)

উপহার

(Gift)

কলেজের বয়সে ‘গিফট অব দ্যা ...’ নামের একটি গল্প পড়েছিলাম। অনটনের মাঝে থাকলেও প্রিয়জনকে কিছু উপহার দিতে হয়। এর অনেক ভাল ফলাফল বা প্রাপ্তি আছে। এটি পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও মমত্ববোধ সৃষ্টি করে।

কিছু মানুষ বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতায় উপহার সামগ্রী দিয়ে থাকেন। এমন সব মানুষের মাঝে দেন যাদের কোন অভাব নেই। কিন্তু উপহার দিতে পেরে তিনি আনন্দ পান। সেভাবে তার শিক্ষা-মানসিকতা গড়ে উঠেছে।

কখনও কখনও যারা উপহার দেন তাদের মাঝে এক নিরব প্রতিযোগীতা শুরু হয়। আবার কখনও যারা উপহার পান তাদের মাঝেও রাগ, অনুরাগ, প্রতিযোগীতা এবং প্রশংসা করার ক্ষেত্রে তারতম্য করতে দেখা যায়। অনেকে উপহার গ্রহণ করে পেছনে মন্তব্য করতেও ছাড়ে না। ভাল ও মন্দ দু’ভাবেই।

অনেকে উপহার দিয়ে নিজেকে বড় প্রমাণ করার চেষ্টা করে। উপহার দিয়ে অনেকে অন্যকে ছোট করার চেষ্টা করে। এসব উপহারের মধ্যে ভালবাসা নেই। আছে ক্যালকুলেশন। আর একবার কোন রিতি প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেলে গড্ডালিকায় গা ভাসিয়ে দেয়ার মত কাজটি করেই যেতে হয়। অনেককে অনটনের মধ্যেও বাধ্য হয়ে এমন কাজে লিপ্ত হতে হয়। কেননা প্রতিষ্ঠিত সামাজিকতা বলে কথা।

অনেকে ছোট্ট উপহার দিয়ে বড় স্বার্থ উদ্ধার করে নেয়। এরা ধূর্ত। আর যে তা পেয়ে খুশিতে গদগদ হয়ে যায় সে বোকার পর্যায়ভূক্ত। কি পাচ্ছে আর কতটুকু নিয়ে যাচ্ছে তার হিসেব কষে না। একটু মুচকি হাসি আর মিথ্যে মর্যাদা প্রাপ্তিতেই এরা তুষ্ট। কেননা এদের এতটুকু প্রাপ্তিও জোটে না। তাই তারা তুষ্ট। এতটুকুই তাদের কাছে অনেক কিছু।

অনেকে উপহার দিয়ে তাৎক্ষণিক স্বার্থ আদায় করে নেয়। অনেকে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করে স্বার্থ আদায় করে। অনেকে স্বার্থ আদায় করে চম্পট দেয়। খারাপ হিসেবে পরিচিতি পায়। তাতে তার কিছু এসে যায় না। পরবর্তীতে সুখে জীবন-যাপন করে।

অনেকে স্বার্থ আদায় করে নিয়ে একটা সময়ে নিজেকে বিপদগ্রস্থ প্রমাণ করে। মাফ চেয়ে নেয়। ভাল থাকার চেষ্টা করে। এগুলোতে তাদের কিছু এসে যায় না। অতপর সুখে জীবন-যাপন করে।

উপহার

কিছু মানুষ দুনিয়াব্যাপি মানুষকে ছোট ছোট উপহার দেয়। নিজেকে সকলের কাছে প্রিয় করে তোলার চেষ্টা করে। কোন উপকার পায় না। তবুও সমাজ রক্ষা করে। অথচ যার কাছ থেকে নিঃস্বার্থভাবে জীবনের সবচেয়ে বড় উপকার পায় তাকেও অবজ্ঞা করতে কুন্ঠাবোধ করে না।

মানুষের মাঝে এমন মানসিকতার প্রয়োজন কি যে অন্যকে উপহার প্রদান করতে হবে। এসব সংস্কৃতির জন্য মানুষকে হন্যে হয়ে অধিক উপার্জনে নামতে হয়। প্রতিযোগীতায় লিপ্ত হতে হয়। অনেক নোংরামিতে জড়াতে হয়।

যে বিষয়টি আলোচনা করছি সেটা শুনতে ও পড়তে ভাল লাগবে না। বিষয়টি ছোট মানসিকতার মনে হবে। আসলে ছোট ছোট এ বিষয়গুলিও ছোট নয়। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি সহজ করার চেষ্টা করি।

বিয়ে একটি চুক্তি। এটি কাজী অফিসে স্বাক্ষর করেই করে ফেলা যায়। এটি একটি রেজিস্ট্রেশন। কিন্তু লক্ষ টাকার প্রতিযোগীতা ও হয়রানিমূলক অনুষ্ঠান করতে গিয়ে অবৈধ-অন্যায় উপায়ে উপার্জন করতে হয়। অন্যায় উপার্জন দিয়ে ঘটা করে বিয়ে করার চেয়ে, ন্যায় পথে থেকে সাদা-মাটাভাবে বিয়ে করলে ক্ষতি কি? কিন্তু সবার পক্ষে তা করা সম্ভব নয়। সেই মানসিক যোগ্যতা অর্জন কেবল অনেক সাধনারই বিষয় নয়, সঠিক জ্ঞান অর্জনের সাথেও সম্পর্কিত।

বর্তমান সামাজিক সিস্টেমে কাজটি করা কঠিন। সমাজকে ধীরে ধীরে পরিবর্তন করার মাধ্যমে কাজটিকে সহজ করা যায়। এ কথাগুলো বলাই এ লেখার উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হচেছ সিস্টেম সম্পর্কে দুটি কথা বলা।

যে সমাজে একজন ব্যাক্তি দু'শ লোককে উপহার দিতে পারে, অথচ ছোট ছোট শিশুরা ডাষ্টবিনে খাবার নিয়ে কাকের সাথে লড়াই করে, সে সমাজ অবশ্যই ত্রুটিযুক্ত, নষ্ট সমাজ। আর যারা উপহার নিয়ে-দিয়ে বেড়ায় তারা সমাজের হর্তা-কর্তা পর্যায়ের। তারাই ত্রুটিযুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করে ও ধরে রাখে। তাদের প্রদত্ত উপহার বর্জনীয়।

সমাজে অন্যায় বন্ধ করতে হলে, অন্যায় ও মিথ্যে আচরণ দিয়ে উপার্জিত অর্থ দ্বারা মহামানবোচিত আচরণে বিতরণকৃত উপহারগুলি বর্জন করা প্রয়োজন। একজন মানুষ অধিক উপার্জন করে দরীদ্রদের মাঝে সেটি বিতরণের ভাব প্রদর্শন না করে, সবাই যেন নিজের পরিমান মত কৃত পরিশ্রমের যথাযথ অর্থ পেতে পারে

এবং নিজের মত নিজে চলতে পারে সে ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বড়দের দ্বারা অন্যকে ছল-ছূতোয় নির্ভরশীল করে রাখার নিয়ম পরিত্যাগ করতে হবে।

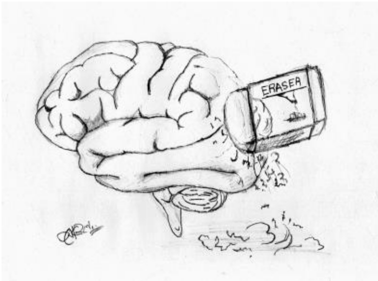
অধিক উপার্জিতদের বিতরণকৃত উপহার বর্জন করে তাদের অন্যায় অযৌক্তিক উপার্জনকে নিরুৎসাহিত করতে হবে। সমাজ আজ এমন পর্যায়ে নেমে এসেছে যে, এমন একটি লেখা লিখতে হচ্ছে! নিজের কাছেও খারাপ লাগছে।

তাই বলে কি মানুষ মানুষকে উপহার দেবে না? দেবে, অবশ্যই দেবে। তবে অন্যায়ভাবে উপার্জিত অর্থ দিয়ে নয়। আজকাল ঘুষকেও উপহার হিসেবে বিবেচনা করা হয়!

ডিলিট: একটি স্বীকৃতি - একটি সম্ভাবনা

(Delete : An acknowledgment - A Chances)

এই যে পৃথিবীর পথে হেটে বেড়াই, মাটিতে তার ছাপ থেকে যায়। ঐ ছাপের ওপর দিয়ে গাড়ি চলে যায়। ছাপটিকে আর দেখতে পাই না। ভাবি মুছে গেছে। কিন্তু না, মুছে যায় না। অমোছনীয় এ পদচিহ্ন। ঐ ছাপ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায়। যে ঘটনাটি একবার ঘটেছে তা পৃথিবীর পথে প্রান্তরে স্মৃতি হয়ে রয়ে যায়। পৃথিবীর বুকে আঁচড় কেঁটে যাওয়া একটি রেখা, কিংবা কোন তরঙ্গ চিরকালের জন্য হারিয়ে যায় না। বিভিন্নরূপে থেকে যায়। একদিন কাজে লাগতে পারে।



অনেক কিছু বুঝতে পারি। দেখতে পাই। আবার অনেক কিছুই বুঝতে পারিনা। দেখতে পাই না। এর অর্থ এই নয় যে বিষয়টি বর্তমানে নেই, কিংবা কখনও খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে না। যুগের সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের কারনে অনেক কিছুই বোঝা সহজ হয় যায়।

কবে আবার নতুন যুগ আসবে তারপর নতুন বিষয়টি বুঝতে পারব, অথচ চলে গেলে তো বিষয়গুলি আর জানা হবে না। তাই মস্তিস্কে পরের যুগের অগ্রীম ভাবনা এলে মেনে নিতে সমস্যা কি? স্রষ্টা এত কিছু করেছেন। তিনি সব পারেন, ভাবনাটি নির্বুদ্ধিতা হবে বলে মনে হয় না।

এই যে কম্পিউটারে লিখে চলেছি। লেখাটি মিলিয়ে যাবে না। থেকে যাবে। বিজ্ঞানী নই, তাই কোথায় থেকে যাবে জানিনা। হয়তো মেমোরিতে। সেখান থেকে মুছে ফেললে রিসাইকেল বিনে। হয়তো সেটাও মেমোরী। এক স্থান থেকে মুছে ফেললে আরেক স্থানে পাওয়া যাবে। আবার ভিন্ন ফরমে বা রূপেও ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে পারে। যার সেই জ্ঞান আছে, ভিন্ন ফরমে চলে গেলেও লেখাটিকে সে পূর্বের ফরমে নিয়ে আসতে সক্ষম। আজ যদি সম্ভব না হয়, একদিন সেটিও সম্ভব হতে পারে। আচড়টি থেকেই যাবে। মুছে যাবে না কোনদিন; যদি না সৃষ্টিকর্তার ব্যাবস্থাপনায় চিরস্থায়ী মুছে ফেলার আর কোন উপায় থাকে।

মুখে একটি শব্দ উচচারিত হল। ভাল হোক মন্দ হোক- উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথে শুনতে পাই। ক্ষাণিক পর আর শুনতে পাই না। সেটি কিন্তু মিলিয়ে যায়নি। উচ্চারিত শব্দ যদি মিলিয়ে যেত, তবে আমরা শুনতেই পেতাম না। যদি মিলিয়ে যেত, তবে রেকর্ড করে রাখাও সম্ভব হত না। জ্ঞানের সঠিক প্রয়োগে আপাত মিলিয়ে যাওয়া বিষয়টিকে হাজির করা সম্ভব। আবার ধরে রাখাও সম্ভব। রেকর্ড করার সূত্র আবিষ্কৃত হওয়ার কারনে বিষয়গুলি আজ বুঝতে সহজ হচেছ। মেনে নিতে অসুবিধা হচ্ছে না। যেটি আজ বোঝা সম্ভব হচ্ছে না একদিন সেটিও জানা যাবে। আর এত কারিশমার যিনি স্রষ্টা তিনি সব জানেন- এমন ভাবনাটি বোকামি হবে বলে মনে হয় না। যে শব্দটি মিলিয়ে গেল বলে মনে হল তা মিলিয়ে যায়নি। কোথাও না কোথাও তার উপস্থিতি আছে।

"... প্রতিটি বিষয় আমি সুস্পষ্টভাবে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ/সংরক্ষণ করে রাখি।" (আল-কোরআন ৩৬:১২)

"অদৃশ্য জগতের চাবি তাঁরই কাছে ... একটি পাতাও ঝরে না অথচ তিনি তা জানেন। জগতের বিশাল অন্ধকারে একটি শস্য কণাও আর্দ্র কিংবা শুষ্ক ভূমিতে পতিত হয় না, যার হিসেব সুস্পষ্টরূপে লিপিবদ্ধ/সংরক্ষিত আছে।" (আল-কোরআন ৬:৫৯)

পৃথিবীর বক্ষে ঘটে যাওয়া একটি আঁচরও মিলিয়ে যায় না। রেকর্ড হয়ে থাকে। বিধাতার সৃষ্টিই এমন!

সূক্ষভাবে ভাবলে আমাদের অপ্রয়োজনীয় কথা, অপ্রয়োজনীয় কর্মগুলিও সব রেকর্ডভূক্ত। অপ্রয়োজনীয় সব কিছুই প্রয়োজনীয় সংরক্ষণাগারের স্থানের অপচয় করছে। তারও হিসেব হতে পারে। অপচয়ের দায় তার, যে অপ্রয়োজনীয় কর্মগুলি সম্পন্ন করছে।

ভূল হয়ে গেলে ভূলের তাই একটি স্বীকৃতি প্রয়োজন। স্বীকৃতি কি? কেন প্রয়োজন? ভূলের স্বীকৃতি ভূলের মাশূল থেকে প্রয়োজনে কোনদিন রক্ষা করতে পারে।

পরীক্ষার খাতায় লিখতে লিখতে ভূল হয়ে গেল। ভূল অংশটুকু কেঁটে দিলাম। এটিই স্বীকৃতি। স্বীকার করে নিলাম যে, কেটে দেয়া অংশটি ভূল। সঠিক নয়। অর্থাৎ এ ভূলের সাথে আমি নিজে একমত নই। সকলেই বিষয়টি বুঝে নিল যে ভূল স্বীকার করা হয়েছে। অর্থাৎ কেটে দেয়া কিংবা মুছে ফেলা হলো ভূলের একটি

স্বীকৃতি। এটি একটি নিয়ম। ভূলের স্বীকৃতির প্রকাশ না থাকলে, ভূলটিকেও ভূলভাবে শুদ্ধ ভাবা হয়েছিল, তেমন ভাবা হতে পারে। সেটি জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা, অজ্ঞতা প্রকারন্তরে উদাসীনতাকে প্রকাশ করে দিতে পারে। যে করেছে তার ওপর তার দায় বর্তাবে। তারপর কখনও সে ভূলের মাশূল দিতে হতে পারে। ভূলের স্বীকৃতি তাই দায় থেকে মুক্তি পাওয়ার একটি নিয়ম বা বলা যেতে পারে ক্ষমা পাওয়ার সম্ভাবনা।

মুখে একটি ভূল শব্দ উচচারিত হল। মুখেই আবার বলে দেই এটা সঠিক নয়- ভূল। এটা ভূলের মৌখিক স্বীকৃতি। ভূল শব্দটি যেমন কোথাও রেকর্ড হয়ে আছে। ভূলের স্বীকৃতিটিও রেকর্ড হয়ে আছে। কোনদিন প্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে পারে। সাক্ষী হতে পারে। সেদিন এই স্বীকৃতি- ভূল এবং ভূলের মাশূল থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে।

কম্পিউটারে ভূল হলে ডিলিট করে দেই। তবুও ভূল থেকে যায়। যে ভূলটি ডিলিট করা হয়েছে বলে মনে করি, বস্তুত সেটিও থেকে যায়। যে জানে বা ভবিষ্যতে জানবে সে তা বের করে আনতে পারবে। পৃথিবীর বুকে ঘটে যাওয়া একটি আঁচরও মিলিয়ে যায় না। যদি না সৃষ্টিকর্তার ব্যাবস্থাপনায় চিরস্থায়ী মুছে ফেলার আর কোন উপায় থাকে।

বহুদিন পর হিসেব কষতে গেলে জানা যাবে যে, অন্তত ঐ বেঠিক কাজটিকে ভূল বলে কখনও স্বীকার করে নিয়ে ডিলিট করা হয়েছিল। লেখার ক্ষেত্রে কেটে দেয়া হয়েছিল। মুখে ভূল স্বীকার করা হয়েছিল। ভূলের স্বীকৃতি গুরুত্বপূর্ণ। ভূলের স্বীকৃতি দায় থেকে মুক্ত হওয়ার একটি নিয়ম। ক্ষমা পাওয়ার সম্ভাবনা।

কলমের কালির আঁচর সকলেই দেখতে পায়। মুখে উচচারিত শব্দ সকলেই শুনতে পায়। কিন্তু হৃদয়ের স্পন্দন? সে যে কথা বলে তা সবাই জানে না। সকলের অগোচরে যে চিন্তাটি মস্তিস্কে ঝিলিক দিয়ে যায়, তা কেউ ধরতে পারে না। অথচ বাতাসে শব্দের কম্পন, কর্মে আলোর কম্পনের ন্যায় হৃদয়ের স্পন্দন তথা চিন্তার কম্পনও রেকর্ডভূক্ত। সে কম্পনকে বিশ্লেষন করতে জানলে কম্পন বলে দেবে যে তুমি একটি মন্দ ভাবনা ভেবেছিলে - মন্দ চিন্তা করেছিলে।

আপনা থেকে এসে যাওয়া কোন মন্দ চিন্তার সাথে নিজে একমত নই, চিন্তাটিকে পছন্দ বা গ্রহণ করি না- তারও একটি স্বীকৃতি প্রয়োজন আছে। অন্যথায়

ভূল করে ভাবা যেতে পারে যে, মন্দ ভাবনাটিও অন্তরের কথা। অন্তরের চাওয়া। মন্দ পরিকল্পনার অংশ।

অন্তর চাইতেই পারে। তাতে অপরাধ নেই। কেননা অন্তরে আপনা থেকে এসে যাওয়া ভাবনা বা চাওয়াকে নিবৃত করার উপায় নেই। অন্তরের মন্দ চাওয়া মন্দ পথে পা বাড়াতে কখনও উদ্বুদ্ধ করতে পারে। এটি পাপের সম্ভাবনা। অন্তরের মন্দ-সুযোগের অপেক্ষায় থাকে পাপের পথে পা বাড়াতে। আপনা থেকে এসে যাওয়া অন্তরের তেমন ভাবনার সাথে নিজ জ্ঞান সহমত নয়- তারও একটি স্বীকৃতি প্রয়োজন আছে। অন্যথায় ভাবা হতে পারে যে জ্ঞানকে কাজে লাগানো হয়নি। সেটিও একটি অপরাধ।

এ থেকে পরিত্রানের উপায় বা পথ কি? এমন উপায়, যা সকলকে জানিয়ে দেবে যে অন্তরের এ মন্দ ভাবনাটির সাথে নিজে সহমত নই বা ছিলাম না। ফলে কোনদিন সকলে সে ভূল স্বীকারোক্তিকেও জানতে পারবে। জানতে পারবে যে, ভূল বা অন্তরের মন্দ চিন্তাটির সাথে নিজে একমত ছিলাম না। এতে চিন্তা ও জ্ঞানের সততা বা সত্যটি প্রকাশ পাবে। ফলে ভূল বোঝার অবকাশ থাকবে না। তাই এখানেও প্রয়োজন একটি স্বীকৃতির। একটি আন্তরীক স্বীকৃতির। অন্তরের মন্দ চিন্তাটিকেও ডিলিটের ঘরে নিয়ে যেতে হবে।

যে মন্দ চিন্তাটি ক্ষমতার বাইরে অবচেতনে আপনা থেকে চলে এসেছে- তা থেকে আমি মুক্ত, তারও একটি স্বীকৃতি প্রয়োজন। মন্দ ভাবনা বা চিন্তা এলে তাকেও কেটে দিতে হবে। মুছে দিতে হবে। আমাদের কথায়-কর্মে-চিন্তায় প্রতি মুহুর্তে রয়েছে ভূলের সম্ভাবনা। আর সেজন্যই বারবার আওরাবার এ নিয়ম- “আস্তাগফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি জাম্বিওঁ ওয়া আতুবু ইলাইহি; লা হাওলা ওয়া লা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজিম” অর্থাৎ “আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই আমার সব পাপের জন্য, আমি তাঁর কাছে ফিরে আসি। .. নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তওবাকারীদের ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন।”

এটা আরবী হতে পারে, ইংরেজী হতে পারে, হতে পারে বাংলায়; কিংবা এভাবে হতে পারে, ওভাবে হতে পারে- যেভাবেই হোক না কেন, আমাদের একটি স্বীকৃতি প্রয়োজন যে, নিজ নিয়ন্ত্রনের বাইরে আবির্ভূত মন্দ কোন চিন্তার সাথেও আমার অন্তরের কোন একাত্মতা নেই বা ছিল না। অর্থাৎ বিষয়টি সচেতনভাবে ও

জ্ঞানসম্মত কোন চাওয়া নয়। এখানে ভাষাটি মুখ্য নয়। মূখ্য হচ্ছে নিয়তটি। মূখ্য হচ্ছে, মিলিয়ে দেয়া বিষয়টি বা স্বীকৃতিটি।

"... হে আমাদের পালনকর্তা! ... আমাদের ক্ষমা করুন, নিশ্চয়ই! আপনি সবকিছু করতে সক্ষম।" (আল-কোরআন ৬৬:৮)

এই স্বীকৃতিই ভূল বা মন্দকে ডিলিটের হিসেবে সংরক্ষন করে রাখে। কোনদিন কাজে লাগলে লাগতেও পারে। শেষ বিচার দিবসে। এই স্বীকৃতিই ডিলিট। যা ভূল বা মন্দটিকে মুছে দেয়।

মানব সৃষ্ট ভিডিও যেমন টুকরো টুকরো, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে শতধা বিভক্ত হয়ে গেলেও আবার গুটিয়ে নিলে বা রি-ওয়াইন্ড করলে হুবহু ফিরে আসে, তেমনি বিশ্ব-জগতে ঘটে যাওয়া সকল ঘটনা হুবহু ফিরে আসবে। তাইতো কেয়ামতের পূর্বে সূর্য্য পশ্চিমে উদীত হবে। এ পৃথিবী বা বিশ্ব-জগত উল্টোদিকে ঘুরবে।

"সেদিন আমি আকাশকে গুটিয়ে নেব, যেমন গুটানো হয় লিখিত কাগজ-পত্র। যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করবো। এটি আমার একটি অবধারিত প্রতিশ্রুতি, আমাকে তা পূর্ণ করতেই হবে।" (আল-কোরআন ২১:১০৪)

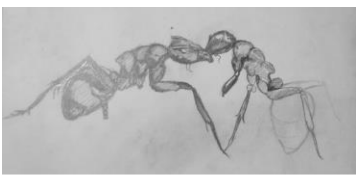
যুদ্ধ

(Fight)

দিঘীর পাড়ে পাকা ঘাট। চারিদিকে নাড়কেল গাছ। গাছের পাতাগুলি হালকা বাতাসে দুলছে। কপালে হাত রেখে ঘাটে শুয়ে আছে লিখন। নাড়কেল গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্য্যের আলো লুকোচুরি খেলছে। ভাল লাগছে।

এ ভাল লাগা বেশীক্ষণ স্থায়ী হলো না। পায়ের আঙ্গুলে বিষাক্ত যন্ত্রনা অনুভব হল। উঠে বসেছে লিখন। বড় বড় কতগুলি কাল পিপড়ে নাড়কেল গাছের নীচ থেকে বের হয়ে এসেছে। পায়ের কাছে এসে জড়ো হয়েছে। ওদের একজন এ কান্ডটি ঘটিয়েছে।

লিখন ভাবছে- পিপড়েগুলোর এ দিকটায় আগমনের নিশ্চয়ই কোন কারন আছে। এদিক-ওদিক ফিরে কারন সন্ধানের চেষ্টা করছে লিখন। কারন খুঁজে পাওয়া গেল না। তবে একটি মল্লযুদ্ধ নজরে এলো।

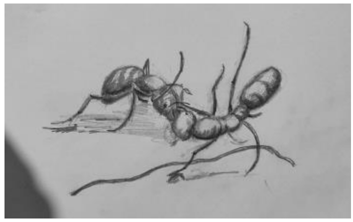


হৃষ্টপুষ্ট দু'টো পিপড়ে যুদ্ধে জড়িয়ে পরেছে। জেনারেল র‌্যাংকের হতে পারে। একটি অপরটিকে জাপটে ধরেছে। গড়াগড়ি দিয়ে লুটোপুটি খাচেছ। কামড় দিয়ে একজন আরেকজনকে আহত করার চেষ্টা করছে। দু'জনই জেতার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। বাকি জীবনটা দু'জনই আহত হয়ে বেঁচে থাকবে, নাকি একজনের মৃত্যু হবে- লিখন বুঝতে পারছে না।

কি নিয়ে যুদ্ধ করছে তারা? কোন নারীর কারনে? অসম বন্টনের কারনে? প্রজা মঙ্গলের দায়িত্বভার নিজ কাঁধে গ্রহণে অতি আগ্রহের কারনে? যে কারনেই হোক, তারা তাদের অন্তরের অদম্য আকাংখা-বাসনা বা খায়েসটাকে পূর্ণ করে নিজ নিজ আত্মাকে পরিতৃপ্ত করতে চায়।

আত্মার তৃপ্তির জন্য যে পথ তারা বেছে নিয়েছে, তাতেই আত্মা আজ আহত। আহত আত্মা নিয়ে যে প্রাপ্তি ঘটবে তাতে পূর্ণ তৃপ্তি আসবে না। আর যদি নিহত হয়? একটি সাধারণ মানের জীবন-যাপন করে, পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ আরও কিছুদিন ভোগ করা যেত। যুদ্ধের কারনে তারা সেই সৌভাগ্য থেকেও অগ্রীম বঞ্চিত হতে চলেছে।

নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের জন্য বাতাসে তারা যে কম্পন সৃষ্টি করে, তা লিখনের ধারণ ও বোধের ক্ষমতার বাইরে। লিখন তাদের সাথে যোগাযোগ করে প্রকৃত বিষয়টি জানতে পারছে না। কেবল ধারণা পোষন করছে।



লুটোপুটি খেতে খেতে দুই জেনারেল ঘাটের ওপরের সিড়ি থেকে পল্টি খেয়ে নীচের সিড়িতে গড়িয়ে পরেছে। তবুও প্রাণপণ লড়াই চালিয়ে যাচেছ। কেউ কাউকে ছাড়ছে না। লড়াইও বন্ধ হচেছ না। এ লড়াইয়ে জিততে হবে। রক্ত যখন দিয়েই ফেলেছে- প্রয়োজনে আরও রক্ত দেবে। হয়তোবা রক্তের বন্যায় ভেসে যাবে অন্যায়- এ জাতীয় চেতনাও কাজ করছে তাদের মধ্যে। কিংবা এটা মর্যাদার লড়াইও হতে পারে। হতে পারে কোন আদর্শের লড়াই। লিখন প্রকৃত বিষয়টি জানতে পারছে না। কেবল ধারণা পোষন করছে।

তাদের ব্যাক্তিগত জীবনে কিংবা তাদের সামাজিক জীবনে এ লড়াইয়ের হয়তবা অনেক মূল্য আছে। হয়তো পিপড়েদের বিশ্ব পরিচালনায় তাদের সৃষ্টিকর্তা তাদেরকে কোন বার্তা প্রেরণ করেছেন। বার্তা প্রেরণ করে প্রত্যেককে নিজ নিজ ধর্ম রক্ষার দায়িত্ব বর্তে দিয়েছেন। সে কারনে লড়াই করতে তারা বাধ্য হচ্ছে। তারা লড়ছে তাদের বিধাতার কারনে। নিজেদের কারনে নয়। লিখন জানে না তাদের ম্যাসেঞ্জার তাদেরকে কি বার্তা পৌঁছে দিয়েছে। কেবল ধারণা পোষন করছে।

দু'টো পিপড়ে এখন পানিতে ভাসছে। কিন্তু তারা একে অন্যকে জাঁপটে ধরে লড়াইটা চালিয়ে যাচ্ছে। কি সাংঘাতিক হতে পারে এ ঘৃণাবোধ! একে অন্যের প্রতি তারা কি বা কোন বোধ থেকে এমনতর বিদ্বেষ পোষন করছে? হিংসা কিংবা ঘৃণা কিংবা নিজের প্রাপ্তির লোভের কারনে? কিংবা অতীত কোন কৃতকর্মের প্রতিশোধপরায়নতার কারনে? অথবা সম্ভাব্য ভবিষ্যত বিপদ থেকে নিজেদের ও প্রজন্মকে রক্ষার জন্য তারা এ লড়াই করছে? বাঁচার জন্য যে লড়াই, সে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে সম্ভাব্য দীর্ঘ জীবনকে তারা আজই বিসর্জন দিতে চলেছে। কেউ কাউকে ছাড়ছে না। লিখন তাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারছে না। প্রকৃত ঘটনা জানেনা। কেবল ধারণা পোষন করছে।

যুদ্ধ



পিপড়ে দু'টো জানেনা যে ওপর থেকে কেউ তাদেরকে দেখছে। লিখনের কাছে তাদের এ যুদ্ধের আদৌ কোন মূল্য নেই। লিখনের কেবল তাদের এ অপ্রয়োজনীয় কান্ড দেখে কষ্ট হচেছ। তারা যা কিছু করছে সব নিজেদের জ্ঞানানুপাতে করছে। লিখন জানেনা যে পিপড়েগুলোকে সে যে দেখছে পিপড়েরা তা বুঝতে পারছে কিনা? কিংবা তারা কি তাকে দেখছে?

লিখন ভাবছে- পিপড়ে দু'টোকে সে ফু দিয়ে দুরে সরিয়ে দিয়ে এ যুদ্ধের সমাপ্তি টেনে দিতে পারে। একটি ফু দিয়ে পানিতে ঢেউ তুলে তাদের দু'জনকে ডুবিয়েও মেরে ফেলতে পারে। এমনকি এক আঙ্গুলে তুলে এনে পা দিয়ে মাটিতে পিশে মেরেও ফেলতে পারে। পিপড়ে দু'টো কি তা অনুমান করতে পারে?

লিখনের মস্তিস্কের তাৎক্ষনিক একটি ইচ্ছে বা চাওয়াই ওদের ভাগ্য নির্ধারণ করে দিতে পারে। পিপড়েগুলো কি সেটি বুঝতে পারে?

লিখন নিজেও নিশ্চিত না যে তার নিজের সেই তাৎক্ষনিক ইচ্ছে বা চাওয়াটি কিভাবে নির্ধারণ হবে। অথবা কে নির্ধারণ করে দেবে? লিখনের একটি ইচেছ বা তাৎক্ষনিক সিদ্ধান্তই পিপড়েদেরকে শান্তির পথে নিয়ে যেতে পারে, কিংবা ধ্বংসের দিকেও নিয়ে যেতে পারে।

লিখন বুঝতে পারছে না যে তার মত এমন আরও কোন অতিলিখন কিংবা মহালিখন আছে কিনা- যে ওপর থেকে সবকিছু অবলোকন করছে, অথচ মানবসমাজ তা বুঝতে পারছে না।

"এবং আমরা (জ্বিন জাতি) নিশ্চিত নই যে, পৃথিবীবাসীদের জন্য কোন অমঙ্গল অপেক্ষা করছে, নাকি পালনকর্তা তাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করার ইচ্ছে রাখেন।" (আল-কোরআন ৭২:১০)

"নিশ্চয়ই! আমি মানুষকে এক পরিবেশের মধ্যে সৃষ্টি করেছি, সে কি মনে করে যে, তার ওপর কারও কোন ক্ষমতা নেই? ... সে কি মনে করে তাকে কেউ দেখছে না?" (আল-কোরআন ৯০:৪-৭)

"তুমি তোমার বর্তমান চক্ষু দ্বারা আমাকে (আমার বিশ্বরূপ) দেখতে পারবে না। তাই আমি তোমাকে দিব্য দৃষ্টি দান করছি, যার দ্বারা তুমি আমার গুপ্ত ঐশ্বর্য্য দেখতে পারবে।" (গীতা ১১:৮)

লিখন বিশ্বাস করে- নিশ্চয়ই! এমন কেউ আছে, যে ওপর থেকে সবকিছু অবলোকন করছে, অথচ মানবসমাজ তা জানতে কিংবা বুঝতেও পারছে না। (লেখা ২০১৩)

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী

(Aboriginals of Chittagong Hill Tracts)

আদিবাসী দিবস উপলক্ষে ক'দিন ধরে দেশের আদিবাসীদের নিয়ে টেলিভিশন চ্যানেলগুলিতে আলোচনা বেশ জমে উঠেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের অধিকার নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। ভাবছি, তবে কি আমাদের কোন আদি নেই! আমরা কি মাঝখান থেকে হঠাৎ এসে পরেছি? আমাদের আদি কারা? আমাদের আদি নিবাস কোথায়? বর্তমানে সেখানে কাদের বসবাস? আমাদের অধিকারের কি হবে?

সভ্য সমাজে মানুষ যখন মানুষ হিসেবে পরিচিত; স্থান-কাল-পাত্রভেদে মানুষ যখন মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে রত, তখন আদিবাসী পরিচিতি একটি গোষ্ঠীকে মানসিকভাবে ছোট করে রাখে। যারা আদিবাসী হিসেবে নিজেদের পরিচিতি পেতে চায়- বস্তুত আইনের মার-প্যাঁচে তারা আসলে কিছু সুযোগ-সুবিধা পেতে চায়; যে মার-প্যাঁচ দিয়ে তাদেরকে তাদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। আসলে তাদেরও প্রয়োজন মানুষ হিসেবে সকল অধিকার।

বৃহৎ ও শক্তিশালী আদিবাসী দ্বারা ক্ষুদ্র ও দুর্বল আদিবাসী নিগৃহীত হচ্ছে, এটিই হচ্ছে সত্য কথা। কিন্তু এ সমস্যাতো শুধু ক্ষুদ্র আদিবাসীদেরই নয়? সমতলে যারা 'আদিবাসী না' হিসেবে পরিচিত, সেখানেও মানুষ হায়নার আক্রমনের শিকার হচ্ছে প্রতিনিয়ত। সমস্যাটি শুধু আদিবাসীদের নয়। পাহাড়-সমতল সর্বত্র যেটি প্রয়োজন মানুষরূপি হায়না নয়, মানুষের ভেতরের হায়নাত্ব দুরীকরণ। প্রয়োজন দুষ্টদের সুযোগ গ্রহণের সুবিধার পথ রুদ্ধ করে দেয়া।



কেবল একটি শব্দ নিয়ে তুমুল বিতর্ক হচ্ছে। 'আদিবাসী'। শব্দের পরিবর্তনই কি সমস্যার সমাধান এনে দেবে, যদি না মানুষের চরিত্রের পরিবর্তন হয়? শব্দ

নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে, অথচ বিতর্কের পেছনের মূল কারন কেউই আলোচনা করছে না। নয়ত আলোচনা তুলতে পারছে না। আদিবাসী পরিচয়ে আদিবাসীদের সুবিধা কি, আর আদিবাসী পরিচয় স্বীকার না করাতে অন্যের সুবিধা কি- তা নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন। আসল কথা হচ্ছে কেউ ঠকছে, কেউ ঠকাচ্ছে। সেটি যে ফরমে বা যে কোন অজুহাতের যুক্তিতেই হোক না কেন। লাভ-লোকসান এর পাল্লা যখন সমান হচ্ছে না, তখন সেখানে অন্যায় ঘটছে। সভ্য মানুষ অন্যায়ের পক্ষ নিতে পারে না।

সমাধান হওয়া প্রয়োজন। আলোচনা প্রয়োজন। তবে আলোচনার নামে আলোচনার দীর্ঘায়ন বঞ্চিতকে বঞ্চিতই রাখে। সুবিধাভোগী জীবন অতিবাহিত করে সুন্দরভাবে। এগুলি অন্যায়। যার ফলাফল সুবিধাভোগীরা তাদেরই প্রজন্মের কাঁধে রেখে যাচ্ছে।

মধ্যস্ততাকারী অনেকে আবার সমস্যার সমাধানের চেয়ে প্রকল্পকে দীর্ঘ জীবন দান করতে ইচ্ছুক। এতে অবশ্যই কিছু সুবিধা আছে। কিংবা একটির সমাধান দেখিয়ে, নতুন ফরমে নতুন সমস্যা সৃষ্টি করে বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি করার সুযোগ আছে কিনা- সেটিও তলিয়ে দেখা দরকার।

বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী সমস্যাটি মোটেও ক্ষুদ্র সমস্যা নয়। এটি এক ঘুমন্ত ফোঁড়া। অর্থের বরাদ্দ বৃদ্ধি সাপেক্ষে সময়ে জেগে উঠবে। এ সমস্যার সাথে চেইন আকারে অপরাপর অনেকগুলি সমস্যার উৎপত্তির সম্ভাবনার বিষয়টি জড়িয়ে আছে।

এটির সাথে জড়িত রোহিঙ্গাদের আদি বাসস্থান কোথায় সে প্রশ্নটি, এটির সাথে জড়িত পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের ভাষা ও স্বাধীনতার প্রশ্ন, এটির সাথে জড়িত পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের বেড়িয়ে আসার যৌক্তিকতা, এটির সাথে জড়িত বৃটিশ বিতারণের যৌক্তিকতা ইত্যাদি। যা পরবর্তীতে একটির পর একটি ধীরে ধীরে প্রকাশ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে কোন বৃহৎ এর ইচ্ছে সাপেক্ষে। (লেখা ২০১২)

ধর্মযুদ্ধ

(Holy War)

সেদিন সপ্ত আসমানে ছিলাম। হঠাৎ চোখ গেল পৃথিবীর দিকে। আচমকা যায়নি। চোখে পরার মত কারন ছিল। কিছু নির্দেশক পূর্বেই ঠিক করে দেয়া ছিল। সে ইনডিকেটরে ব্যাতিক্রম কিছু ধরা পরেছে। পৃথিবীর দিকে তাই ফিরে তাকাতে হলো। পৃথিবীতে ক্ষুদ্র একটি লালচে রং ধরা পরেছে। নীল-সবুজের মাঝে হঠাৎ এ লালচে রং কেন? দৃষ্টি ফেরালাম।

ক্ষুদ্র। অতি ক্ষুদ্র। একটি বিন্দু মাত্র। আমার অবস্থান থেকে সাধারণ চোখে দেখা যায় না পৃথিবীকে। দৃষ্টিটাকে এ্যাডজাষ্ট করছি। একটু একটু করে বড় দেখা যাচ্ছে পৃথিবী। মহাসাগরগুলি নীল হয়ে ভেসে উঠছে। বনাঞ্চলগুলি সবুজ। সর্বশেষ যে চিত্রটি সেইভ করেছিলাম সেখাতে লাল বিন্দুগুলি এত বেশী ছিল না। এখন জায়গায় জায়গায় রক্তিম বিন্দুগুলি দেখতে পাচ্ছি।



মানব সমাজে রক্তক্ষয়ি সংঘর্ষ চলছে। এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে, আমার অবস্থান থেকেও তার আলামত ধরা পরেছে। কি কারন এই সংঘর্ষের?

কখনও মর্যাদার। কখনও ক্ষমতার। কখনও জৌলুসের। কেবলই প্রাপ্তি আর অধিক প্রাপ্তির লড়াই। যে প্রাপ্তি বেশীরভাগ মানুষের জীবনেই আসে তার শেষ জীবনে। চলে যাবার কালে অর্জিত সে উদ্বৃত্ত সে নিয়েও যেতে পারে না। আবার যাদের জন্য করছে বা রেখে যাচেছ বলে ভাবে- জানে না তারাই তাকে শেষ দংশনটি করবে কি-না।

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির মধ্যেও রয়েছে তোমাদের শত্রু (যারা তোমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত করতে পারে), অতএব তাদের বিষয়ে সতর্ক থেক। ...।" (আল-কোরআন ৬৪:১৪)

খুব কম ভাগ্যবান ছাড়া বেশীরভাগ মানুষের অতি অর্জন কোন শান্তি বয়ে আনে না। অথচ যত অশান্তি সৃষ্টি এই একটু শান্তির আশায়। আত্মার ক্ষণকালের অনুভূত অতৃপ্তির বেদনায়।

মানুষ তো পিপড়ে নয় যে সে অকারণে লড়ছে। যদিও পিপড়েরাও অকারণে লড়ে না। তাদেরও লড়াইয়ের কারন থাকে। তাদের কারনটি তারা বোঝে। আর জানে বিশ্ব-ব্রহ্মান্ডের সমন্বয়কারী।

মানুষের লড়াই করার পেছনেও কারন আছে। আছে যুক্তি। সে লড়াই করে নীতির জন্য। কোন আদর্শের জন্য। মুখ ফুটে বলে না। বলে আদর্শের জন্য। কিংবা প্রজা মঙ্গলের জন্য। পেছনে আছে স্বার্থ। মুখ ফুটে বলে না। বলে ধর্মের জন্য। কখনও দেশের জন্য। কখনও ভাষার জন্য। নানান কারনে মানুষ লড়াই করে। মূল কারন একটিই- 'স্বার্থ'। মুখ ফুটে বলে না। কেননা সত্যটি ঢেকে রাখতে চায়। যেটা ঢেকে রাখতে চায় সেখানে কিন্তু আছে। চরম সত্যটি থাকে আড়ালে লুকিয়ে। পেছনে স্বার্থ থাকলেও একটা ন্যায়-অন্যায়ের বোধও কাজ করে। এটিও সত্য।

যুদ্ধ-সংগ্রাম-জেহাদ-লড়াই এগুলো কি অপ্রয়োজনীয়? ভাল নাকি মন্দ? মানুষ মাত্রই বোঝে যে যুদ্ধ কখনই কাম্য হতে পারে না। সমস্যার সমাধানে এটি কখনই উত্তম পন্থা নয়। এক কথায় এটি মন্দ। এর ফলাফল ভয়াবহ!

"তোমাদের ওপর যুদ্ধ নির্দেশিত হয়েছে যদিও এটি তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। কিন্তু হতে পারে যে, তোমরা কোন একটি বিষয়কে অপছন্দ করছো কিন্তু সেটি তোমাদের জন্য কল্যাণকর, আবার হতে পারে যে কোন একটি বিষয় পছন্দ করছো, অথচ সেটি তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ জানেন তোমরা জান না।" (আল-কোরআন ২:২১৬)

সত্যি বলতে যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা আছে। কেননা সমস্যা সমাধানে এটিই একমাত্র সর্বশেষ ভাল পন্থা। এটি খারাপ হতে পারে না প্রয়োজনের কারনে। প্রয়োজন মানুষই অনুভব করে। সেভাবে মানুষ সৃষ্ট। কাউকে বলে দিতে হয় না সে প্রয়োজনের কথা। তথাপি সমাজে বহু রকমের মানুষ আছে যারা নিজেরা সে

প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। যে বিপদ একদিন নিজেকেও গ্রাস করবে, সে দুরদৃষ্টির অভাবে মানুষ সেটিকেও এড়িয়ে চলতে চায়। তাই সর্বজনগ্রাহ্য একজন দ্বারা দিক-নির্দেশনা দেয়া প্রয়োজন। উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন। যুদ্ধ-জেহাদ-সংগ্রাম এগুলিকেও প্রয়োজনের তাগিদে তাই উৎসাহিতও করা হয়েছে। বলা হচ্ছে,

"লড়াই কর আল্লাহর পথে (সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের পথে), তাদের বিরুদ্ধে- যারা লড়াই করে তোমাদের বিরুদ্ধে (সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের বিপক্ষে), কিন্তু বিরোধীতার সূত্রপাত কর না। নিশ্চয়ই! আল্লাহ সীমালংঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।" (আল-কোরআন ২:১৯০)

"পরকালের প্রত্যাশায় যারা পার্থিব জীবনকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত, তাদেরকে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে দাও। যে আল্লাহর পথে লড়াই করে, সে মৃত্যুবরণ করুক কিংবা বিজয় অর্জন করুক, তার প্রতি আমি বিশাল পুরস্কার বর্ষন করবো।" (আল-কোরআন ৪:৭৪)

"হে কুন্তি-পুত্র! হয় তুমি যুদ্ধ ক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করবে এবং স্বর্গ লাভ করবে, নয়তো তুমি বিজয় অর্জন করবে এবং পার্থিব সুখ অর্জন করবে। অতএব জেগে ওঠ এবং সংকল্প নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও।" (গীতা ৩:৩৭)

"হে নবী! বিশ্বাসীদের যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ কর। তোমাদের মধ্যে যদি বিশজন দৃঢ়-সংকল্প যোদ্ধা থাকে, তারা দু'শ জনকে জয় করতে পারবে। ...।" (আল-কোরআন ৮:৬৫)

"ক্ষত্রিয় হিসেবে তোমার যে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব, তোমার জানা উচিৎ যে সে হিসেবে ধর্ম রক্ষার্থে (ন্যায় রক্ষার্থে) যুদ্ধ ব্যাতিত তোমার আর কোন বড় দায়িত্ব নেই; অতএব এ বিষয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কোন অবকাশ নেই।" (গীতা ৩:৩১)

"অজ্ঞতার কারনে তোমার ভেতরে যে সন্দেহের আবির্ভাব হয়েছে, জ্ঞান নামক অস্ত্র দ্বারা তাকে ছিন্ন কর। যোগ অস্ত্রে সজ্জিত হও .. উঠে দাড়াও এবং যুদ্ধ কর।" (গীতা ৪:৪২)

"যদি আল্লাহ মানবজাতির একদলকে দিয়ে অপর দলকে প্রতিহত না করতেন, তবে এ পৃথিবী অন্যায়ে ছেঁয়ে যেত।" (আল-কোরআন ২:২৫১)

শান্তির জন্য যে ধর্ম, সে ধর্মই যুদ্ধকে উৎসাহিত করছে। শুনতে বেমানান মনে হয়। অথচ এ যুদ্ধও শান্তির জন্য। পৃথিবীতে মন্দ মানুষ বা অন্যায়-অত্যাচারকারী মানুষ না থাকলে হয়তোবা যুদ্ধের আর প্রয়োজন হত না।

"কিভাবে তোমরা আল্লাহর পথে (সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের পথে) যুদ্ধ না করে থাকতে পারবে, যখন দুর্বল পুরুষ-নারী ও শিশুরা এই বলে ক্রন্দন করছে যে, 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর, যেখানের অধিবাসীরা অত্যাচারী। ওহ! তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য কোন সাহায্যকারী প্রেরণ কর। তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য কোন রক্ষাকারীকে প্রেরণ কর।" (আল-কোরআন ৪:৭৫)

প্রশ্ন হচেছ- কখন এই যুদ্ধের প্রয়োজন? যুদ্ধ প্রয়োজন ধর্ম রক্ষার্থে। কিন্তু সে সত্যটি আলোচনা করা আজ বিপদজনক। কেননা ধর্মের মর্ম যারা বুঝতে চায় না, ধর্মের ঝান্ডা হাতে তারাই আজ অধিক উদ্দিপ্ত। তাদের সে উদ্দিপনাকে কাজে লাগাচ্ছে আপাতদৃষ্টে সফল কিছু বুদ্ধিমান মানুষ।

যুদ্ধ কখন শুরু হয়? কে শুরু করে? যে আক্রমনকারী সে কখনও যুদ্ধ শুরু করে না। লোভি-অপরাধী আক্রমনকারী সে তো তার স্বভাবসূলভ কাজ করে। তার অপরাধ মেনে নিলে যুদ্ধের প্রশ্ন আসে না। যুদ্ধ তখনই হয় যখন কোন অন্যায়কে প্রতিহত করার চেষ্টা করা হয়। আর অন্যায়কে প্রতিহত করা মানুষের নিজের অস্তিত্ব তথা সৃষ্টির সুরক্ষার জন্যই সবচেয়ে বড় দায়িত্ব ও কর্তব্য। এটিই ধর্মের মূল।

ন্যায়কে সমুন্নত রাখাই ধর্ম। ন্যায়কে সমুন্নত রাখার জন্য যে যুদ্ধ সে যুদ্ধই ধর্মযুদ্ধ। যে ন্যায়কে সমুন্নত রাখার জন্য যুদ্ধ করে সেই ধর্মের স্বপক্ষে বা কারনে বা ধর্ম রক্ষার্থে যুদ্ধ করে। সব যুদ্ধই ধর্ম যুদ্ধ। কেননা সব যুদ্ধেই একটা ন্যায়ের পক্ষ থাকে। যে ন্যায়ের পক্ষে থাকে সে-ই ধর্মের পক্ষে থাকে। তার জন্যই যুদ্ধ হচ্ছে- 'ধর্ম যুদ্ধ'।

হিন্দু-মুসলিমের যুদ্ধ ধর্ম-যুদ্ধ নয়। মুসলিম-খ্রীষ্টানের যুদ্ধ ধর্ম-যুদ্ধ নয়। সম্ভাব্য বৌদ্ধ-মুসলিমের যুদ্ধও ধর্ম যুদ্ধ নয়। এগুলি আপাত সফল মানুষ বা জাতির দ্বারা সৃষ্ট যুদ্ধ। ভূলভাবে শেখানো হয় বলে পৃথিবীকে অশান্ত রাখা সম্ভব হয়। সেই ফাঁকে একটু লাভবানও হওয়া যায়। কিন্তু সত্যিকার অর্থে কি লাভ তাতে? কার জন্য? কয়দিনের জন্য? এখানেই বুদ্ধিমান মানবজাতির নির্বুদ্ধিতা।

যারা ভূল দর্শনের হোতা তারাও সেসব বোঝে। কিন্তু যে খেলার প্রতিযোগীতায় তারা নিজেদেরকে নিয়ে গেছে- সেখানে মর্যাদা বিসর্জন দিতে না পারার শারিরীক-মানসিক ও সামাজিক অসামর্থতা তাদেরকে বারবার এ পথে টেনে নিয়ে যায়।

সকল মানুষের ধর্ম এক। হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান নয়। এসবগুলির আগমনের পূর্বেও পৃথিবীতে মানুষ ছিল। ভাল-মন্দ মানুষ ছিল। মন্দকে প্রতিহত করা ও ভালকে রক্ষা করার জন্য ধর্মের আবির্ভাব। সত্যকে সমুন্নত রাখা মানুষের ধর্ম। ন্যায়কে সমুন্নত রাখা মানুষের ধর্ম। এগুলোকে সমুন্নত রাখার যুদ্ধই ধর্ম যুদ্ধ। এ যুদ্ধে সব সময় তলোয়ার কিংবা কামান প্রয়োজন হয় না। সত্য ও ন্যায়ের স্বপক্ষে এবং অসত্য ও অন্যায়ের বিপক্ষে আমৃত্যু চিন্তায়-চেতনায়, সমর্থনে ও কর্মে সোচ্চার থাকাই ধর্মযুদ্ধ। এ যুদ্ধ যেমন বাইরে হতে পারে। হতে পারে নিজের সাথে নিজের। (লেখা ২০১৩)

আরাকান

(Arakan)

দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ায় অবস্থিত ভারত উপমহাদেশের অন্তর্গত বার্মা দেশটি বর্তমানে 'মায়ানমার' নামে পরিচিত। দেশটি অনেক জাতিগোষ্ঠী নিয়ে গঠিত হলেও সকল জাতিগোষ্ঠীকে প্রধানত আটটি ভাগে ভাগ করে দেখান হয়ে থাকে।

সাতটি অঞ্চল ও সাতটি ষ্টেট বা রাজ্য নিয়ে মায়ানমার গঠিত। অঞ্চলগুলিতে প্রধানত বামাররা বসবাস করে। ষ্টেটগুলির এক একটিতে এক একটি জাতিগোষ্ঠী বসবাস করে।



বামাররা হচ্ছে বার্মার সর্ববৃহৎ ও শক্তিশালী জাতি। মায়ানমারের মোট জনসংখ্যার ৬৫ থেকে ৭০ ভাগ হচ্ছে এই বামার জনগোষ্ঠী। এদের ভাষা বার্মিজ। এটিই মায়ানমারের অফিসিয়াল ভাষা। মূলত বামাররাই বার্মিজ নামে পরিচিত। যদিও মায়ানমারের সকল নাগরিকই জাতিগোষ্ঠী নির্বিশেষে 'বার্মিজ' নামে অভিহিত হয়ে থাকে। বামারদের ছাড়া অপর সকল জাতিগোষ্ঠী মিলে হচ্ছে মোট জনসংখ্যার মাত্র ৩০ থেকে ৩৫ ভাগ।

'রাখাইন' ষ্টেট মায়ানমারের পশ্চিম উপকুলবর্তী একটি রাজ্য। আয়তনে চৌদ্দ হাজার বর্গমাইলের কিছু বেশী। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে রাখাইন রাজ্য 'আরাকান' নামে পরিচিত ছিল।

আরাকানের পশ্চিমে পুরোটাই বঙ্গোপসাগর এবং উত্তর-পশ্চিমে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম অঞ্চল। আরাকান পর্বতমালা দ্বারা আরাকান বা রাখাইন রাজ্য পূর্বদিকে বার্মার মূল ভূ-খন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন। রাখাইন রাজ্যের বর্তমান রাজধানী 'সিতওয়ে' যা পূর্বে 'আকিয়াব' নামে পরিচিত ছিল।

রাখাইন জাতি রাখাইন রাজ্যে বা আরাকানের সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠী। বস্তুত রাখাইনরা বার্মার 'পিউ' ষ্টেটের একদল উপজাতি। নবম শতাব্দিতে তারা আরাকান পর্বতমালা পেরিয়ে রাখাইনে আগমন করে। তারা 'লেমরো' নদীকে ঘিরে বেশকিছু শহর গড়ে তোলে। মায়ানমারের মোট জনসংখ্যার ৫ থেকে ৬ শতাংশ হচ্ছে রাখাইন জনগোষ্ঠী। যদিও এর সুনির্দিষ্ট কোন পরিসংখ্যান নেই।

১৪০৬ সালে রাখাইন রাজ্য বার্মা দ্বারা আক্রান্ত হয়। বার্মার সৈন্যবাহিনী রাখাইন শহরগুলিতে প্রবেশ করে। সে সময় রাখাইনরা বাধ্য হয় বাংলার সহায়তা নিতে এবং সেখানে আশ্রয় নিতে।

বাংলাদেশের দক্ষিন-পূর্ব অঞ্চল বা পার্বত্য চট্টগ্রামে এদের একটি দল ষোড়শ শতক থেকে বসবাস করে আসছে। এরা 'মার্মা' বা 'মগ' নামে পরিচিত। চট্টগ্রাম অঞ্চল যখন আরাকান রাজ্যের অধীন ছিল তখন থেকে এরা এ অঞ্চলে বসবাস করে আসছে। রাখাইনরা ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যেও বিস্তার লাভ করে। ত্রিপুরাও তখন আরাকান রাজ্য দ্বারা শাসিত হতো। সেখানে তারা 'মগ' নামে পরিচিত হলেও বাংলাদেশে 'মার্মা' নামে অভিহিত।

ঐতিহাসকিভাবে আরাকান একটি স্বাধীন রাজ্য হিসেবে পরিচিত। খ্রীষ্টিয় চতুর্থ শতকে আরাকান একটি রাজ্য হিসেবে ভারত উপমহাদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। রাজ্য হিসেবে আরাকান প্রতিষ্ঠা পায় মূলত ভারতীয়দের দ্বারা। দশম শতাব্দীতে বাংলার চন্দ্র রাজবংশ দ্বারা আরাকান শাসিত হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে আরাকান ভারতেরই অন্তর্ভূক্ত ছিল, মায়ানমারের নয়।

আরাকানের আদি বাসিন্দা হিসেবে 'রোহিঙ্গা' জনগোষ্ঠী সহস্র বছরাধিককাল বসবাস করে আসছে। তবে আরাকানের মূল বা আদি বাসিন্দা কারা তা এখন সম্ভবত নিশ্চিত করে বলা কঠিন। কেউ কেউ মনে করে রাখাইন জনগোষ্ঠী খ্রীষ্টপূর্ব তিন হাজার বছর পূর্ব থেকে সেখানে বসবাস করে আসছে। যদিও দাবীটি প্রতিষ্ঠিত নয়।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে দেশটিতে অনেক জাতিগোষ্ঠী বসবাস করে। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী আরাকানের আদি বাসিন্দারূপে চিহ্নিত হলেও দেশটিতে প্রধান যে আটটি জাতিগোষ্ঠীর তালিকা প্রনয়ন করা হয়েছে সে তালিকায় তারা অন্তর্ভূক্ত নয়। রোহিঙ্গাদের নিজস্ব কোন ভূ-খন্ড বা দেশ নেই।

আরাকানে প্রায় দশ লক্ষ রোহিঙ্গার বসবাস। 'দক্ষিন আরাকানে' রাখাইন জনগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও 'উত্তর আরাকানে' রোহিঙ্গা মুসলিম জনগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ। হিন্দু সম্প্রদায় তাদের মধ্যে সংখ্যালঘু।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে রোহিঙ্গাদেরকে 'চিটাগোঙ্গীয়ান' হিসেবে মনে করা হতো। তাদের এই বাঙ্গালী পরিচিতিটা ১৯৯০ সালের পূর্ব পর্যন্ত বিতর্কিত ছিল না। রোহিঙ্গারা নিজেদেরকে রোহিঙ্গা নামের পরিবর্তে আরাকানী মুসলিম নামে পরিচয় দিতে অধিক স্বাচ্ছন্দ বোধ করে।

বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে যত নিগৃহীত জাতিগোষ্ঠী আছে রোহিঙ্গারা তাদের মধ্যে অন্যতম। তাদের স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার নেই। শিক্ষা, চাকুরি সকল সুযোগ-সুবিধা থেকে তারা নিজ দেশেই বঞ্চিত। তারা যে দেশের বাসিন্দা সে দেশই তাদেরকে নাগরিকত্ব দিতে অস্বীকার করে আসছে। এমনকি তারা জাতিগতভাবেও রোহিঙ্গাদের নির্মূল করার চেষ্টায় লিপ্ত বলা যেতে পারে। অপ্রকাশিত হলেও সত্য যে সেখানে গণহত্যা চলছে। রোহিঙ্গাদের প্রতি করা নির্যাতন মানবতা বিরোধী অপরাধের সামিল। মায়ানমার দেশটি রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে সে দেশ থেকে সম্পূর্ণরূপে উৎখাতের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

মায়ানমার সরকার মনে করে রোহিঙ্গারা পার্শ্ববর্তী দেশ বাংলাদেশ থেকে আগত অবৈধ অভিবাসী। তারা রোহিঙ্গাদেরকে রোহিঙ্গা নামের পরিবর্তে বাঙ্গালী নামে অভিহীত করতে চায়। অবশ্য এর কিছু ঐতিহাসিক পটভূমি আছে যা মূলত বিতর্কের সৃষ্টি করেছে।

বঙ্গপোসাগরের সাথে দীর্ঘ উপকূল থাকায় বার্মা মূলত আরাকানের মাধ্যমেই বহু পূর্ব থেকেই বহির্জগতের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে এসেছে। সমুদ্র পথে বাণিজ্য ও সংস্কৃতি বিনিময়ের এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয় আরাকান সেই মৌর্য আমল থেকে অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ৩২২-১৮৭ অব্দ থেকে।

আরবের বণিকেরা বঙ্গপোসাগর দিয়ে খ্রীষ্টিয় তৃতীয় শতক থেকে এখানে বাণিজ্য করতে আসত। তারা ভারত ও চীনের সাথে বাণিজ্যের জন্য এ পথটিকে ব্যাবহার করত। কেননা 'সিল্ক রোড' এর দক্ষিনের একটি অংশ ভারত, বার্মা ও চীনকে সংযুক্ত করেছে সেই 'নিওলিথিক' পেরিয়ড বা 'নব্য প্রস্তর' যুগ থেকে অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ১৫,০০০-২,০০০ অব্দ পর্যন্ত।

অষ্টম শতাব্দী থেকে আরবের বণিকেরা বাণিজ্যের পাশাপাশি ধর্ম প্রচারের কাজ শুরু করে। স্থানীয় অনেককে তারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে তোলে। ধর্ম প্রচার ছাড়াও তারা স্থানীয় মেয়েদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং এখানে বসবাস করতে শুরু করে। এভাবে আরাকানে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আরাকানদের সাথে মুঘল ও পর্তুগীজদেরও যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৪০৬ সালে বার্মা যখন রাখাইন রাজ্য আক্রমন করে তখন আরাকানের 'ম্রাউক-উ' বংশের রাজা 'মীন স মন' বাংলায় আশ্রয় গ্রহন করে। সে সময়ে বাংলার সুলতান ছিল 'গিয়াসুদ্দীন আযম শাহ'। মীন স মন চব্বিশ বছর বাংলায় নির্বাসিত জীবনযাপন করে।

১৪৩০ সালে বাংলার সুলতানাতের সাহায্য নিয়ে রাজা মীন স মন আরাকান পুনরুদ্ধার করে। ম্রাউক-উ শহরে তারা রাজধানী প্রতিষ্ঠা করে। আরাকান এ সময়ে বাংলার সুলতানাতের আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়। উত্তর আরাকানের কিছু অংশে বাংলার সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে নিতে হয়। সে সময়ে রাজা মীন স মন এর সাথে বাঙ্গালী মুসলমানেরা আরাকানে প্রবেশ করে এবং বসতি স্থাপন করে। ম্রাউক-উ রাজবংশ ১৪২৯ সাল থেকে ১৭৮৫ সাল পর্যন্ত আরাকান শাসন করে।

স্বাধীন রাজ্য ফিরে পাওয়ার পরেও ম্রাউক-উ বংশের রাজারা মুঘল ও বাংলার সংস্কৃতিকে ধারণ করে রাখে। তারা ইসলামী টাইটেল ব্যাবহার করে। যেমন মীন স মন (১৪৩০-১৪৩৪) 'সুলায়মান শাহ' নাম ধারণ করে। পরবর্তীতে অবশ্য তার উত্তরসূরীরা বাংলার কর্তৃত্ব থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। মীন খাই বা আলী খাঁন সর্বপ্রথম বাংলার কর্তৃত্ব অস্বীকার করে।

বাংলার সুলতান জালালুদ্দীন মোহাম্মদ শাহ (১৪১৫-১৪৩৩) এর মৃত্যুর পর তৎকালীন ম্রাউক-উ বংশের আরাকান রাজা বাংলার সুলতান রোকনুদ্দীন বারবাক শাহকে পরাজিত করে। ১৪৫৯ সালে চট্টগ্রাম দখল করে নেয়। সে সময় থেকে চট্টগ্রাম আরাকান রাজ্যের অধীনে চলে যায়।

আরাকানের শাসকেরা মুঘল-বাংলাতেও তাদের অভিযান অব্যাহত রাখে। ১৬২৫ সালে তারা ঢাকায় অভিযান পরিচালনা করে। তারা পর্তুগীজদের সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক বৃদ্ধি করে। সমুদ্র পথে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে উন্নতি অর্জন করে। মুঘলরা আরাকানীদের আক্রমনকে আরাকানী-পর্তুগীজি জলদস্যুতারূপে বিবেচনা করতো।

১৬৬০ সালে বাংলার রাজ্য শাসক মুঘল সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র, দিল্লীর ময়ূর সিংহাসনের দাবীদার শাহজাদা শাহ সূজা, ছোট ভাই আওরঙ্গজেবের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সপরিবারে আরাকানে পালিয়ে যায়। আরাকানের ম্রাউক-উ রাজার আশ্রয়প্রাপ্ত হয়। সূজার সাথে আগতরা আরাকানে থেকে যায় এবং রাজকীয় বাহিনীতে যোগদান করে। বার্মা কর্তৃক আরাকান দখলের পূর্ব পর্যন্ত তারা সেখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এদিকে আরাকানী-পর্তুগীজি জলদস্যুদের দৌরাত্ব দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে থাকে। মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব বাংলার সুবেদার শায়েস্তা খাঁনকে জলদস্যূদের দমন করার নির্দেশ প্রদান করেন।

১৬৬৬ সালে শায়েস্তা খাঁন ছয় হাজার সৈন্য ও ২৮৮টি যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে ম্রাউক-উ রাজবংশের হাত থেকে চট্টগ্রাম পুনর্দখল করে। মুঘল অভিযান এ সময়ে 'কালাদান' নদী পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। কালাদান নদী ভারতের মিজোরাম এবং মায়ানমারের চীন ও রাখাইন রাজ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এটি ভারত ও বার্মার আন্তর্জাতিক সীমারেখা সৃষ্টি করেছে। মুঘল প্রশাসন এ সময় আরাকানের উত্তরাঞ্চলকে তাদের অধীনে নিয়ে আসে। আরাকানের মুসলিম জনগোষ্ঠী এ সময় উত্তরাঞ্চলে সমবেত হতে থাকে।

সপ্তদশ শতকে ব্যাবসা-বাণিজ্য ও কৃষি কাজের সন্ধানে আরাকানে বাঙ্গালীদের প্রবেশ বৃদ্ধি পায়। অনেকে সৈনিক হিসেবেও যোগদান করে। বিখ্যাত কবি 'আলাওল' এ সময়ের কবি।

বার্মার সর্বশেষ 'কনবঙ' রাজবংশ ১৭৮৫ সালে আরাকান দখল করে। প্রায় ৩৫০ বছর আরাকান শাসন করার পর ম্রাউক-উ বংশের পতন ঘটে। ১৭৯৯ সালের মধ্যে রাখাইন রাজ্যের প্রায় ৩৫,০০০ জনগোষ্ঠী এ সময় বামারদের নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পেতে পার্শ্ববর্তী ব্রিটিশ শাসিত বাংলার চট্টগ্রাম অঞ্চলে আশ্রয় নেয়।

'কনবঙ' রাজবংশ ১৭৫২ সাল থেকে ১৮৮৫ সাল পর্যন্ত বার্মায় রাজত্ব করে। ১৮২৪ সাল থেকে ১৮৮৫ সাল পর্যন্ত ছয় দশক সময়ে বার্মার সাথে ব্রিটিশদের তিন-তিনটি ইঙ্গ-বার্মিজ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে বার্মা বৃটিশদের কাছে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। প্রথম ইঙ্গ-বার্মিজ যুদ্ধে পরাজয়ের মধ্য দিয়েই আরাকান বার্মিজদের হাতছাড়া হয়ে যায়। বার্মিজ রাজা ১৮২৬ সালে ব্রিটিশ ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর

কাছে আরাকান সমর্পন করে। ব্রিটিশরা যখন আরাকান দখল করে সে সময়ে বামাররা রাখাইনদের বিতাড়িত ও নির্বাসিত করে।

'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি' ব্রিটিশদের সর্ববৃহৎ ঔপনিবেশিক সাবডিভিশন। ব্রিটিশ ইষ্ট-ইন্ডয়া কোম্পানি বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিকে আরও সম্প্রসারণ করে আরাকান পর্যন্ত বর্ধিত করে। এ সময়ে হালকা বসতিপূর্ণ ও উর্বর ভূমিসম্পন্ন আরাকানে কৃষি শ্রমিকরূপে কাজে যোগ দিতে ব্রিটিশ অভিবাসন নীতি বাঙ্গালীদেরকে উৎসাহিত করে। বাংলা ও আরাকানের মাঝে এ সময়ে কোন আন্তর্জাতিক সীমারেখা ছিল না। অভিবাসনে কোনরূপ বিধি-নিষেধও ছিল না।

বিংশ শতাব্দির শুরুর দিকে অনেক বাঙ্গালী কাজের সন্ধানে আরাকানে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। শরৎ চন্দ্রের'সমুদ্রে সাইক্লোন' গল্পটি যখন পড়েছি বিষয়গুলি তখন এভাবে জানা ছিল না। বার্মা কর্তৃক আরাকান দখলের সময় যারা বিতাড়িত হয়ে বাংলায় আশ্রয় নিয়েছিল, হতে পারে এরা সেই একই জনগোষ্ঠী যারা ব্রিটিশ অভিবাসন নীতির কারনে পুনরায় নিজ দেশে ফিরে যায়। কিংবা হতে পারে যে, নতুনভাবে আরও জনগোষ্ঠী সেখানে প্রবেশ করে, যাদের পূর্ব-পুরুষ কখনও সেখানে বসবাস করেনি। তবে এ বিষয়টি নিশ্চিত নয়।

১৮৭২ সালের ব্রিটিশ শুমারী অনুযায়ী দেখা যায় যে, কেবল আকিয়াব জেলাতেই মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ৫৮ হাজার। যেটি ১৯১১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয় এক লক্ষ আটাত্তর হাজার। ব্রিটিশ কর্তৃক স্বল্প খরচে আরাকানে কৃষি শ্রমিক নেয়ার কারনে অভিবাসীদের সংখ্যা এভাবে বৃদ্ধি পায়। অভিবাসীদের অধিকাংশই চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে আগত।

সমুদ্র পথে আরাকান গমনাগমনের সুবিধা এবং বার্মাার সাথে আরাকান পর্বতমালার প্রতিবন্ধকতার কারনে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে আকিয়াবের সাথে চট্টগ্রাম, নারায়নগঞ্জ, ঢাকা, কোলকাতা, রেঙ্গুন ও চীনসহ ইউরোপের যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়। আরাকান বিশ্বে বৃহৎ চাল রপ্তানীকারক অঞ্চলে পরিণত হয়। ১৯৩১ এর শুমারী অনুযায়ী পাঁচ লক্ষ ভারতীয় কেবল আকিয়াবেই বসবাসরত ছিল। আকিয়াবে আরাকানী ভারতীয়রা প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। আরাকানী বার্মিজরা এতে বিক্ষুব্ধ হতে থাকে।

বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ভারতীয় অভিবাসী বার্মায় এত পরিমাণ বৃদ্ধি পায় যে, বার্মার বড় বড় শহরগুলিতে ভারতীয়রা সংখ্যাগুরু হতে থাকে। ব্রিটিশ

নিয়ন্ত্রিত বার্মা এ সময় নিজেদের অসহায় বোধ করে। আরাকানে ব্রিটিশদের অভিবাসন নীতির তীব্র নেতিবাচক প্রভাব স্পষ্ট হতে থাকে। জাতিগত দ্বন্দ্বের মাধ্যমে এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে শুরু করে।

যদিও অভিবাসন নীতি ঔপনিবেশিক অর্থনীতিকে চাঙ্গা করেছে, কিন্তু স্থানীয় আরাকানীরা এতে বিক্ষুব্ধ হয়। এটি বার্মিজ জাতীয়তাবাদকেও উস্কে দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেই বার্মিজ জাতীয়তাবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। ১৯৩০ এর দিকে এটি ভারত বিরোধী ক্ষোভে পরিণত হয়। ফলশ্রুতিতে ১৯৩৮ সাল এক ভয়াবহ দাঙ্গা প্রত্যক্ষ করে। এতে ভারতীয় অভিবাসীরা আক্রমনের শিকারে পরিণত হয়। বিশেষত ভারতীয় মুসলিম, যারা একটি বিশেষ ধর্মকে সে দেশে নিয়ে আসে তারা। এ দাঙ্গার শিকার হয় মূলত উত্তর আরাকানে বসবাসরত ভারতীয় মুসলিম জনগোষ্ঠী।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের রাজকীয় বাহিনী ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত বার্মা আক্রমন করে। ব্রিটিশরা পশ্চাদপসারণ করে। যাবার সময় তারা উত্তর আরাকানে একটি ‘বাফার জোন’ বা নিরাপদ অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করে। উত্তর আরাকানের মুসলিমদের অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত করে যায়। এর মাধ্যমে তারা জাপানের অগ্রগামীতাকে কিছুটা হলেও প্রতিহত করার চেষ্টা করে।

বার্মায় পুনঃপ্রবেশের জন্য ব্রিটিশরা রোহিঙ্গাদের নিয়ে ‘ভি ফোর্স’ গঠন করে। ১৯৪২ সালে সংঘটিত আরাকান গণহত্যায় ব্রিটিশদের সৃষ্টি করা রোহিঙ্গা ভি ফোর্স, জাপান অনুগত রাখাইন বৌদ্ধ সম্প্রদায় ও বার্মিজ জাতীয়তাবাদী শক্তি দাঙ্গায় সম্পৃক্ত হয়। আরাকান এ সময়ে এক রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। বলা হয় ভি ফোর্স জাপানীদের প্রতিহত করার চেয়ে দাঙ্গায় অধিক অবদান রাখে। জাপানী দখলদারিত্বের সময়কালে (১৯৪২-৪৫) প্রায় আড়াই লক্ষ সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয়।

জাপানের অগ্রগামীতা মুসলিম ও বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করে। মুসলিমরা জাপান নিয়ন্ত্রিত বৌদ্ধ এলাকা ছেড়ে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত মুসলিম অধ্যুষিত উত্তর আরাকানে এসে জড়ো হতে থাকে। আবার বৌদ্ধরা মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা ছাড়তে থাকে। এ সময় আরাকান ছেড়ে অনেকে বাংলা ও ভারতের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। কেবল আরাকানের মুসলমানেরাই নয় হাজার হাজার ভারতীয়-বার্মিজ, ইঙ্গ-বার্মিজ এবং ব্রিটিশ যারা ঔপনিবেশিক আমলে সেখানে বসতি গড়ে

তুলেছিল তারাও আরাকান ত্যাগ করে। উল্লেখ্য যে, মিত্র বাহিনীর অভিযানের মধ্য দিয়ে জাপানী দখলদারিত্বের অবসান ঘটে।

যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে আরাকান একটি বৌদ্ধ নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে পরিণত হতে পারে, আরাকানী মুসলিমরা বিশেষত রোহিঙ্গা মুসলিমরা এ বিষয়ে শঙ্কিত ছিল। আরাকানের মুসলিম নেতৃস্থানীয়রা মনে করে যে, ব্রিটিশরা সেখানে তাদের জন্য একটি পৃথক মুসলিম অঞ্চল করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধ পরবর্তীতে তাদের ভাগ্য নির্ধারণ বিষয়ে ব্রিটিশদের প্রতিশ্রুতির বিষয়টি স্বচ্ছ ছিল না।

বার্মা স্বাধীন হওয়ার পূর্বে নেতৃস্থানীয় আরাকানী মুসলিম বা রোহিঙ্গা মুসলিমরা পাকিস্তান আন্দোলনের সময়ে ভাষা, ধর্ম ও ভৌগলিক দিক বিবেচনা করে পূর্ব পাকিস্তানের সাথে একীভূত হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বার্মার বিষয়ে নিজেদের জড়াতে ইচ্ছুক না হওয়ায় এটি বাস্তবায়ন হয়নি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির পর বাংলাদেশ থেকে অনেকে আরাকানে প্রবেশ করে বলে একটি বিতর্ক আছে। তবে এরা মূলত সে সব রোহিঙ্গা, যারা যুদ্ধকালীন সময়ে সে এলাকা থেকে বিতাড়িত হয়ে বাংলায় আশ্রয় নিয়েছিল। বার্মা স্বাধীন হওয়ার পর তারা আরাকানে ফিরতে শুরু করে। কিন্তু বার্মা সরকার তাদেরকে অবৈধ অভিবাসীরূপে গণ্য করে। এমনকি অনেককে সে দেশে প্রবেশ করতে বাধাদান করে।

ব্রিটিশরা ১৮২৪ সাল থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত বার্মা শাসন করে। ১৯৪৮ সালে বার্মা স্বাধীন হয়। স্বাধীন বার্মায় আরাকানের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বার্মার আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীরূপে স্বীকৃতি লাভ করে। তাদের মধ্য থেকে অনেক উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা থেকে শুরু করে আইন সভার নির্বাচিত সদস্য এবং কেউ কেউ মন্ত্রি পদেও আসীন হয়। ১৯৫১ সালে বার্মার সাধারণ নির্বোচনে রোহিঙ্গাদের মধ্য থেকে পাঁচজন জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। এদের মধ্যে নির্বাচিত মহিলা সদস্যও ছিল। ১৯৫৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে ছয় জন জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়।

১৯৬২ সালে জেনারেল 'নে উইন' বার্মার সামরিক শাসকরূপে ক্ষমতা দখল করে। জেনারেল নেউইন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানের হয়ে তার সামরিক জীবন শুরু করে। সামরিক শাসন জারীর পর থেকে রোহিঙ্গাদেরকে তাদের রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করা থেকে বঞ্চিত করা হতে থাকে। সামরিক শাসনামলে ১৯৬২-৬৪ সালের মধ্যে বার্মিজ ভারতীয়দের দেশ ত্যাগে বাধ্য করা হয়। ১৯৮২ সালে

রোহিঙ্গাদের জাতীয়তার অধিকার হরণ করা হয়। ১৯৯০ সালের নির্বাচনে 'অং সান সুকি' সহ চারজন রোহিঙ্গা সদস্যও নির্বাচিত হয়। কিন্তু সুকি কে গৃহবন্দি করা হয়। অন্যান্যরা নানা প্রকার নির্যাতনের স্বীকার হয়। রোহিঙ্গাদের ভোটাধিকার হরণ করা হয়।

বার্মিনরা মনে করে ব্রিটিশদের অভিবাসন নীতির কারনে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রাখাইনরা মনে করে ব্রিটিশ ও বার্মিনদের কারনে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সহানুভূতির সঙ্গে রোহিঙ্গাদের নিয়ে ভাববার সময়টুকু কারই নেই।

জিন্নাহ কর্তৃক পাকিস্তানে অন্তর্ভূক্তির প্রস্তাবটি গৃহীত না হওয়ায়, নেতৃস্থানীয় কিছু রোহিঙ্গা ১৯৪৭ সালে আরাকানে পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করে। ফলস্বরূপ ১৯৭৮ সালে সামরিক সরকার রোহিঙ্গাদের দেশ থেকে বিতাড়ন করে। অনেকেই সে সময় শরনার্থী হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। কিছু পাকিস্তানে চলে যায়।

বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের প্রতি বার্মার অনৈতিক, নিষ্ঠুর ও মানবতা বিরোধী আচরণের প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু মায়ানমারের ভাষ্য হচ্ছে, যাদের বিতাড়ন করা হয়েছে তারা বাংলাদেশের নাগরিক। তারা অবৈধভাবে তাদের দেশে বসবাস করছে।

১৯৭৮ সালে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় নে উইন সরকার দুই লক্ষ শরনার্থীকে ফেরত নিতে সম্মত হয়। একই বছর এবং ১৯৯২ সালেও বাংলাদেশ-মায়ানমার যৌথ ঘোষনায় আইনগতভাবে রোহিঙ্গাদের বার্মার নাগরিক বলে ঘোষনা করা হয়। (উইকিপেডিয়া থেকে)

এক নজরে

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে রাখাইন রাজ্য 'আরাকান' নামে পরিচিত ছিল। রাখাইন জাতি রাখাইন রাজ্যে সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠী। আরাকানের আদি বাসিন্দা হিসেবে 'রোহিঙ্গা' জনগোষ্ঠী সহস্র বছরাধিককাল সেখানে বসবাস করে আসছে। 'দক্ষিন আরাকানে' রাখাইন জনগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও 'উত্তর আরাকানে' রোহিঙ্গা মুসলিম জনগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ। মায়ানমার সরকার মনে করে রোহিঙ্গারা পার্শ্ববর্তী দেশ বাংলাদেশ থেকে আগত অবৈধ অভিবাসী। এর কিছু ঐতিহাসিক পটভূমি আছে যা মূলত বিতর্কের সৃষ্টি করেছে।

১৪০৬ সালে বার্মা রাখাইন রাজ্য আক্রমন করে। আরাকানের রাজা সে সময় বাংলায় আশ্রয় গ্রহন করে। বাংলার সহায়তায় আরাকান পুনরুদ্ধার হয়। সেসময় বাঙ্গালী মুসলমানেরা আরাকানে প্রবেশ করে এবং বসতি স্থাপন করে।

১৪৫৯ সালে আরাকান চট্টগ্রাম দখল করে নেয়। সে সময় থেকে চট্টগ্রাম আরাকান রাজ্যের অধীনে চলে যায়। আরাকানের শাসকেরা মুঘল-বাংলাতেও তাদের অভিযান অব্যাহত রাখে। মুঘলরা আরাকানীদের আক্রমনকে আরাকানী-পর্তুগীজি জলদস্যুতারূপে বিবেচনা করতো।

১৬৬০ সালে বাংলার রাজ্য শাসক মুঘল সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র শাহ সূজা আওরঙ্গজেবের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আরাকানে পালিয়ে যায়। সূজার সাথে আগতরাও আরাকানে থেকে যায়।

বাংলার সুবেদার শায়েস্তা খাঁন সম্রাট আওরঙ্গজেবের নির্দেশে ১৬৬৬ সালে জলদস্যুদের দমনে অভিযান পরিচালনা করে এবং চট্টগ্রাম পুনর্দখল করে। ব্যাবসা-বাণিজ্য ও কৃষি কাজের সন্ধানে এ সময় থেকে আরাকানে বাঙ্গালীদের প্রবেশ বৃদ্ধি পায়।

১৭৮৫ সালে বার্মার সর্বশেষ ‘কনবঙ’ রাজবংশ আরাকান দখল করে। রাখাইন রাজ্যের জনগোষ্ঠী এ সময় বামারদের নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পেতে পার্শ্ববর্তী ব্রিটিশ শাসিত বাংলার চট্টগ্রাম অঞ্চলে আশ্রয় নেয়।

ব্রিটিশ অভিবাসন নীতি আরাকানে কৃষি শ্রমিকরূপে কাজে যোগ দিতে বাঙ্গালীদেরকে উৎসাহিত করে। বিংশ শতাব্দির শুরুর দিকে অনেক বাঙ্গালী কাজের সন্ধানে আরাকানে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। তবে বার্মা কর্তৃক আরাকান দখলের সময় বিতাড়িত হয়ে যারা বাংলায় আশ্রয় নিয়েছিল প্রধানত এরা সেই জনগোষ্ঠী। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে বার্মায় ভারতীয় অভিবাসী অনেক বৃদ্ধি পায় এবং বড় বড় শহরগুলিতে সংখ্যাগুরু হতে থাকে। এতে বার্মিজ জাতীয়তাবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। ফলশ্রুতিতে ১৯৩৮ সালে এক ভয়াবহ দাঙ্গাও হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের রাজকীয় বাহিনী ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত বার্মা আক্রমন করে। এ সময় কেবল আরাকানের মুসলমানেরাই নয় হাজার হাজার ভারতীয়-বার্মিজ, ইঙ্গ-বার্মিজ এবং ব্রিটিশ যারা সেখানে বসতি গড়ে তুলেছিল তারাও আরাকান ত্যাগ করে বাংলা ও ভারতের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির পর বাংলাদেশ থেকে অনেকে আরাকানে প্রবেশ করে বলে একটি বিতর্ক আছে। তবে এরা মূলত সে সব রোহিঙ্গা, যারা যুদ্ধকালীন সময়ে সে এলাকা থেকে বিতাড়িত হয়ে বাংলায় আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু বার্মা সরকার তাদেরকে অবৈধ অভিবাসীরূপে গণ্য করে।

১৯৪৮ সালে বার্মা স্বাধীন হয়। স্বাধীন বার্মায় আরাকানের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বার্মার আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীরূপে স্বীকৃতি লাভ করে। কিন্তু ১৯৬২ সালে জেনারেল 'নে উইন' সামরিক শাসন জারি করে। সামরিক শাসন জারীর পর থেকে রোহিঙ্গাদেরকে তাদের রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হতে থাকে। সামরিক শাসনামলে ১৯৬২-৬৪ সালের মধ্যে বার্মিজ ভারতীয়দের দেশ ত্যাগে বাধ্য করা হয়। ১৯৭৮ সালে সামরিক সরকার রোহিঙ্গাদের দেশ থেকে বিতাড়ন করে। বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের প্রতি বার্মার অনৈতিক, নিষ্ঠুর ও মানবতা বিরোধী আচরণের প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু মায়ানমারের ভাষ্য হচ্ছে, যাদের বিতাড়ন করা হয়েছে তারা বাংলাদেশের নাগরিক।

‘চু’ .. এবং একটি বিশ্লেষন

(‘Chu ..’ and An Analysis)

জাতীয় সংসদে কখনও ‘চু..’ দিয়ে শুরু করা শব্দের ব্যবহার হতে দেখা গিয়েছে। চারিদিকে আলোচনা-সমালোচনার ঝড় উঠেছে। উঠেছে নিন্দার ঝড়।

যিনি তেমন শব্দ উচ্চারণ করেছেন তিনি কি একাই কাজটি করেছেন? তার সাথে কি আরও কেউ নেই? যারা এমন আচরণের বিরোধিতা করছেন, তারাও কি একা? তাদের সাথেও কি কেউ নেই? কই, এ কারনে তো কোন খুনোখুনি হয়নি। দু’দলইতো সংসদে মুখোমুখী বসে আছে। এটা প্রমাণ করে যে, ভেতরে কোথাও সমন্বয়কারী লুকিয়ে আছে। অথবা শক্তিতে ভারসাম্য আছে। একটি কথা অনেক কিছু বুঝতে সহায়তা করে।

যিনি এটাও করান আবার ওটাও করান। বিরোধীতাই গতি। বিরোধীতাই প্রাণ। বিরোধীতাই সত্য পথের পরিচালক। বিরোধীতা মানুষের মতামত প্রকাশের হাতিয়ার। বিরোধীতার কারনে সত্যকে খুঁজে পাই। মিথ্যেকে খুঁজে পাই। সুষ্ঠু আচরণে অন্তর থেকে বেড় হয়ে আসা বিরোধীতা পথের সন্ধান ঠিকই দেয়। পথ বেছে নেয়ার দায়িত্ব মানুষের। ফলাফল ভোগ মানুষের। মানুষ তার জ্ঞান অনুযায়ী করা কর্মের আনুপাতিক ফলাফল আজ হোক কাল হোক ভোগ করে।

যিনি ‘চু ..’ সম্বলিত বাক্য উচ্চারণ করেছেন তিনি কি খারাপ কাজ করেছেন? ছোট চিন্তায় বিষয়টি খারাপ হলে হতেও পারে, তবে এর ভাল ফলাফলও আছে। আপাত মন্দের মধ্যেও দীর্ঘমেয়াদী ভাল লুকিয়ে থাকতে পারে। মাটি খুঁড়ে সবাই কচ্ছপের ডিম বেড় করে না। সোনাও বেড় করে না। দু’একজন করে।

কোটি মানুষের মুখে এ কারনে ধিক্কার উচচারিত হয়েছে। বিষয়টি যে খারাপ সবাই এক বাক্যে সেটি স্বীকার করেছে। মানুষ খারাপটিকে খারাপ বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। এ ঘটনার মধ্য দিয়ে মানুষের মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। নতুন প্রজন্ম দিক নির্দেশনা পেয়েছে।

এতগুলো সুফল যে শয়তানের কাজের কারনে পাওয়া গেল সে শয়তানের স্থান কোথায় হবে? কোন বোকার পক্ষে এত বড় শয়তানি করা সম্ভব না। শয়তানকেও যথেষ্ট জ্ঞান সম্পন্ন হতে হয়। তা না হলে ছোট খাট কাউকে দিয়েও শয়তানি করানো যেত। ফেরেশতাদের সর্দারকে শয়তান করা হয়েছে। যে সম মর্যাদা প্রত্যাশী।

যার একটু দুষ্টুমি অনেক সুফলের সৃষ্টি করে, সে শাস্তি ভোগ নাও করতে পারে। যদি ভাল নিয়তে বুঝে-শুনে প্রয়োজনে করে থাকে। কিংবা যিনি সব কিছুর চালক তাঁর ইংগীতে করে থাকে। সাধারণ মানুষ আমরা অনেক কিছুই জানি না।

পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ পূণ্যের কাজ করে চলেছে। এই যে এত পূণ্য, সব কিছুর সৃষ্টি মানব বিবেচনায় এক অপূণ্য কর্ম থেকে। স্রষ্টার নির্দেশ অমান্যকরণ থেকে। এই যে এত পাক পূণ্যবান ব্যক্তি। সৃষ্টি তার না-পাক কোন কিছু থেকে। বিপরীতমুখী কর্মকান্ডে যতসব সৃষ্টি। সচলতা। চঞ্চলতা। গতিময়তা।

সৃষ্টি ও গতিময়তার অপরিহার্য অংশ যে বিপরীতমুখীনতা, তা মন্দ হয় কি করে? নামের পরিবর্তন প্রয়োজন। শয়তান নয়। বলা যেতে পারে আপেক্ষিক নেগেটিভ ফোর্স। বিপরীত শক্তি। অথবা শয়তানের শয়তানীকেই নেগেটিভ ফোর্স হিসেবে ধরে নেয়া যেতে পারে। আপেক্ষিক এ কারনে যে পালাবদলে কখনও সেটিও পজিটিভ হয়ে যেতে পারে।

মন্দ কেবল মন্দ নয়। ‘এক’ বা সমগ্রের এক অপরিহার্য অংশ। মন্দকে পৃথক কিছু ভাবতে গেলে ‘এক’ এর ধারণা সঠিক থাকবে না। ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা, আলো-আধাঁর কখনই মিশতে পারে না। রূপক অর্থে বলতে গেলে সংঘর্ষে রত। একে অন্যকে অপসারণে সদা তৎপর। কিংবা বলা যেতে পারে যে, একে অন্যের স্থান দখল করতে সদা তৎপর।

এই দুই শক্তি যখন মুখোমুখী হয়, তখন এদের মধ্য থেকে বা এদের সংমিশ্রনে সন্তর্পনে ঘুমিয়ে বা লুকিয়ে থাকা একটি তৃতীয় শক্তির আবির্ভাব হয়। যা প্রথম ও দ্বিতীয় শক্তির বিচারে শক্তিহীন। কিন্তু উভয়ের কাছে গ্রহণযোগ্য। সকলে তার নৈকট্যপ্রার্থী। এ শক্তি ভারসাম্য সৃষ্টি ও রক্ষা করে। এ ভারসাম্য রক্ষাকারী শক্তিকে যে সহযোগীতা করে সেও পূণ্যের পথে চলে। এটিই দায়িত্বশীলতা। কেননা সে সৃষ্টিকে রক্ষা করার প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণকারী। নচেৎ সৃষ্টির ধ্বংস অনিবার্য। বস্তুত সৃষ্টির কোন ধ্বংস নেই। কিছু সময়ের অরাজকতা সাময়িক। পুরোনোকে উৎপাটন করে নতুনের অবস্থান গ্রহণের সময়টুকু পর্যন্ত। কিংবা বলা যায়, এককে অপসারণ করে অপরের জেঁকে বসার সময়টুকু পর্যন্ত। বা এভাবেও বলা যেতে পারে যে, আপাত নেগেটিভ শক্তির পজিটিভে রূপান্তর হওয়া এবং আপাত পজিটিভ শক্তির নেগেটিভে রূপান্তর হওয়ার সময়টুকু পর্যন্ত। ধ্বংস আসলে রূপান্তরের প্রক্রিয়া। জীবন তাই অনাদি, অনন্ত। শেষ নেই, ধ্বংস নেই। আছে রূপান্তর।

ভারসাম্য রক্ষায় কথিত অপশক্তি তথা বিরোধী শক্তির বিপক্ষে প্রয়োজনে কখনও কঠোর হতে হয়। নচেৎ রূপান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যেতে পারে। যাকে ধ্বংস নামে অভিহিত করা হয়। যা একটি পক্ষের কাছে কাম্য নয়।

ধর্মে তাই নমনীয়তা-শ্রদ্ধা-ভালবাসা, এত কিছুর পাশাপাশি কঠোরতারও উপস্থিতি রয়েছে। কঠোরতা খারাপ নয়। খারাপ এর ভূল প্রয়োগে।

আলোচনাটি একদিক থেকে মনে হচ্ছে যেন আরেক দিকে চলে যাচ্ছে। কিন্তু তা হতে দেয়া যাবে না। যা বলছিলাম ..

যার একটি মন্দ কর্ম কোটি মানুষকে ভাল পথে চলতে শপথ নেওয়ালো, সে যদি বুঝে কাজটি করে থাকে, তবে অবশ্যই পাপি হতে পারে না। তার স্থান পাপির জায়গায় নয়। কিছু মানুষকে সেটা বুঝতে হবে এবং তাকেও রক্ষা করতে হবে। তার সাহসী ভূমিকার কারনে প্রজন্ম ভাল-মন্দকে চিহ্নিত করতে পেরেছে। সমস্বরে মন্দকে ধিক্কার দিয়েছে বা মন্দের বিপক্ষে একত্রিত হয়েছে। যদি সে কাজটি না জেনে-বুঝে করে থাকে, তবে তার স্থান ভগবানের বিবেচনা সাপেক্ষ বিষয়।

সৃষ্টিকর্তার খেলা বোঝা সৃষ্টির পক্ষে সম্ভব নয়। কোন সূক্ষ বিচারে কে পার পেয়ে যাবে, আর কোন সূক্ষ বিচারে কে ধরা পড়ে যাবে, তা কেবল তিনিই জানেন।

আমি শয়তান নই, ফেরেশতার মত মানুষ। বেহেশতের কাছাকাছি চলে গিয়েছি। কিংবা সে ফেরেশতা নয়, শয়তানের মত মানুষ। নরকের দুয়ারের কাছে চলে গিয়েছে। এমন করে ভাববার কারই কোন অবকাশ নেই।

একজন ভাল মানুষের আহবানে দশজন মানুষ ভাল হলো। একজনের মন্দ আচরণ কোটি মানুষকে ভাল পথের বিষয়ে সচেতন করে তুললো, কোনটি অধিক ফলপ্রসূ? ষ্টেজে বসে একজনের সিগারেটের একটি ফুক, অনেক মানুষকে একসাথে এর কুফল ও মন্দ আচরণ বিষয়ে সচেতন করে তুলতে পারে। অবশ্যই যদি সত্যি সত্যি কাজগুলি বুঝে ভাল নিয়তে করা হয়ে থাকে!

অন্তরলগ

(Mind Reading)

অন্তর কথা বলে। কে কথা বলে দেখতে পাই না। যে কথা বলে তার কথা শুনতেও পাই না। তবে বুঝতে পারি। আচছা, অন্তরে ক'জনার বসবাস? কোন কথা শুরু হলেই কেউ একজন তার উত্তর দিয়ে যায়। নয়তো পাল্টা প্রশ্ন করে!

ধরে নেই দু'জনার বাস। একজন আপেক্ষিক ধনাত্মক অন্তর (ধঃ অঃ) এবং অপরজন আপেক্ষিক ঋনাত্মক অন্তর (ঋঃ অঃ)। ধনাত্মক ও ঋনাত্মক অন্তরের কথপোকথন কেউ জানে না। কেউ শুনতেও পায় না। জানে কেবল মানুষ নিজে এবং অন্তর্যামী।

২০কখ সালের কোন এক বিকেলে অন্তরে কিছু কথপোকথন হয়েছিল। সে কথা মিলিয়ে যায়নি। সংরক্ষিত হয়ে আছে। রেকর্ডরুম থেকে বের করে আনা সে কথপোকথনের কিছু অংশ আজ এখানে প্রকাশ করা হল।

কথপোকথন প্রসংগ- 'দীর্ঘ জীবন'।

এক

ধঃ অঃ : আচ্ছা! কচ্ছপ যদি চার শ বছর বাঁচতে পারে তবে মানুষ কেন এক শ বছর বাঁচে?

ঋঃ অঃ : কথাটি কাকে বলছো?

ধঃ অঃ : সৃষ্টিকর্তাকে।

ঋঃ অঃ : সেটি তিনিই ভাল জানেন। তোমার ভাববার প্রয়োজন নেই।

দুই

ধঃ অঃ : আচ্ছা! কচ্ছপ যদি চার শ বছর বাঁচতে পারে তবে মানুষ কেন এক শ বছর বাঁচে?

ঋঃ অঃ : কথাটি কাকে বলছো?

ধঃ অঃ : সৃষ্টিকর্তাকে।

ঋঃ অঃ : কেন বলছো?

ধঃ অঃ : হিংসে হয়। আমিও বাঁচতে চাই।

ঋঃ অঃ : এটি চাওয়ার বা প্রার্থনা করার যথাযথ ধরণ নয়।

তিন

ধঃ অঃ : কচ্ছপ যদি চার শ বছর বাঁচে তবে মানুষ কেন এক শ বছর বাঁচে?

ঋঃ অঃ : তো তোমার সমস্যা কোথায়?

ধঃ অঃ : না আমার সমস্যা নেই। তবে আমিও অন্তরে তার মত দীর্ঘজীবি হওয়ার বাসনা রাখি।

ঋঃ অঃ : কেন?

ধঃ অঃ : পৃথিবী অনেক সুন্দর। মায়া-মহব্বত, খাওয়া-দাওয়া, গল্প-গুজব, দায়িত্ববোধ, মানবসেবা-জনসেবা, সৃষ্টিশীলতা এখানের এ সবই আমার ভাল লাগে।

ঋঃ অঃ : তাই? তো হও। কে তোমাকে দীর্ঘজীবি হতে বারণ করছে?

ধঃ অঃ : কিন্তু আমি তো নিজে তা হতে পারছি না। দয়া করে তুমি আমাকে তেমন করে দাও।

ঋঃ অঃ : তোমাকে আমার ততদিনের জন্য প্রয়োজন নেই।

চার

ধঃ অঃ : আচ্ছা! কচ্ছপ যদি চার শ বছর বাঁচতে পারে তবে মানুষ কেন এক শ বছর বাঁচে?

ঋঃ অঃ : তো তুমি কত বছর বাঁচতে চাও?

ধঃ অঃ : চার শ বছর।

ঋঃ অঃ : নির্বোধ! স্রষ্টার কাছে চাইতে হলে চিরজীবি হতে চাও।

পাঁচ

ধঃ অঃ : হে স্রষ্টা তুমি আমায় চিরজীবি করে দাও।

ঋঃ অঃ : কেন? কারন কি?

ধঃ অঃ : কারন ... ... তারপর কারন .. .. তারপর আরও কারন . . . ইত্যাদি।

ঋঃ অঃ : কিন্তু আমার তো তোমাকে ততদিনের জন্য প্রয়োজন নেই।

আইপিএস-ইউপিএস

(IPS-UPS)

আইপিএস একটি সংক্ষেপিত ইংরেজী শব্দ। যার অর্থ হচ্ছে, ইন্সট্যান্ট পাওয়ার সাপ্লাই। অপরটি ইউপিএস। যার ইংরেজী অর্থ আন-ইন্টারেপ্টেড পাওয়ার সাপ্লাই।

প্রথমটির ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ চলে গেলে সেটি তাৎক্ষণিক বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। অর্থাৎ সাথে সাথে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। তবে বিদ্যুৎ চলে যাওয়া ও তার পুনরায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করার মাঝে অতি সূক্ষ একটি সময়ের জন্য সে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন থাকে। অর্থাৎ নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের মাঝে একটি ছেদ পরে।

ইউপিএস হচ্ছে আন-ইন্টারেপটেড। অর্থাৎ বিদ্যুৎ চলে গেলেও তার নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের মাঝে কোন ছেদ পরে না। কোন প্রকারের ইন্টারেপসন বা বিচ্যূতি ঘটে না। মাঝের সময়েও বিদ্যুতের সরবরাহ চলমান থাকে। বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয় না। আন-ইন্টারেপটেড।

জগতে দুই ধরণের সৃষ্ট জীব আছে। এটি লেখকের কথা নয়। তাই যেখানকার কথা সেখান থেকেই উদ্ধৃতি তুলে ধরা হল। বলা হচ্ছে,

"দুই প্রকারের জীবসত্ত্বা আছে। মরণশীল বা ক্ষয়িষ্ণু এবং চিরজীবি বা অ-ক্ষয়িষ্ণু। এই জড় জগতে প্রতিটি জীবই মরণশীল এবং পারলৌকিক বা আধ্যাত্মিক জগতে প্রতিটি জীবই চিরজীবি।" (গীতা ১৫:১৬)

এটি গীতার উদ্ধৃতি। কোরআনের বক্তব্যেও একই সুর আছে। বলা হচ্ছে,

"প্রতিটি প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে ... পার্থিব জীবনের আনন্দ কেবলি মিছে মরিচীকা।" (আল-কোরআন ৩:১৮৫) অর্থাৎ পার্থিব জীবনে সকলকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। এখানে জীব ক্ষয়িষ্ণু বা মরণশীল। আরও বলা হয়েছে,

"... উদ্যানে/স্বর্গে তারা চিরজীবি হবে তাদের কর্মের প্রতিফলস্বরূপ।" (আল-কোরআন ৪৬:১৪), "উদ্যানবাসীরা বলবে এখন আমাদের আর মৃত্যু হবে না।" (আল-কোরআন ৩৭:৫৮) অর্থাৎ যেমনটি গীতায় বলা হয়েছে যে, পারলৌকিক বা আধ্যাত্মিক জগতে প্রতিটি জীবই চিরজীবি।

আইপিএস ও ইউপিএসের গঠন প্রণালী, তাদের ভিতরগত পরিবেশ ও নানাবিধ শর্তাবলী এক নয়। ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ, গঠন ও শর্ত আছে। তাই একই কাজে

তাদের প্রক্রিয়াগত ভিন্নতা আছে। বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার সাথে সাথে দুটোই স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে শুরু করে দেয়। কিন্তু সৃষ্টিগত পার্থক্যের কারনে, পুনরায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করার পূর্বে আইপিএস কিছু সময়ের জন্য বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন থাকে, কিন্তু ইউপিএস বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয় না। নিরবিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে যায়।

বিশ্ব জগতের ভিন্ন ভিন্ন স্থান বা অবস্থানে রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন গঠন, শর্ত ও পরিবেশ। পৃথিবীতে এক রকম, মঙ্গলে আরেক রকম। আবার পৃথিবীরও এক এক স্থানে এক এক রকম। প্রাণসম্পন্ন জীবও নানা রকম। তাদেরও ভিতরগত পার্থক্য আছে। এক এক রকমের জীবের আছে এক এক রকমের গঠন, শর্ত ও পরিবেশ। এর সব কিছুই নির্দিষ্ট স্থানে স্থিত প্রাণের ওপর প্রভাব রাখে। তাতেই জীব হয় মরণশীল কিংবা চিরজীবি।

মৃত্যু কি? মৃত্যু আইপিএসের বিদ্যুৎ প্রবাহের বিচ্ছিন্ন সময়ের মতো। জীবের ভেতরে প্রাণের প্রবাহকে ক্ষণিকের জন্য বিচ্যূত করে দেয়। প্রাণের প্রবাহ পেলে দেহ আবার জেগে ওঠে। মাঝের সময়টুকু বিচ্ছিন্ন থাকে। বলা হচ্ছে,

“জীবদেহে আত্মা যেভাবে শৈশব, যৌবন ও বার্ধক্যের মাধ্যমে দেহের রূপ পরিবর্তন করে, মৃত্যুর পরে ঠিক সেভাবেই আত্মা এক দেহ থেকে অন্য দেহে দেহান্তরীত হয়। ... মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে, আত্মাও তেমনি ব্যাবহার অনুপযোগী জীর্ণ দেহ ত্যাগ করে নতুন দেহ গ্রহণ করে।” (গীতা ২:১৩,২২)

একই কথা কোরআনে এভাবে বলা হয়েছে, “তোমরা নিশ্চিতভাবেই মৃত্যুবরণ করবে, অতঃপর পুনরুত্থান দিবসে তোমরা পুনরুত্থিত হবে।” (আল-কোরআন ২৩:১৫-১৬)

গীতা ও কোরআনের বক্তব্যের মর্ম অর্থ এক। মৃত ব্যাক্তি পুনরায় জীবিত হবে। কোন প্রক্রিয়ায় হবে সেটি সাধারণের তর্কের বিষয় নয়। সেটি ধর্মীয় আলোচনা কিংবা প্রচারণার বিষয় হলেও তাদের গবেষনার বিষয় নয়। ধর্ম কেবল একটি দিক নির্দেশনা দিয়েছে। কিন্তু যদি এ বিষয়ে গবেষনা করতেই হয়, তবে সেটি বৈজ্ঞানিক বা বিজ্ঞানের গবেষনার বিষয়।

প্রশ্ন জাগে আবার কি মানুষ হুবহু সেই পুরোনো আকৃতি-প্রকৃতিতে জেগে উঠতে পারবে? পুরোনো স্মৃতি নিয়ে? বস্তুত এগুলি কোন বিষয়ই না। বরং তুলনামূলকভাবে এ কাজগুলি করাই সহজ।

নির্দিষ্ট মানুষের প্রয়োজনীয় সকল বিষয় বা সংকেত তার ডিএনএ-তে রয়েছে। ভবিষ্যতে আরও অনেক কিছু আবিস্কৃত হবে। প্রতিটি আবিস্কার বা বিধাতা প্রদত্ত প্রতিটি জ্ঞান আমাদেরকে ইংগিত বা দিক-নির্দেশনা দেয়। কেবল কপি-পেষ্ট করে দিতে হবে।

কথাগুলি লেখক যেভাবে লিখে চলেছেন মনে হচ্ছে যেন তিনি সব জানেন। সকল কাঁরসাজি তার হাতে। আসলে তা নয়। লেখক বিশ্বাস করে এতকিছু যিনি করতে পারেন, তিনি সব পারেন। কিভাবে পারেন? লেখক জানে না। জানতেও চায় না। বিজ্ঞানীরা চাইলে খুঁজে দেখতে পারেন। লেখক কেবল প্রাপ্ত ফলাফলের জ্ঞানগত তথা আত্মিক ভোক্তা!

কিভাবে পুনরুত্থান হবে, কিভাবে মানুষ আবার জেগে উঠবে বিষয়গুলি কিভাবে ঘটবে সে প্রক্রিয়ার আলোচনা এখানে গুরুত্বপূর্ণ নয়। এখানে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে Guidance বা দিক-নির্দেশনাটি। অর্থাৎ মানুষ আবার জীবিত হবে। ধর্মগ্রন্থগুলি আমাদেরকে সে দিক-নির্দেশনা দেয়।

বস্তুত সব আল্লাহ জানেন। সব একই রকমভাবে সৃষ্টি হয়ে যাবে হয়তোবা। বিষয়গুলি মানুষ জানতে পারবে তখন, যখন আল্লাহ তা মানুষের জানার জন্য অনুমোদন করে দেবেন।

কথাগুলি ধর্ম গ্রন্থসমুহে বলা হয়েছে বহু পূর্বে। তাইতো এসব গ্রন্থ মানবজাতির জন্য দিক-নির্দেশনা। চাইলে কেউ এসব কথা বিশ্বাস করতে পারে, আবার নাও করতে পারে। কিছু মানুষ অপেক্ষা করবে বৈজ্ঞানিক ফলাফল জানার জন্য। তবে কথা যদি সত্য হয়, ততদিনে হয়তোবা ঘটনা ঘটেও যেতে পারে। ফলে ঘটনা ঘটার পূর্বে ফলাফল জানার সৌভাগ্য নাও হতে পারে। বক্তব্যগুলি বিশ্বাস করা না করা ব্যাক্তির একান্তই নিজস্ব বিবেচ্য বিষয়।

'মৃত্যু' দেহে প্রাণ প্রবাহের বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে। সাময়িক। স্বল্প সময়ের জন্য। যেমনটি আইপিএসের বিদ্যুৎ প্রবাহের ক্ষেত্রে ঘটে। মানুষ বুঝতেও পারে না বিদ্যুতের সেই বিচ্ছিন্নতার সময়টুকুকে। মৃত্যুও হয়তোবা অতি স্বল্প সময়ের, কিন্তু

মানবীয় হিসেবের বিবেচনায় সেটি অনেক দীর্ঘ মনে হতে পারে। যেমন বলা হচ্ছে,

"... তোমার পালনকর্তার একদিন তোমাদের গণনার সহস্র বছরের সমান।" (আল-কোরআন ২২:৪৭)

একই কথা গীতায় বলা হয়েছে, "মানবীয় হিসেবে হাজার হাজার বছরে ব্রহ্মার একদিন এবং তাঁর রাতের সময়ের হিসেবও তেমনই।" (গীতা ৮:১৭)

আরও বলা হয়েছে, "... সেদিন তাদের মনে হবে যেন তারা দিনের এক মুহূর্তের বেশী সময় পৃথিবীতে অবস্থান করেনি।" (আল-কোরআন ৪৬:৩৫)

কোন এক অবস্থা ও অবস্থান থেকে দীর্ঘ মনে হতে পারে, আবার অন্য কোন অবস্থা ও অবস্থান থেকে বিষয়গুলি চোখের এক পলক সময়ের মতো মনে হতে পারে।

মৃত্যু থেকে পুনর্জন্মের বিষয়টিকে এখানে আইপিএসে বিদ্যুৎ সরবরাহের বিচ্ছিন্নতার সময়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। অর্থাৎ বিষয়টি এমন যে, বিদ্যুৎ প্রবাহ আছে সব সচল আছে, কিন্তু বিদ্যুৎ প্রবাহ চলে গেল সব বন্ধ হয়ে গেল। যেন মৃত্যুর মতো। পুনরায় বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি হলো, আবার সব সচল হয়ে উঠলো।

জীবের ক্ষেত্রে প্রাণ আছে, জীব সচল আছে। প্রাণের প্রবাহ চলে গেল জীব মৃত। আবার প্রাণের প্রবাহ সঞ্চারিত হলো, প্রাণী জেগে উঠলো। এটা হলো ক্ষয়িষ্ণু বা মরণশীল জীবের উদাহরণ।

আরেক ধরণের জীব আছে যাদের মৃত্যু নেই। তবে প্রবৃদ্ধি বা অন্য কথায় সংকোচন-প্রসারণ আছে। প্রবৃদ্ধির এক পর্যায়ে বা সর্বশেষ পর্যায়ে তারা নিজেদেরকে চুপসে নেয় বা সংকোচন করে ফেলে। মৃত্য যেমন জীবনের বিপরীত। এক্ষেত্রে সংকোচন হচ্ছে প্রসারণের বিপরীত বা বলা যায় মৃত্যুর সমপর্যায়ের। তবে মৃত্যু নয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রাণের প্রবাহ বিচ্ছিন্ন হয় না। সংকোচনের পর প্রাণী আবার নতুন করে বা প্রথম থেকে শুরু করে। সংকোচন ও প্রসারণ এ দুটি ঘটনার মাঝের সময়ে তাদের প্রাণ বিচ্ছিন্ন হয় না। বিষয়টিকে ইউপিএসে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রাণীর ক্ষেত্রে এটি প্রাণের নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহের মতো। কোন প্রকারের ইন্টারেপসন বা বিচ্যূতি ঘটে না। আন-ইন্টারেপটেড।

জীবন-মৃত্যু, পুনর্জন্ম বা পুনরুত্থান, মরণশীল ও চিরজীবির বিষয়গুলি আইপিএস ও ইউপিএসে বিদ্যুৎ প্রবাহের ন্যায় জীবদেহে প্রাণের প্রবাহের মতো।

এক আজব বা স্বর্গীয় অর্থনৈতিক ভাবনা

(A Fantastic or Heavenly Economics)

আচ্ছা, ডাক্তারের কাজ কি ইঞ্জিনিয়ারের দ্বারা করা সম্ভব, কিংবা ইঞ্জিনিয়ারের কাজ ডাক্তারের দ্বারা? সমাজ বিজ্ঞানে লেখাপড়া করা কোন একজন কি ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ারের কাজ করতে পারবেন?

না, ডাক্তার বা ইাঞ্জনিয়ারের কাজ ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া অপর কারও দ্বারা করা সম্ভব নয়। কিন্তু জগতে এমন অনেক কাজ আছে যা একজনেরটা অপরজনের পক্ষে করা সম্ভব। সাধারণ যে কোন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেই সেসব কাজ করা সম্ভব। এমনকি শিক্ষিত না হয়ে সাধারণ জ্ঞান দিয়েও করা সম্ভব। কিন্তু ডাক্তারি বা ইঞ্জিনিয়ারিং করা সকলের দ্বারা সম্ভব না। আবার ডাক্তারের দ্বারা ইঞ্জিনিয়ারিং কিংবা ইঞ্জিনিয়ারকে দিয়েও ডাক্তারি করা সম্ভব না। এগুলি হাইলি টেকনিকাল বিষয়। এ ধরণের টেকনিকাল বিষয়গুলির সাথে সাধারণ অন্য কোন বিষয়সমুহকে টেকনিকাল গণ্য করে তুলনা করা যায় না। যেমন, ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার কিংবা সমাজ বিজ্ঞানের একজন চাইলে ব্যাংকে কাজ করতে পারে। এনজিওতে কাজ করতে পারে। পুলিশে চাকরি করতে পারে। আদার ব্যাবসাও করতে পারে। কিন্তু যে কেউ ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হতে পারবে না।

এক প্রকার ভাবনায় ডাক্তারি বা ইঞ্জিনিয়ারিং এর কাজও সবার দ্বারা করা সম্ভব। সেটি কিভাবে? যেমন, এ পৃথিবীতে যখন কোন ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার ছিল না, তখন কারা ডাক্তারি বা ইঞ্জিনিয়ারিং করেছে? কিংবা কাদের মধ্য থেকে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার গড়ে উঠেছে? অ-ডাক্তার বা অ-ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্য থেকে। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে। সাধারণ মানুষই বিষয়গুলির জ্ঞান অর্জন করেছে; অতঃপর বিকশিত করেছে এবং বিশেষায়িত হয়েছে। প্রাথমিক কালের সে জ্ঞান আজ বহুদুর অগ্রসর হয়েছে। জ্ঞানটি আসল। ব্যাক্তিটি নয়। যে কেউ বিষয়ের জ্ঞান ধারণ করবে, সে ঐ কাজটি করতে পারবে।

জ্ঞান বিভিন্নভাবে বিভিন্ন স্থানে সংরক্ষিত থাকে, যেমন পুস্তকে। ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার সংরক্ষিত জ্ঞানের বিশাল ভান্ডার থেকে সামান্য কিছু অংশ মস্তিস্কে সংরক্ষন করে রাখে। যে কেউ সে জ্ঞান আহরণ করে মস্তিস্কে ধারণ করে রাখতে পারে। সে তখন ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার নামে পরিচিত হয়ে যাবে। তারা কিছু সুনির্দিষ্ট বিষয়ের সব নয় অর্থাৎ কিছু নির্দিষ্ট জ্ঞান মেমোরিতে সংরক্ষণ করে রাখে।

যেমন পেন ড্রাইভে আমরা নানান তথ্য সংরক্ষণ করে রাখি। সত্যিকারের ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হতে হলে হাতে-কলমেও কাজ জানতে হবে। বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। আলোচনাটি এভাবেই শুরু করলাম। অতঃপর নিশ্চয়ই সমগ্র আলোচনাটিকে বুঝতে এরও একটা যোগসূত্র পাওয়া যাবে।

চারিদিকে এত মানুষ! এত এত মানুষ প্রতি বছর বিশ্ববিদ্যালয়সমুহ থেকে নানান বিষয়ে পাশ করে বের হচ্ছে। কিন্তু কর্মের এত সংস্থান কোথায়? মানুষ অনুপাতে হয়তো আরও ডাক্তার প্রয়োজন আছে এদেশে। কিন্তু ডাক্তারি ছাড়া আরও যেসব বিষয়ে শিক্ষার্থীরা পাশ করে বেড় হচ্ছে, তাদের কর্মের কি এত সংস্থান বা প্রয়োজনীয়তা আছে? বিশ্ববিদ্যালয়সমুহের সব বিষয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য তো কর্মের এত সংস্থান নেই। যেমন, ডাক্তার আরও প্রয়োজন হলেও ইতিহাসবিদ কি এত প্রয়োজন আছে? কিংবা ভূগোলবিদ? কিংবা যারা বাংলা বা ইংরেজী লিটারেচারে লেখা-পড়া করছে তাদের?

অথচ জগতের প্রতিটি মানুষকে একটি পরিপূর্ণ ও সুন্দর জীবন যাপনের পথ বা উপায় সৃষ্টি করে দিতে হবে। বিধাতার একটি সৃষ্টিকেও ধ্বংস করার অধিকার কেউ রাখে না। বরং তার যথাযথ পরিপালন সুনিশ্চিত করতে হবে। এটি একটি অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বশীলতা জগত পরিচালনাকারীদের জন্য।

তাই কেবল কর্মের সংস্থানের প্রয়োজনে হলেও অপ্রয়োজনে লেখাপড়ার প্রতিটি বিষয়ের অধীনে সকলের জন্য কর্মের সংস্থান সৃষ্টি করে দিতে হবে। প্রয়োজনে পদ-পদবী বানিয়ে বসিয়ে বসিয়ে বেতন দিতে হবে। প্রতিটি মানুষকে কিছু একটা কাজে ব্যতিব্যাস্ত রাখার উপায় অবলম্বন করতে হবে এবং সকলকেই ডেটাবেইজের আওতার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। কেউ বেকার থাকবে না। কোন মস্তিস্ককে অলস ও বেকার রেখে বাজে কাজে লিপ্ত হতে দেয়া যাবে না। সমাজ, পরিবেশ এমনকি সার্বিক উন্নয়নের জন্যও এটি উত্তম ধারণা।

সুশৃংখল নিয়মের মধ্যে এনে, সকল মানুষের জন্য সুন্দর জীবনযাপনের ব্যবস্থা করা সম্ভব না হলে সেটি সমাজ, পরিবেশ, উন্নয়ন সবকিছুকে বাধা বা ক্ষতিগ্রস্ত করবে। ক্ষতিগ্রস্ততার সম্ভাবনাকে কমিয়ে আনা বা পরিস্থিতি ভাল রাখার স্বার্থে সকল মানুষকে কোন না কোন কাজে নিয়োজিত রাখার চেষ্টা করা উত্তম।

অলস বা বেকার মানুষদের ক্ষতিকর কোন কর্ম সমাজের ক্ষতি করে। সে ক্ষতি পুরণের জন্য পরবর্তীতে কোন সেক্টরে বাজেট বরাদ্দ দেয়া হয়। ক্ষতি হওয়ার পর

বাজেট বরাদ্দ দেয়ার চাইতে পূর্বেই পদ-পদবী সৃষ্টি করে ক্ষতিকর বা বেকার মানুষদের বেতন দিয়ে যাওয়া এবং কর্মে ব্যাস্ত রাখার উপায় অবলম্বন করা উত্তম। অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর কাজ করা থেকে মানুষকে দুরে সরিয়ে রাখতেও বরং এটি উত্তম ধারণা।

মানুষ অনুপাতে এদেশে হয়তো আরও ডাক্তার প্রয়োজন আছে। কিন্তু তারপরেও বাজার দখলে চলছে প্রতিযোগীতা। চাহিদা থাকা সত্বেও এ প্রতিযোগীতা কেন? কারন সবাই এক সুখী ও স্বাচ্ছন্দপূর্ণ অবস্থানে অবস্থান করে ডাক্তারি করতে চায়। ছড়িয়ে থাকা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে যেতে চায় না। অর্থাৎ নিজ অবস্থান ছেড়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলে বা প্রান্তিক পর্যায়ে গিয়ে বা থেকে কেউই কাজ করতে চায় না। এতে যে অযৌক্তিকতা আছে তাও নয়।

পাঠক, লেখার সুবিধা বা কেবল ধারণাটিকে প্রকাশ করার সুবিধার্থে বারবার ডাক্তারি পেশার উদাহরণ তুলে ধরা হচ্ছে। এটি একান্তই লেখকের মনের ভাবটি প্রকাশ করার সুবিধার্থে করা হচ্ছে। অন্য কোন কারন নেই।

এক অর্থে বাস্তবতা বলছে, এত এত ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ারেরও প্রয়োজন নেই। বিষয়ের ওপর হাইলি এডুকেটেড কিছু মানুষ থাকা প্রয়োজন আছে এটি সত্যি। তবে দিক-নির্দেশনা অনুসরণ করে কাজ করতে পারা লোকের প্রয়োজন আছে বেশী। হাতে-কলমে প্রশিক্ষিত কিছু লোক প্রয়োজন আছে। যারা নির্দেশনা মেনে কাজ করতে পারবে।

অতি শিক্ষিতরা প্রান্তিক পর্যায়ে গিয়ে কাজ করতে চায় না। গ্রামে যেতে চায় না। বিদেশে পাড়ি জমাতে চায়। ধনীর দুলালেরাও যেতে চায় না। অতএব প্রান্তিকের লোকই প্রান্তিকে থাকুক। প্রান্তিকের লোকই তাদের নিজেদের মানুষের সেবায় নিয়োজিত থাকুক। সুখ বা স্বাচ্ছন্দ পরিত্যাগ করে কাউকেই প্রান্তিক পর্যায়ে গিয়ে কাজ করতে হবে না। পেছন থেকে বা দুরে অবস্থান করে বিশেষজ্ঞ তার বিশেষ জ্ঞান ট্রান্সফার করে দেবে। বিশেষজ্ঞ যেভাবে নির্দেশনা দেবে প্রান্তিকে অবস্থানকারী সেভাবে কাজ করবে। তাদের প্রশিক্ষন দিয়ে ছেড়ে দিতে হবে।

প্রত্যেকের জোর করে উচ্চ মানের ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার প্রয়োজন নেই। ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হবে কেবল অতি আগ্রহীরা, অর্থাৎ যাদের অন্তর তাদেরকে সে কাজে নিয়োজিত হতে অনুপ্রাণীত করে এবং সে কারনে তারা স্বেচ্ছায় অনেক সুখ-স্বচ্ছন্দ পরিত্যাগ করতেও ইচ্ছুক থাকে। অন্যথায় শুধু শুধু অর্থ

খরচ করে সনদ সংগ্রহ করে সামাজিকভাবে মর্যাদাবান হওয়ার জন্য, কিংবা ব্যাংক ঋণ পাবার সুবিধার জন্য ডাক্তার হয়ে গড়ে ওঠার কোন প্রয়োজন নেই। এতে সত্যিকার 'আগ্রহী একজন' টাকার খেলার প্রতিযোগীতায় হেরে গিয়ে ডাক্তার হওয়া থেকে বঞ্চিত হয় এবং সমাজ যোগ্যস্থানে যোগ্য লোক হারায়।

কাজ করবে কাজের মানুষ। যারা সত্যি সত্যি কাজ করতে ইচ্ছুক বা আগ্রহী। কিংবা যাদের কাজের প্রয়োজন আছে। অন্যদের কাজের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত হওয়ার দরকার নেই। তাতে কর্মক্ষেত্রে যেমন অপ্রয়োজনীয় প্রতিযোগীতা সৃষ্টি হয়, বিশৃংখলা বা নানান রাজনীতি প্রবেশ করে আবার কাজের মানুষের কাজের স্পিরিট নষ্ট হয়। কুফলস্বরূপ তারাও কাজ করতে পারে না বা হতাশ হয়ে কাজ ছেড়ে দেয়, কিংবা তাদেরও কাজের গতি কমে আসে।

প্রতিবছর বের হওয়া এত এত ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার বা নিজ নিজ পেশায় বিশেষায়িত হয়ে গড়ে ওঠা অতিরিক্ত বা উদ্বৃত্ত জনশক্তি তবে করবেটা কি? কিভাবে তারা চলবে বা জীবন পরিচালনা করবে? বেঁচে থাকার জন্য তো অর্থের প্রয়োজন আছে। অর্থ ও মর্যাদার প্রয়োজনে তো ভাল একটি কাজও প্রয়োজন আছে। কাজের প্রয়োজনে শিক্ষা প্রয়োজন আছে। বিশেষায়িত শিক্ষারও প্রয়োজন আছে। প্রকৃত সত্য হচ্ছে, এত মানুষের এত উচ্চ মানের শিক্ষার প্রয়োজন নেই। তবে কিছু মানুষের সময় কাটাবার জন্য বা কিছু মানুষকে ব্যাতিব্যাস্ত রাখার জন্য কিছু একটা করার ব্যবস্থা থাকার প্রয়োজন আছে।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, কর্মক্ষেত্রগুলিতে প্রতিযোগীতা চলছে। কেন? কারন একই স্থানে সমপর্যায়ের যোগ্য লোক অধিক হয়ে গেছে। একটি চেয়ারের দিকে তাকিয়ে আছে দশটি চোখ! প্রতিযোগীতা কখনও এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছুচ্ছে যে, কাজের চেয়ে আকাজ সৃষ্টি হচ্ছে বেশী। মর্যাদা ও অধিক অর্থ প্রাপ্তির জন্য প্রমোশন ও অধিক ইনক্রিমেন্ট প্রাপ্তির প্রতিযোগীতা চলছে। একে অন্যকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়ার কূট চালও চালছে। কেউ কাউকে সত্যিকার সহায়তা করছে না। সহায়তা করছে অতি সূক্ষ ও বুদ্ধিসম্মত উপায়ে কেবল দলীয়ভাবে।

কাজের মানুষ কাজ পাচ্ছে না বা হারাচ্ছে। দুষ্ট-বুদ্ধি মস্তিস্ক ওপরে উঠে আসছে, কিন্তু কাজ করতে পারছে না। কাজের মানুষ বা ভাল মানুষকেও দুষ্টদের মোকাবেলায় কাজ ফেলে লড়াইতে ব্যাস্ত থাকতে হচ্ছে টিকে থাকার জন্য, নয়তো পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। শ্রম ও ব্যায়িত অর্থ অনুপাতে সমাজ ফল পাচ্ছে না।

তোষামদি বৃদ্ধি পাচ্ছে। দক্ষ লোক হারিয়ে যাচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে আবার আদিম অবস্থায় পতিত হতে হবে। কিংবা এক সময় সংঘাতের সৃষ্টি হবে। যা আবার সকল উন্নয়নকে পেছনে নিয়ে যাবে। সম্ভাব্য এমনতর ভবিষ্যৎ অবস্থার একটা সমাধান থাকা প্রয়োজন।

কিছু লোক আছে যারা কাজ করতে চায় বা তাদের কাজ প্রয়োজন আছে। অন্যদিকে কিছু দক্ষলোক আছে যারা কাজ করতে তেমন আগ্রহী নয় কিন্তু সমান অধিকার চায়। এমনক্ষেত্রে তেমন মানসিকতাসম্পন্ন লোকগুলিকেও সমান অধিকার দেয়া উচিৎ। এর নানামূখী কারন বা যৌক্তিকতা আছে। কেননা তারাও দক্ষ। তারাও কাজ জানে এবং কাজ করার যোগ্যতা রাখে। কিংবা হোক অদক্ষ, তাদেরকে বাদ দিয়ে অন্যকে বা আগ্রহী একজনকে বা অধিক দক্ষ লোককে বা যার কাজ প্রয়োজন আছে তেমন একজনকে কাজ বা আসন দেয়া হলে ওপরোক্ত চরিত্রের তেমন একজন কর্মক্ষেত্রে তাকে প্রতিনিয়ত উপদ্রব করবে। কাজে সমস্যা সৃষ্টি করবে। ফলে সুষ্ঠভাবে কোন কাজ করা সম্ভব হবে না।

কাজের সুষ্ঠ পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে হলেও তেমন যোগ্য বা অযোগ্যদেরকে তাদের প্রাপ্য দিয়ে দেয়া ভাল। কেননা সকলের সন্তুষ্টি ব্যাতিত কাজ-উন্নয়ন কিছুই অর্জন করা সম্ভব হবে না। অযাচিত 'বিরোধী পক্ষ ব্যবস্থাপনায়' সময়, অর্থ ও এনার্জি ব্যায় করতে হবে। এমনকি কাজও বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হতে পারে। আবার ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপও ঘটতে পারে। তাই ওপরোক্ত ধারণাটিকে বাস্তবায়ন করতে হবে এ কারনে যে, তাদেরও কাজ করার দক্ষতা বা সক্ষমতা আছে কিংবা দুষ্টুমি করার সক্ষমতা আছে, অথচ কর্মক্ষেত্রে কর্মের এত সংস্থান বা আসন নেই কিংবা তারা বিদ্যমান পরিচালনাকারীদের নির্দেশ মেনে কাজ করতে মানসিকভাবে প্রস্তুত নয়।

একই জায়গায় অধিক যোগ্য লোকের ভীড় সমস্যা সৃষ্টি করে। আবার এ সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না যে, এই ঠেলাঠেলি না থাকলে কিছু লোক চেয়ার পেয়ে বসে বসে আয়েশে কর্মহীনভাবে জীবন-যাপন করবে। যাকে একচেটিয়া বাজারের কু-ফল বলা যেতে পারে। অতএব প্রতিযোগীতাও প্রয়োজন আছে, তবে নোংরামিটা না।

বর্তমানে কর্মক্ষেত্রগুলিতে যে প্রতিযোগীতা চলছে, তা এক জায়গায় অধিক শিক্ষিত বা যোগ্য বা দক্ষ লোকের একত্রিতকরণজনিত সমস্যা। কেউ প্রান্তিকে

গিয়ে কাজ করতে চাইছে না। কেউ স্বাচ্ছন্দ পরিত্যাগ করতে চাইছে না। সবাই এক স্বাচ্ছন্দময় অবস্থানে টিকে থাকার লড়াইয়ে ব্যাস্ত। কিংবা উদ্বৃত্ত দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি হচ্ছে সে কারনে এ প্রতিযোগীতা। এটি বলা হচ্ছে কেবলমাত্র কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিতদেরকে বিবেচনায় রেখে। অথচ অসংখ্য শিক্ষিত ও যোগ্য বেকারও আছে। ফলে সম্ভাব্য আশংকাজনক পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ!

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, ডাক্তার কিংবা ইঞ্জিনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। তবে ডাক্তারি বা ইঞ্জিনিয়ারিং এর জ্ঞানটা গুরুত্বপূর্ণ। যা থাকে বইয়ের পাতায় বা অন্য কোনভাবে সংরক্ষিত। যিনি জানেন তিনি বলে দিলে বা সহায়তা করে দিলে মুহুর্তে সে জ্ঞান অন্যে ধারণ করতে পারে। বছর বছর অতিবাহিত করে একটি পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা করতে হয় না। বই পাঠ করে মস্তিস্ক যা ধারণ করবে, কেউ সেটি বলে দিলে দ্রুততম সময়ে মস্তিস্ক সে একই জ্ঞানটিই ধারণ করবে দ্রুততম সময়ে। অতএব বিশেষজ্ঞের মতামত প্রান্তিকে পৌঁছে দেয়া সম্ভব হলে, স্বাচ্ছন্দ পরিত্যাগ করে কাউকেই নিজ অবস্থান ছেড়ে প্রান্তিকে গিয়ে থাকতে হবে না বা কাজ করতে হবে না।

জগতে দু'ধরণের মানুষ আছে। এক প্রকার মানুষ স্ব-প্রনোদিত হয়ে কাজ করে। আরেকদলকে তাড়িয়ে বেড়াতে হয়। ধরণ বুঝে মানুষ চালানো তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে স্ব-প্রণোদিত হয়ে কাজ করে, তাকে তাড়িয়ে বেড়ালে কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। আবার যাকে তাড়িয়ে বেড়ানো প্রয়োজন, তাকে ছেড়ে দিলেও কাজ বন্ধ হয়ে যাবে।

অধিক শিক্ষিত হয়ে এক জায়গায় একে অন্যের সাথে প্রতিযোগীতায় লিপ্ত না হয়ে প্রান্তিকে ছড়িয়ে যেতে হবে। স্ব-প্রণোদিত হয়ে যে যেখানে যেভাবে কাজ করতে ইচ্ছুক তাকে সেভাবেই কাজ করতে দিতে হবে। অর্থাৎ কেউ যদি প্রান্তিকে গিয়ে হাতে-কলমে কাজ শিখতে বা করতে ইচ্ছুক হয়, তবে তাকে সেভাবে কাজ করার সুযোগ করে দিতে হবে। আবার কেউ যদি নিজ অবস্থানে থেকে কেবল বিশেষায়িত জ্ঞান সরবরাহ করে কাজ করতে ইচ্ছুক হয়, তবে তাকেও সেভাবেই কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে। সেক্ষেত্রে অবশ্য নিজের প্রয়োজনীয়তা বা চাহিদা বা বাজার সৃষ্টি করে নিতে হবে প্রত্যেকের নিজেকেই।

কাজের জন্য মানুষ প্রয়োজন আছে। তবে বিশেষায়িত জ্ঞানের জন্য অনেক মানুষ প্রয়োজন নেই। একজন জ্ঞান ধারণ করলে অন্যরা তাকে অনুসরণ করতে পারে।

দক্ষ, যোগ্য বা জ্ঞানসম্পন্ন উদ্বৃত্ত কিছু মানুষ যদি কাজ না পায় বা সুনির্দিষ্ট শর্তে কাজ করতে ইচ্ছুক না হয়, তবে তেমন মানুষদের উপার্জনের জন্যও একটি সুন্দর ব্যবস্থাপনা থাকতে হবে। এটি যেমন সার্বিক সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজন, তেমনি আবার স্রষ্টার সৃষ্টির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিভঙ্গী থেকেও প্রয়োজন। পৃথিবীতে আগত বা বিধাতা প্রেরীত প্রতিটি জীবের জন্য একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা থাকতে হবে বা করতে হবে। এটিই দায়িত্বশীলতা। এ দায়িত্বই মানুষের তথা জগত পরিচালনাকারীদের কাঁধে। প্রশ্ন হচ্ছে, সেক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনাটি কেমন হবে?

অতিরিক্ত বা উদ্বৃত্ত জনগোষ্ঠীকে নিঃশেষ করে দেয়া যাবে না। আবার সমাজের বোঝারূপেও রাখা বা গন্য করা সমীচীন নয়। অর্থাৎ যারা যোগ্য, দক্ষ অথচ কর্মের সাথে সম্পৃক্ত নয় বা হতে পারছে না বা হতে ইচ্ছুক নয় কিংবা স্বাধীনভাবে চলতে চায় এবং যাদেরকে আপাতদৃষ্টিতে কারও ওপরে নির্ভরশীল বলে মনে করা হয় বিদ্যমান আর্থিক ব্যাবস্থার কারনে, এখানে তেমন মানুষদের কথা বলা হচ্ছে। কখনও কোনদিন কোন কারনে তেমন মানুষও প্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে পারে। ঠিক যেমন আপাত প্রতিয়মান দুষ্ট বিরোধীদলও একদিন মূল ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। বিধাতার খেলা বোঝা কঠিন! তাই তাদেরকেও প্রয়োজনে ব্যবহার করার জন্য প্রস্তুত রাখতে হবে। ফলে প্রত্যেকের জন্যই জীবন চক্রের প্রতিটি কর্ম সুসম্পন্ন করার মতো একটি ব্যবস্থা থাকতে হবে। তারা কোন অবদান রাখছে না বা রাখবে না এমনভাবে ভাববার অবকাশ নেই। তাদের জন্যও বরাদ্দ বা উপায় থাকতে বা রাখতে হবে। সেটিকেও বিনিয়োগ ভাবতে হবে, কোনদিন কাজে না লাগলেও।

অতএব এ বিষয়টি অর্থাৎ প্রতিটি সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত যোগ্য ব্যাক্তি বা জনগোষ্ঠীকে নিয়ে গুরুত্বের সাথে ভাবতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে- একটি সুন্দর মানবজীবন ধারণের জন্য প্রত্যেকের উপার্জনের কোন না কোন উপায় থাকতে হবে! অথচ কর্মের যথেষ্ট বা মন মতো সংস্থান নেই। তাহলে তারা উপার্জন করবে কি উপায়ে? এখান থেকেই আজব অর্থনীতির ভাবনার শুরু। এখান থেকেই আজব অর্থনীতির ভাবনাটিকে বুঝতে হবে।

দক্ষ, যোগ্য কিংবা একেবারেই অযোগ্য অথচ কাজ বা কাজের পরিবেশ ব্যাহত করায় যোগ্য এমন মানুষদের জন্যও কিছু একটা ব্যবস্থা সৃষ্টি করতে হবে। বিধাতার সৃষ্টির সকলের বেঁচে থাকার জন্যই একটা ব্যবস্থা থাকতে হবে বা করতে হবে। এগুলিই মানুষের করণীয়। এগুলিই পরীক্ষা। কিন্তু তাদের জন্য কি উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে? কিংবা তাদেরকে কিভাবে মূল কাজ বা কাজের কাজ থেকে সরিয়ে রেখে ব্যাস্ত রাখা যেতে পারে এবং উপার্জনের উপায় করে দেয়া যেতে পারে এটিই ভাবনার বিষয়।

কিছু খেলার উদ্ভব ঘটাতে হবে। তারা খেলবে। তবে এ খেলা কেবল খেলাই নয়। খেলাগুলি নানা প্রকারের হবে। খেলা যেমন সময় কাটাবার উপায় হবে, নিজেদেরকে ব্যাস্ত রাখার মাধ্যম হবে, আনন্দের উপকরণ হবে- একই সাথে খেলাগুলি নিজ নিজ বিশেষায়িত ক্ষেত্রে অধিকতর দক্ষ ও যোগ্য হয়ে গড়ে ওঠার শিক্ষা ও প্রশিক্ষনেরও মাধ্যম হতে পারে। আবার সব খেলাই পরিশেষে অর্থ উপার্জনেরও মাধ্যমে হবে। খেলাগুলিকে সেভাবে সৃষ্টি করতে হবে।

দক্ষ, যোগ্য কিংবা একেবারেই অযোগ্য অথচ কাজ ব্যাহত করায় যোগ্য এমন মানুষেরা অনর্থক ভীড় করে কর্মক্ষেত্রে অযাচিত প্রতিযোগীতা সৃষ্টি করার প্রয়োজন নেই। তাদেরকে মূল কাজের জায়গা থেকে কোন একটা উপায়ে সরিয়ে রাখা হবে বা ব্যাস্ত রাখা হবে। তারা কিছু একটা নিয়ে ব্যাস্ত থাকবে। এতে সত্যিকার কাজের মানুষ কাজ করার সুযোগ পাবে বা তাদের কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে এবং অন্যরা এ ব্যাবস্থায় যথাসময়ে বা প্রয়োজনে কাজ করার জন্য অপেক্ষমান থাকবে। যেমন- সব দেশে সেনাবাহিনী থাকে। তারা অপেক্ষমান থাকে প্রয়োজনে যুদ্ধ করার জন্য। সারা জীবনে একটি যুদ্ধের মুখোমুখী না হলেও তারা চাকুরীর মাধ্যমে উপার্জন করে, সংসার চালায়, জীবন পরিচালনা করে। প্রতিটি মানুষকে এভাবে তার আগ্রহের বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত কোন বিভাগের আওতায় নিয়ে আসতে হবে এবং সেখান থেকে তার উপার্জনের জন্য কিছু বরাদ্দ রাখতে হবে। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে যে, বিধাতাও আমাদেরকে এমনিভাবে নানান খেলায় নিয়োজিত রেখেছেন এবং সকলের জন্য আলো, বাতাস, আহারের ব্যবস্থা করেছেন।

কিভাবে উল্লেখিত ধারণাটির বাস্তবায়ন সম্ভব হবে? প্রথমে দর্শনটিকে বুঝতে হবে। ওপরে উল্লেখিত উদ্বৃত্ত জনগোষ্ঠীকে কাজ থেকে ‘আপাত’ দুরে সরিয়ে রাখাও

সমাজের জন্য একটি বড় অবদান। সে অবদানের জন্যই তাদেরকে পারিশ্রমিক দিয়ে যেতে হবে বা সে কারনেই তাদের জন্য বরাদ্দ থাকতে হবে। এটিই এর যৌক্তিকতা। বিষয়টিকে সেভাবে ভাবতে বা বুঝতে হবে। এখানে 'আপাত' শব্দটি ব্যাবহার করা হল, কেননা কখনও তারাও প্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে পারে। ফলে এটিও বিনিয়োগ। যেমন পুলিশ কাজ করে সমাজে শান্তি-শৃংখলা রক্ষার্থে। সমাজে তাদের বিরাট অবদান। বিনিময়ে পারিশ্রমিক পায়। তারা সমাজে অবদান রাখতে পারে সমস্যা সৃষ্টি করা লোকগুলি থাকার কারনে। সমস্যা সৃষ্টি করা মানুষ না থাকলে তাদের গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজ নেই।

সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি করা মানুষগুলি যদি নিজেরাই বিশৃংখলা সৃষ্টি না করে, বা বিশৃংখলা সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকে বা তাদেরকে সমাজে অনাসৃষ্টি করা থেকে কোন উপায়ে দুরে সরিয়ে রাখা সম্ভব হয়, তবে একই দর্শনে তারাও পুলিশের মতোই সমাজে অবদান রাখছে বলে ভেবে নেয়া যেতে পারে। বরং তাদেরকে একটি উপায়ে দুরে সরিয়ে রাখার কারনে পুলিশি ব্যবস্থারও আর প্রয়োজন হচ্ছে না বলে ধরে নেয়া যেতে পারে দর্শনটিকে কেবলমাত্র বোঝার সুবিধার্থে। ফলে পুলিশি ব্যাবস্থার মতো এ ব্যাবস্থাটিকে আরও বড় সামাজিক অবদানমূলক ও উন্নতর চিন্তা বা ধারণার ফসল বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। অর্থাৎ পুলিশের মতো একটি বিশাল বাহিনী লালন-পালন করে বাড়তি খরচ, সময় কিছুই ব্যায় করতে হচ্ছে না। বরং তারা অর্থাৎ উদ্বৃত্ত জনগোষ্ঠী বা সমাজে সমস্যা সৃষ্টি করা সম্ভাব্য লোকগুলি খেলার মাধ্যমে শিক্ষা ও প্রশিক্ষন নিয়ে নিজেদেরকে প্রস্তুত রাখছে দুর্যোগ বা প্রয়োজনে কাজে নামবার জন্য। দর্শনটিকে বোঝার সুবিধার জন্য বিষয়গুলিকে এভাবে ভাবতে হবে। যেমন যুদ্ধ না হলেও সেনারা প্রস্তুতি নিতে থাকে যুগের পর যুগ এবং বেতনভূক্ত কর্মচারীরূপে থেকে উপার্জন করে, সংসার বা জীবন চালায়। একই দর্শনে বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের যদি অনাসৃষ্টি করা থেকে বিরত বা দুরে সরিয়ে রাখা যায়, তবে তারাও পুলিশের মতোই শৃংখলা রক্ষায় অবদান রাখার কারনে পারিশ্রমিক পাওয়ার যোগ্য।

পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা কেউই কোন অর্থ উপার্জন করছে না। অর্থাৎ অর্থ মূল্যের সংযোজনের ভিত্তিতে জাতীয় অর্থনীতিতে তাদের কোন উৎপাদনশীলতা নেই। তাহলে তাদের বেতনের টাকা আসছে কোথা থেকে? এ এক প্রশ্ন?

সত্যিকার অর্থে যারা উৎপাদনশীলতার সাথে জড়িত বা অর্থ উপার্জন করে বা জাতীয় অর্থনীতিতে অর্থের উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করে, বাহিনীর সদস্যদেরকে বেতন দিতে গিয়ে উদ্বৃত্ত সৃষ্টিকারীদের ভাগ কমে যায়। এ বিষয়টি জানান দেয় যে, অর্থনীতিতে কিছু মানুষ কাজ করলে অনেক মানুষ বসে বসেও খেতে পারে। তবুও তাদেরকে কিছু একটা কাজে ব্যাতিব্যাস্ত রাখা। যেমন মানুষ স্বর্গে জীবন-যাপন করবে। হাত বাড়ালেই সব পাবে। সেখানেও সত্য আছে, আছে সূত্র বা অংক। কোন কিছুই অলৌকিকভাবে ঘটে না। বিধাতা মহান কারিগর। তিনি জানেন সব সূত্র। তবে এ ধারণায় অবশ্য উদ্বৃত্ত জনগোষ্ঠীকে স্বর্গের ন্যায় বসে বসে না খাইয়ে একটি চোর-পুলিশ খেলায় নিয়োজিত রেখে উপার্জনের উপায় সৃষ্টি করার কথা বলা হয়েছে।

আরও উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। যেমন সংসারে একজন উপার্জনক্ষমের উপার্জন থেকে দশজন নির্ভরশীলের জীবন চলে। রাষ্ট্রিয় কিংবা বৈশ্বিক সিস্টেমকেও সেভাবে দাড় করাতে পারলে সকলের কাজ করতে হয় না। অনর্থক বা অনাসৃষ্টির প্রতিযোগীতায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে হয় না। তথাপি সম্ভাব্য বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী বা অযাচিত প্রতিযোগী বা উদ্বৃত্ত মানব শক্তিকে, অর্থাৎ যারা ভবিষ্যতে কখনও প্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে পারে, তাদের জন্য এ ধারণায় বসে না থেকে গেম খেলে অর্থ উপার্জন করার একটি বিকল্প উপায় সৃষ্টি করার কথা বলা হচ্ছে। অর্থাৎ কিছু একটা করতে বলা হচ্ছে। ব্যাস্ত রাখতে বা ব্যাস্ত থাকার একটি ব্যাবস্থার কথা বলা হচ্ছে।

বস্তুত অর্থনীতিতে কিছু মানুষ কাজ বা পরিশ্রম করলে অনেক মানুষ কাজ না করে বসে বসেও খেতে পারে। একটি প্রতিষ্ঠানেও তাই। প্রতিষ্ঠানে সব কর্মীর কাজ গুরুত্বপূর্ণ নয়। আবার অনেকে কাজ ফাঁকি দিয়েও বেতন পাচ্ছে। তাতে কোন সমস্যা হচ্ছে না। কথাটি এ কারনে বলা হল যে, অপ্রয়োজনে হলেও কিছু কাজ সৃষ্টি করে সকল মানুষের কর্মের সংস্থান করার গুরুত্বকে তুলে ধরার জন্য। সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিতে বিষয়টি ক্ষতিকর মনে হলেও সমাজ ও সার্বিক অর্থনীতির দিক বিবেচনায় বিষয়টি উত্তম। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে পরিস্কার করে তুলে ধরার চেষ্টা করি।

যদি সকল মানুষের সকল কাজ রোবটের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়, তবে মানুষের কাজ কোথায়? কোন মানুষের কোন কাজ থাকবে না। একজনের ইশারায় সব চলবে। মানুষ বসে বসে খেতে পারবে। অতএব কাজ না করেও খেতে পারার

উপায় আছে। তবে সর্বদাই অল্প সংখ্যক কিছু মানুষকে কাজে নিয়োজিত থাকতে হবে। অন্যরা স্বেচাছায় চাইলে তাদের জন্য কিছু কাজ সৃষ্টি করে দেয়া যেতে পারে। আবার গেম এর মতো কিছু একটা ব্যাবস্থা করার মাধ্যমেও তাদের উপার্জন করে খেতে পারার ব্যবস্থা করে দেয়া যেতে পারে। বস্তুত ধীরে ধীরে অর্থনীতি একদিন তেমন পর্যায়েই যাবে যে হাত বাড়ালেই মানুষ সব পাবে। তবে অলস বা কর্মহীন মানুষকে দুষ্টুমি করা থেকে বিরত রাখার জন্য কিছু উপায় বা ব্যাবস্থা সৃষ্টি করতে হবে।

আল্লাহ সব পারেন। তিনি চাইলে বসিয়ে বসিয়ে সবাইকে খাওয়াতে পারেন। আদম-হাওয়া সেভাবে খেয়েছে। কিন্তু চিরকাল মানুষের তেমনটা ভাল লাগবে না। তাই কিছু একটা করতে দিতে হবে। সুখী মানুষ যেন দুষ্টুমিতে নিজেদেরকে জড়িয়ে ফেলতে না পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় ও উপকারী কিছু গেম খেলার কথা বা সৃষ্টি করার কথা এখানে বলা হচ্ছে।

ক্রিকেট খেলে, ফুটবল খেলে কি মানুষ ভাল নেই? সমগ্র মানব জীবনও তেমনি এক খেলা। বস্তুত প্রয়োজন অর্থের প্রবাহের একটি উপায় সৃষ্টি করা। কিন্তু আল্লাহর ব্যবস্থাপনায় কখনও সেটিরও প্রয়োজন নেই। কিন্তু মানুষের তেমন জীবন এক সময় ভাল লাগবে না। তাই এ বিচিত্র জীবন! বিচিত্র জগত! যেমন ঝগড়া না থাকলে কখনও কখনও সংসার জীবনও ভাল লাগে না। তেমনি বাজার দখলে যুদ্ধ-বিগ্রহ মানুষকে ব্যাতিব্যাস্ত রেখেছে। বেঁচে গেলে বা বিপদ কেঁটে গেলে তেমন জীবনও ভাল লাগে। মানুষের কিছু ইগো আছে। তাই মানবজীবন সে সবের কারনেও দুঃখময়। নইলে আনন্দময় স্বর্গীয় জীবনও যাপন করা সম্ভব।

সমগ্র মানব জীবনও এক অর্থে খেলা। কেউ আমাদেরকে খেলায় নিয়োজিত করে রেখেছে। খেলা খেলে অর্থ উপার্জন করি। আহারের সংস্থান করি। অর্থনীতির এক আজব খেলা!

মিলিয়ন মিলিয়ন বছর হয়েছে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে। পদ্মা নদীতে সেতু ছিল না। জীবন কি থেমে থেকেছে? জীবন চলেছে। থেমে থাকেনি। আজও পদ্মা সেতু না হলেও জীবন চলে যাবে। কিন্তু এর কর্মযজ্ঞ অর্থের প্রবাহকে পদ্মামুখী করেছে। কিছু মানুষের হাতে অর্থ এসেছে, যারা উক্ত এলাকায় অতীতে দরীদ্র ছিল। পদ্মা সেতুর মহা কর্মযজ্ঞের বদৌলতে তাদের বা এলাকাবাসীর জীবনে স্বাচ্ছন্দ এসেছে।

বস্তুত সেতু না, প্রয়োজন সর্বত্র অর্থের প্রবাহের একটি চ্যানেল সৃষ্টি করা। স্থান বা সেকটর চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় স্থানে অর্থের প্রবাহ সৃষ্টি করতে হবে। যেন প্রতিটি মানুষের হাতে অর্থ আসে। সেটি গেম বা খেলার মাধ্যমে সৃষ্টি করেও করা যেতে পারে। তবে বাস্তব কর্মের মাধ্যমে অর্থের প্রবাহ সৃষ্টি করা হলে বাড়তি লাভ এই যে, এভাবে একটি সেতুও পাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে।

কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি বা ঠেলাঠেলি করার প্রয়োজন নেই। প্রত্যেককে তার নিজের মনের ইচ্ছে মতো কাজ করতে দিতে হবে। হয় কেউ প্রান্তিকে কাজ থাকলে সেখানে যাবে, না হয় কাজ করবে না গেম খেলবে। খেলা থেকেও তার উপার্জনের একটা ব্যবস্থা করে দেয়া হবে। প্রয়োজনে সেখানেও ঋণের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। অর্থনীতির এক আজব খেলা! উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়ের দর্শনটি উপস্থাপনের চেষ্টা করছি।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, ডাক্তারি বা ইঞ্জিনিয়ারিং এর মতো হাইলি টেকনিকাল বিষয়গুলি ছাড়া অন্য কাজগুলি সবাই সবটা করতে পারে। একজন অফিস সহকারির কাজের উদাহরণ তুলে ধরি। কেননা কাজ না থাকলেও মানুষ হিসেবে তারও বেঁচে থাকতে হবে এবং মোটামুটি ভালভাবে বেঁচে থাকতে হবে। সংসার হবে। সন্তানাদি হবে। তাদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে। এটি কেবল ব্যাক্তিরই বিষয় নয়। সামষ্ঠিক অর্থনীতির ভাবনার বিষয়। নয়তো সমাজ সার্বিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। উন্নয়ন কেবল ব্যাহতই না, একদিন ধ্বংসও হয়ে যাবে। কাউকে বেকার রাখা যাবে না।

একজন অফিস সহকারী অফিসে চেয়ার-টেবিল পরিস্কার করে থাকে। ফাইল আনা-নেওয়া করে। বসের খাবার নিয়ে আসে ইত্যাদি। অর্থনীতিতে সে কিছুই যোগ করছে না। কোন উৎপাদনশীল কিছু করছে না। তার কর্ম থেকে প্রতিষ্ঠানের কোনরকম অর্থ আয় হচ্ছে না। অথচ অনুৎপাদনশীল এ কাজগুলি করে সে অর্থ উপার্জন করছে। সংসার চালাচ্ছে। যেহেতু তার কাজ থেকে প্রতিষ্ঠানে কোন অর্থ সংযোজন হয়নি, তাহলে তার বেতনের টাকা কোথা থেকে আসছে? ভাবতে হবে। কেননা তার নিজের কর্ম থেকে প্রতিষ্ঠানে বা জাতীয় জীবনে কোন অর্থমূল্য সংযোজিত হচ্ছে না। তার কর্মের বিনিময়ে কোন অর্থমূল্য সংযোজন ব্যাতিতই কেবল ব্যায় হচ্ছে। অতএব বুঝতে হবে যে, তার বেতনের অর্থ অর্থ-মূল্য উৎপাদনশীল অন্য কারও উপার্জিত অর্থ থেকে আসছে।

সত্য হচ্ছে এই যে, যেভাবেই হোক না কেন এভাবেই একটি লোকের কর্মের সংস্থান হয়েছে। সমাজে সে বেকার নয়। ফলে সমাজের সে বোঝা নয়। সে নিজেই নিজের সংসার চালাচ্ছে, এভাবেই আমরা বিষয়গুলি বুঝে থাকি।

তার ওপরে হয়তোবা আরও ক'জনার পেট চলছে। তার ওপরে যাদের পেট চলছে, তারা কোন আয় করছে না। অর্থাৎ তারা তার ওপর নির্ভরশীল। এমনিভাবে একজনের কাজের ফল দশজনে ভোগ করছে। এটি একটি ব্যাক্তিক উদাহরণ। প্রতিষ্ঠান বা সমাজের চিত্রটিও তেমনই। বস্তুত তাকে চালাচ্ছে কোন উৎপাদকের উৎপাদিত দ্রব্যের বিনিময় মূল্যের উদ্বৃত্ত। অর্থাৎ পরোক্ষে সুদুর থেকে তাকে ও তার সংসার চালাচ্ছে অজানা-অচেনা ঐ উৎপাদকের শ্রম; বা ঐ উৎপাদক, যার উৎপাদন থেকে আয় আসছে।

যদি অফিস সহকারী না থাকতো। বসকে নিজের খাবারের ব্যবস্থা নিজেকে করতে হতো। অফিসের ফাইল বস নিজেই স্থানান্তর করতো। নিজের চেয়ার-টেবিল নিজে পরিচ্ছন্ন করতো। তবে এ লোকটির প্রয়োজন হতো না। তার কর্ম সংস্থান হত না। তখন তার জন্য বরাদ্দকৃত উক্ত বেতনের টাকাটা কোথায় যেত? বা তার ভাগের ঐ টাকাটা কে পেত? যে কিনা ঐ টাকার ভাগ ছেড়ে দিয়ে ঐ অফিস সহকারীর সংসার চালাচ্ছে?

যদি একজনও অফিস সহকারী না থাকত তবুও অফিস চলতো। তাতে কারও কষ্ট হয়তোবা একটু বেশী হতো। আবার ঠিক একই সূত্রে চাইলে তিনজন অফিস সহকারী রেখেও অফিস চালনা করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে তিনজনকেই পারিশ্রমিক দিতে হবে। তাতে হয়তোবা কারও ভাগে আরও একটু কম পরবে। কেউ কম নিলে বা নিজের উপার্জনের ভাগ থেকে কিছু ছেড়ে দিলে সবার জন্যই বরাদ্দ রাখা সম্ভব। কাউকে আর ভিক্ষে করতে হবে না। সকলেরই কর্ম সংস্থান করা সম্ভব।

এ ব্যবস্থার ফলে যার ভাগে কম পরবে নিশ্চয়ই সে পার্থিব জীবনে জৌলুসপূর্ণ জীবন-যাপন করে। তাদের ভাগ থেকে কিছু জৌলুস ছেড়ে দিলে মানুষকে বেকার থাকতে হবে না। ভিক্ষে করতে হবে না। অফিস সহকারী হিসেবে অধিক লোককে নিয়োগদানের ফলে সংসার নিয়ে তারা খেয়ে-পড়ে বেঁচে থাকতে পারবে। তারা একটি ডাটাবেইজের হিসেবের আওতার মধ্যে থাকবে এবং যোগ্যতা অনুযায়ী উপার্জন করবে। মানুষ হিসেবে একজনের একই সমাজে জৌলুসপূর্ণ জীবন-যাপন ও একজনের ভিখারীর মতো জীবন-যাপন দু'জনের জন্যই অসন্মানজনক। অন্তত

কল্পনায় সৃষ্টিকর্তার দিক বিবেচনার দিক থেকেও। তাই কারও ভাগ থেকে ছেড়ে দিয়ে হলেও জগতের সকলের জন্য একটি বরাদ্দ রাখার ব্যবস্থা থাকতে হবে। পৃথিবীতে একটি লোক আগমন করলেই তার জন্য ব্যবস্থা তৈরী থাকতে হবে। এমনই হতে হবে ব্যবস্থা। হয়তোবা সেটি ততটা জৌলুসপূর্ণ নাও হতে পারে। অন্তত মৌলিক চাহিদাগুলি তারা যেন পুরণ করতে পারে সেভাবে ব্যাবস্থাকে সাঁজাতে হবে। এটাও বুঝতে হবে যে, যারা জৌলুসপূর্ণ জীবন-যাপন করছে তারা প্রয়োজনাতিরিক্ত মুনাফা করছে। অতিরিক্ত মুনাফা করার পথ বন্ধ করে দিলে অর্থের প্রবাহ কোনদিকে যায় সেটিও গবেষনা করে দেখা প্রয়োজন।

পঞ্চাশ বছরে একটিও যুদ্ধ হয়নি। অথচ সেনাবাহিনীর প্রতিটি সদস্যের জন্য বেতন বরাদ্দ আছে। অর্থ আসছে কোথা থেকে? তারা কি কাজ করছে? তারা প্রতিদিন যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। অর্থাৎ প্রশিক্ষন নিচ্ছে। তেমনি এখন যারা বেকার আছে তাদেরকেও একটি প্রতীক্ষিত কোন কর্মের বিপরীতে তাদের আগ্রহের কোন সেক্টরে বেতনভূক কর্মী বানিয়ে নিলে সমস্যা কোথায়? তাতে কেউ বেকার থাকবে না। একটি কাজের হিসেবের আওতার মধ্যে থাকবে সকল মানুষ। কেউ কাউকে বেকার বলবে না। সবাই সমাজে সন্মানজনক অবস্থানে থাকবে। সমাজের সার্বিক মঙ্গলের দিক বিবেচনায় এটি ভাল! সৃষ্টিকর্তার সকল সৃষ্টির প্রতি সুবিচারের দিক বিবেচনায়েও এটি উত্তম ভাবনা।

টেলিভিশনে খবরের মধ্যে ইশারা ভাষা প্রদর্শন করে একজন অর্থ উপার্জন করছে। সংসার চালাচ্ছে। সন্তানাদির লেখাপড়ার খরচ বহন করছে। কোটি মানুষের মধ্যে ক'জন বুঝে সে ভাষা? আর যারা বুঝে তাদের ক'জন খবর দেখে? কিংবা তাদের মধ্যে খবরের যন্ত্র কেনার সামর্থ আছে ক'জনার? বা তাদের খবর দেখেও বা কি লাভ? খবর এমনিতেও জানা হয়ে যাবে। কিছু সময়ের হেরফের মাত্র। বক্তব্যটিকে নেতিবাচকভাবে নেবেন না। কথার কথা বলছি।

এমনিভাবে বিশ্ববিদ্যালয়সমুহে প্রতিটি বিষয়ে পড়ুয়াদের জন্য অতি জরুরী না হলেও বা অপ্রয়োজনীয় হলেও কাজ সৃষ্টি করে এক এক জনকে এক একটি কাজে নিয়োজিত করে দিতে হবে বা নিজ বিষয়ের কর্মে এনলিষ্টেড করে রেখে কিছু পারিশ্রমিক দিয়ে যেতে হবে প্রত্যেককে। যেন মৌলিক চাহিদাগুলি একজন পুরণ করতে পারে এবং নিজের মতো করে ভাবতে, চলতে পারে ও কাজ করতে পারে।

এ ব্যবস্থা সৃষ্টিশীলতার জন্যও প্রয়োজনীয়। বিধাতার সৃষ্টির সকলের জন্য এমন ব্যবস্থা থাকতে হবে। 'একটি জন্ম - তো একটি নিশ্চিত কর্ম'।

বাড়তি উপার্জনের জন্য কেউ চাইলে বাড়তি শ্রম দেবে। বিষয়ের ওপর অধিক পড়ালেখা করবে। কিন্তু জোর করে কাউকে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার বানাবার প্রয়োজন নেই। একই স্থানে অধিক যোগ্য লোকের নিয়োগদান করে অসুস্থ প্রতিযোগীতা সৃষ্টি করারও প্রয়োজন নেই। এতে কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ ব্যাহত হয়।

যোগ্য অথচ উদ্বৃত্ত কর্মীদের জন্য তবে কি ব্যবস্থা হবে? যোগ্যদের মধ্যে যারা চাইবে তারা প্রান্তিকে গিয়ে নিজেদের স্থান করে নিতে পারবে। যে প্রান্তিকে যেতে চাইবে না সে মৌলিক চাহিদার প্রাপ্ত অর্থের সীমানার মধ্যে থেকে নিজ অবস্থানে অবস্থান করতে পারে। নিজের মতো করে চলতে পারে। তবে তাদেরও অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের নানান ব্যবস্থা থাকতে পারে। যেমন তারা গেম খেলে বাড়তি উপার্জন করতে পারবে। গেমের মাধ্যমে তারা তাদের নিজেদের বিষয়ে বা অন্য যে কোন আগ্রহের বিষয়ে অধিকতর প্রশিক্ষন নিতে পারে। প্রয়োজনে ডাক পেলে কর্মে নিয়োজিত হতে পারে। ইচ্ছুক না হলে কেউ কর্ম করবে না। অন্য কেউ তার স্থান পুরণ করবে। গেম খেলে সবাই যেমন প্রস্তুত থাকবে, তেমনি সেখান থেকে বাড়তি উপার্জনেরও ব্যবস্থা থাকবে। সেভাবে পরিকল্পনা সাজাতে হবে। এ বিষয়ে এখানে এর অধিক আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। কেননা এটি একটি উপস্থাপিত ধারণা মাত্র।

গেমের মাধ্যমে যেমন গাড়ি চালনা, বিমান চালনা, যুদ্ধ পরিচালনা, শল্য চিকিৎসার জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব, বিষয়টি তেমন। তবে তাদের জন্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর নিজ নিজ বিষয়ে হাতে-কলমে কাজ করার বা শেখারও ব্যবস্থা রাখা বা করা যেতে পারে। পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যারা চাইবে নিজেকে প্রস্তুত করে তোলার জন্য অংশ নিতে পারবে সেই সকল কার্যক্রমে। সবই হবে ঐচ্ছিক।

কর্মের সকল ক্ষেত্রে আগ্রহী যোগ্য একদল কাজে নিয়োজিত হবে। একদল আগ্রহী কাজে নিয়োজিতদের পাশাপাশি অবস্থান করবে। একদল দুরে থেকে বা নিজ স্বাচ্ছন্দপূর্ণ অবস্থানে অবস্থান করে গেম খেলবে। গেমের মাধ্যমেই আধুনিক ও উচ্চতর জ্ঞান অর্জন করবে। সময়ে সময়ে আয়োজিত প্রশিক্ষনে অংশ নিয়ে হাতে কলমে শিখবে। কর্মক্ষেত্রে অধিক প্রতিযোগী কমে আসবে। কাজের মানুষ কাজ করবে। কাজে নিয়েজিতরা অবশ্যই অধিক পারিশ্রমিক পাবে। যারা প্রান্তিকে যাবে

তারাও তুলনামূলক অধিক পরিশ্রমিক পাবে। যারা যোগ্য অথচ প্রান্তিক পর্যায়ে যেতে ইচ্ছুক না, তারা মৌলিক চাহিদা পুরণে যে অর্থ দেয়া হবে সেটি পাবে। ওর মধ্যেই তাদেরকে চলতে হবে। তবে তাদেরও বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা থাকবে। যা তারা বিশেষায়িত জ্ঞান ট্রান্সফার করে কিংবা গেম খেলে উপার্জন করতে পারবে।

এভাবে দেশের সব মানুষ কর্মে নিয়োজিত থাকবে। কিন্তু একটি দেশের সম্পদের সীমাবদ্ধতা আছে। তাই এ ব্যবস্থাকে বৈশ্বিক পরিসরে নিয়ে যেতে হবে। তাতে উপার্জনের আওতা আরও বৃদ্ধি পাবে।

নানান ধরণের বিষয়ভিত্তিক গেম উদ্ভাবন করা যেতে পারে। তবে এ ব্যবস্থার আরেকটি ভাল মাধ্যমের উদাহরণ হচ্ছে- 'ক্যাপিটাল মার্কেট'। আর এর পরিসর বা আওতাকে বৃদ্ধি বা সক্ষমতাকে বৃদ্ধি করার জন্য ছোট বড় সকল ব্যবসা বা কর্মকে এ মার্কেটের আওতার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে।

এ ব্যবস্থা সকলের জন্য স্বাচ্ছন্দ সৃষ্টি করবে। মানুষ অপ্রয়োজনীয় অফিসিয়াল চাপের নামে জর্জরিত না থেকে সৃষ্টিশীল হবে। অনুসন্ধানি বা সৃষ্টিশীল মনের সৃষ্টিশীলতা বৃদ্ধি পাবার সুযোগ সৃষ্টি করে দেবে এ ব্যবস্থা।

একজন অফিস সহকারী নিয়োগ দিলে বেতন দিতে হয়। অফিস সহকারী না থাকলেও অফিস চালানো সম্ভব। মাঝখানে একটি টাকা বা অর্থের হিসেব। একটি নিয়োগ হচ্ছে অর্থ প্রবাহের একটি দিকের সৃষ্টি। অফিস সহকারী থাকলে টাকাটা সে পায়। না থাকলে টাকাটা কে পায় বা কোথায় যায়? কোথা থেকে আসে সে অর্থ? বুঝতে হবে অর্থের প্রবাহকে। কোথায় অর্থ প্রবাহের চাপ বেশী? সেখান থেকে একেবারেই শূন্য স্থানের দিকে প্রবাহিত করতে হবে সে অর্থ। বায়ু যেমন উচ্চ ও নিম্ন চাপের কারনে ঝড় উৎপন্ন করে, তারপর অধিক চাপের দিক থেকে নিম্ন চাপের দিকে প্রবাহিত হয়ে সমতা ফিরিয়ে পরিবেশ শান্ত করে দেয়, ভারসাম্য সৃষ্টি ও রক্ষা করে, বিষয়টি তেমন।

অর্থ প্রবাহের আরেক খেলা 'সংখ্যা'! অর্থ প্রবাহের সাথে কি প্রবাহিত হয়? অর্থ অর্থাৎ টাকা বা পয়সা প্রবাহিত হয়! এক দিক থেকে আরেক দিকে যায়। এক হাত থেকে আরেক হাতে যায়। টাকা বা পয়সা হচ্ছে একটি প্রতীক। কিসের প্রতীক? সংখ্যা নির্দেশক প্রতীক। অতএব হাতের টাকা বা পয়সাটা অনর্থক চালাচালি না করে, সংখ্যাটিকে কেবল চালাচালি করেই এ সমস্যার সমাধান করা যায়। সে পদ্ধতিতে নিয়ে যেতে হবে অর্থনৈতিক জীবনকে। মানুষের হিসেবে শুধু সংখ্যা

যোগ হবে। সংখ্যা শেষ হয়ে গেলে 'সংখ্যা' ঋণ দেয়া যেতে পারে। সে আবার খেলা শুরু করবে। ঋণকৃত সংখ্যা পরিশোধ করবে গেম খেলে আয় করে।

এ বছর করোনার কারনে স্বরস্বতী পূঁজায় প্রতিমা বিক্রয় কম হয়েছে। ফুলের বিক্রয় আশানুরূপ হয়নি। এ কাজে নিয়োজিতরা কষ্টে আছে। পৃথিবীতে যদি স্বরস্বতী পূঁজার নিয়ম না থাকতো? একুশে ফেব্রুয়ারী সৃষ্টি না হত? তবে ফুলের ব্যাবসায় নিয়োজিতদের ব্যবসা-বাণিজ্য, আয়-উপার্জনের কি হত? এগুলো এমন কোন কাজ না যা না হলে জীবন চলবে না। জীবন এক খেলা। সে খেলার অংশ এগুলি। আসলে কোন একটা উছিলায় একজনের হাত থেকে অপরজনের হাতে টাকা আসছে আবার যাচ্ছে। যদি উছিলা ছাড়াই টাকাটা হাতে আনা সম্ভব হয়? যদি বসে বসে গেম খেললেই টাকাটা হাতে চলে আসে? এমন ব্যবস্থা হলে কেমন হয়?

পাঠক- অর্থনীতিবিদেরা চাইলে গবেষনা করে বের করতে পারবেন যে, প্রতিটি ব্যাক্তিকেই এমনিভাবে কোন একটি কাজে নিয়োজিত করে বা রেখে বেতন দেয়া সম্ভব। তা সে প্রয়োজনীয় কাজ করুক বা না করুক, কিংবা কেউ ভাতা নিয়ে নিজের মতো চলুক। তাতে হয়তো কিছু মানুষের ভাগে পূর্বের তুলনায় একটু কম পরবে। তবে কোনটি অধিক জরুরী? কারও অতি ভোগ, নাকি কারও মৌলিক চাহিদা পুরণ? কোনটি জগত, সমাজ, সংসার, সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তার ভাবনার দিক বিবেচনায় উত্তম ধারণা? বিষয়গুলি নিয়ে ভাবতে হবে।

আরেকটি বিষয়। ধর্মপ্রাণ মানুষ দরীদ্রকে বা শীতার্তকে কম্বল বিতরণ করে পূণ্য অর্জন করে। যাকাত দিয়ে পূণ্য অর্জন করে। নিজ পূণ্য অর্জনের জন্য কি তবে মানুষকে দরীদ্র বানিয়ে রাখতে হবে চিরকাল? ধর্ম পালনের জন্য কি মানুষকে দরীদ্র বানিয়ে রাখতে হবে? মানুষের জন্য হৃদয় না কাঁপলে এসবেও পূণ্য হবে না। কেননা এখানে স্রষ্টার প্রতি অনুরক্ত হয়ে তাঁর নির্দেশে কাজ করার চেয়েও নিজ পূণ্য লাভের লোভ বেশী। পূণ্য দিয়ে আরও বেশী কিছু কিনে নেয়া বা পাওয়ার লোভ। এসব কাজের প্রচার-প্রসারের ধরণ থেকেও বোঝা যায় যে, এগুলো করার মধ্য দিয়ে একটা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের বাসনা ভেতরে কাজ করে। বিন্দু পরিমাণ তেমন বাসনা পূণ্যকে অ-পূণ্যে পরিণত করে দেবে, বা কর্মটিকে বিফল করে দেবে, যদি না তা আল্লাহ বা ঈশ্বরের ভাবনায় কোন প্রাপ্তির বাসনা ব্যাতিতই করা হয়।

একসময় মানুষ একস্থান থেকে অন্য স্থানে গিয়েছে পালকিতে চড়ে, ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে। এখন যায় না কেন? এখন ওভাবে নয়। এখন সময় সকলের কাছে তার মৌলিক চাহিদা পুরণে প্রাপ্তব্য অর্থ তার হাতে পৌঁছে দেয়া। তাতে যদি যাকাত ব্যবস্থা থাকার আর প্রয়োজন না থাকে তো না থাকবে। বিধাতা নিজেই পৃথিবীর নিয়ম যথাযথ সময়ে বদলে দেন। বলা হচ্ছে,

"আমি কোন অবতীর্ণ বাণী রহিত করলে কিংবা বিস্মৃত করিয়ে দিলে তার স্থানে তার চেয়ে উত্তম অথবা সমপর্যায়ের বাণী নিয়ে আসি। তুমি কি জান না যে আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম?" (আল-কোরআন ২:১০৬)

পাঠক, ওপরের আলোচনাগুলি কেবল কিছু ধারণামাত্র। অর্থনীতিবিদদের কেউ নিশ্চয়ই একে আরও শানিত করতে পারবেন। রাজনীতিবিদদের মধ্যে কখনও কেউ আসবে যে বাস্তবায়ন করবে বা করতে উদ্যোগী হবে। বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষনা সার্বিকভাবে সব কিছুকে সহায়তা করবে।

একটি ভ্রম সংশোধন

(Correction of a wrong)

এই যে জগতে আজ এত এত মানুষ, তারা কিভাবে এলো? কোথা থেকে এলো? কেউ জানে না। অনেক তত্ত্ব আছে বা থাকতে পারে। কিন্তু তারও সত্যাসত্য নিশ্চিতভাবে জানা নেই। আস্তিক-নাস্তিক, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সবাইকেই অতঃপর ধর্ম গ্রন্থসমুহের স্মরণাপন্ন হতে হয় বা সেগুলিকে ভিত্তি করেই আলোচনা শুরু করতে হয়।

বাইবেল বলছে, প্রথম মানব 'আদম'। সেই সুরে সুর মিলিয়েছে কোরআন। গীতা প্রথম মানবের নামকে বলছে 'মনু'। ঐতিহাসিক সত্য আমরা কেউই জানি না। তবে অনেকেই এগুলো বিশ্বাস করি।

আদমই হোক কিংবা মনুই হোক, নামে কি আসে-যায়? আদমকেও তো আমরা কেউ অ্যাডাম বলছি। 'হাওয়া'-কে বলছি 'ইভ'। নাম যাই হোক না কেন, একজন প্রথম মানব থেকে সব মানুষের সৃষ্টি- আমাদের বাস্তব জ্ঞানও সে কথা বলে।

প্রথম মানব কোথা থেকে এলো, কিভাবে এলো? কেউ তা জানে না। আজ যেমন মানুষ চন্দ্রে গমন করছে, মঙ্গলে পাড়ি জমাচ্ছে সেভাবেও আসতে পারে। তবে এর সত্যাসত্য জানা নেই। বাইবেলে এভাবে বলা হয়েছে,

"ইসরাইল জাতি মিশর থেকে বের হয়ে আসার তৃতীয় মাসে কাফেলা রেফিডিম ছাড়ে। সিনাই এ এসে ঘাঁটি স্থাপন করে। সিনাই মরুর বুকে তারা পাহাড়ের দিকে অবস্থান গ্রহণ করে।

এখানে এলে গড সিনাই পর্বতের চূড়ায় নেমে আসবেন বলে জানানো হয়। গড সকলকে দেখা দেবেন। সবাইকে পূত-পবিত্র হওয়ার জন্য বলা হয় এবং পর্বতের আশে পাশে না থাকার জন্য বলা হয়। তাহলে মৃত্যু অনিবার্য।

সেদিন ছিল সিনাইয়ে তৃতীয় দিবসের প্রভাত। বজ্র-বিদ্যুতসহ ঘন মেঘে পাহাড় ঢেকে যায়। চারিদিক ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়। সমগ্র পাহাড় ভীষনভাবে কাঁপতে থাকে। বিকট শব্দে চারিদিক প্রকম্পিত হয়। সবাই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়। গড সিনাই পর্বতের চূড়ায় নেমে আসছেন।

উপস্থিত সকলেই সেদিন বজ্র-বিদ্যুত-ধোঁয়া প্রত্যক্ষ করে। বিকট শব্দে ভীত হয়ে যায়। কেউ পালাতে চেষ্টা করে। অনেকে দুর থেকে দেখার চেষ্টা করে। ঘন মেঘে আচ্ছন্নতার মাঝে সেদিন কেবল 'মোসেস' (মুসা আঃ) গডের সন্নিকটে

গিয়েছিল। গড মোসেস এর সঙ্গে কথা বলেন। ইসরাইলিরা সকলে তা প্রত্যক্ষ করে।"

গড যে মোসেস বা মূসা (আঃ) এর সঙ্গে কথা বলেছেন সে কথা কোরআনেও বলা হয়েছে। বলা হচ্ছে, "... আল্লাহ মূসার সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছেন।" (আল-কোরআন ৪:১৬৪)

তবে সে প্রসঙ্গে যাব না। আজকের দিনে যেভাবে রকেট আসমানে উড়ে যায়, চারিদিক অগ্নি ও ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়, বিকট শব্দ উৎপন্ন করে - উপরোক্ত বর্ণনাটি যেন তেমন মনে হয়। তাই বলছিলাম যে, আজ যেমন মানুষ চন্দ্রে গমন করছে, মঙ্গলে পাড়ি জমাচ্ছে সেভাবেও মানুষ পৃথিবীতে এসে থাকতে পারে। তবে এসবের সত্যাসত্য জানা নেই।

ওপরে বর্ণিত উপায়েও যদি মানুষ পৃথিবীতে এসে থাকে, তবে কোথা থেকে সে পৃথিবীতে এসেছে সেটিও একটি প্রশ্ন। উত্তর জানা নেই। যদি তেমন ধারণা সত্যি হয়, তবে যেখান থেকে মানুষ পৃথিবীতে এসেছে- সেখানেই বা তারা কিভাবে এলো? উত্তর কারই জানা নেই। কে, কবে, কখন, কোথায় প্রথম মানুষ সৃষ্টি করেছে কিছুই মানুষের জানা নেই। এ লেখায় সেসব জানার প্রয়োজনও নেই।

বাস্তব জ্ঞান থেকে আমরা দেখি, জানি বা বুঝি যে আমাদের প্রত্যেকের একজন পিতা আছে। আদম কিংবা মনুই যদি প্রথম মানব হয়, তবে জগতের সকল মানুষ তাদের থেকে এসেছে।

প্রথম মানব মানবের বীজ বহন করে নিয়ে এসেছে এই ধরণীতে। প্রথম মানব মানবজাতির বীজ বহনকারী। সে বীজ ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়ে সমগ্র ধরণীকে করেছে প্রাণ চঞ্চল। যেমন কোরআনে বলা হয়েছে,

"আমি কি তোমাদেরকে সৃষ্টি করিনি এক তরলকে ভিত্তি করে, যা আমি সংরক্ষণ করি নিরাপদ আধারে, একটি পূর্ব-নির্ধারিত সময়ের জন্য? এরূপেই আমি বিষয়সমুহ নির্ধারণ করি। কত চমৎকার আমার নির্ধারণ!" (আল-কোরআন ৭৭:২০-২৩)

আরও বলা হয়েছে, "মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি এক ফোটা বীর্য থেকে?" (আল-কোরআন ৩৬:৭৭)

গীতায় বলা হয়েছে, "সকল জীবসত্ত্বার বা বিদ্যমানের মাঝে আমিই সৃষ্টিগত বীজ।" (গীতা ১০:৩৯)

আরও বলা হয়েছে, “এটি বুঝতে হবে যে, সকল প্রকার জীবের জন্ম বস্তুগত প্রকৃতি থেকে, যেখানে ব্রহ্মরূপ যোনি তাদের মাতৃরূপ এবং আমি তাদের বীজদাতা পিতৃস্বরূপ।” (গীতা ১৪:৪)

এই আমি কে? যিনি এই আমি তিনিই মানবের স্রষ্টা। সব কিছুর স্রষ্টা। কিন্তু তাঁকে কেউ চেনে না, জানে না এমনকি সত্যিকার অর্থে কেউ সঠিকভাবে তাঁকে বোঝেও না। নানানজন নানা প্রকারের ধারণা করে। যে যেই ধারণাতে বিশ্বাস রাখে সে সেই বিশ্বাসে বিশ্বাসী।

আদম কিংবা মনুকে তিনি সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ প্রথম মানবকে তিনিই সৃষ্টি করেছেন। আদম তো কেবল বীজ বহণ করে এনেছে। কিন্তু সে বীজ বপন করবে কোথায়? সব জমিতে বা সব ভূমিতে সব ফসল ফলে না। সর্বত্র রয়েছে অনেক শর্ত।

আদমের আনীত বীজ বপনের জন্য তিনি উপযুক্ত ভূমির ব্যবস্থা করেছেন বা ভূমি বহণকারী আরেকজনকে সৃজন করেছেন। বাইবেল অনুসারে তিনি ‘ইভ’। আমরা ‘হাওয়া’ নামে জানি।

আদমের মাঝে বীজ, হাওয়ার আছে ভূমি। তিনি একজনকে অপরজনের ওপর নির্ভরশীল করেছেন। কাউকেই একচ্ছত্র ক্ষমতা দেননি। সর্বত্র তিনি এক ভারসাম্য সৃষ্টি করে রেখেছেন। যেন কেউ একক ক্ষমতাশালী হয়ে ধ্বংসকারীতে পরিণত হতে না পারে। সৃষ্টির প্রতিটি সূক্ষাতিসূক্ষ সকল ক্ষেত্রে আছে ভারসাম্য বা পাশাপাশি বিপরীত কিছু একটার অবস্থান।

আদম লাঙ্গল দিয়ে ভূমি চাষ করে বীজ বপন করেছে। তাতে একই বৈশিষ্টসম্পন্ন ফসল উৎপাদিত হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, “তোমাদের স্ত্রীরা হল তোমাদের জন্য শস্য ক্ষেত্রের মতো। অতএব তোমরা শস্য ক্ষেত্রে যাও যখন ইচ্ছে কর।” (আল-কোরআন ২:২২৩)

একটি উপমা। সাধারণ কথা। মানুষ তার সাধারণ জ্ঞানে সুস্থ্য স্বাভাবিকভাবেই সকল কাজ-কর্ম করবে। একটি উদাহরণ বা সাধারণ একটি উপমাকে নিয়ে অত্যাধিক জটিল আলোচনার প্রয়োজন নেই।

আদম তার বীজের জন্য উপযুক্ত স্থান কর্ষন করে বীজ বপন করেছে। সেখান থেকে একটি, দু’টি, তিনটি..। অতঃপর তার থেকে আরও। অতঃপর তাদের

সকলের থেকে আরও, আরও ও আরও মানুষ জন্ম নিয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে মানব জাতির।

আদম হচ্ছে মানবজাতির বীজ বহণকারী আদি পিতা। হাওয়া হচ্ছে ভূমি বহণকারী মাতা। ভূমির সাথে মায়ের সম্পর্কটি অধিক ঘনিষ্ট। ভূমিতেই ফসল ফলে। তাই আমরা সর্বত্র মাতৃভূমি কথাটি অধিক ব্যবহার করি।

ভূমি কর্ষন করে বীজ বপন করলে নতুনের সৃষ্টি হবে। মানুষ সে শিক্ষা পেয়েছে, জ্ঞান লাভ করেছে। মানুষ তার নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যও ধরিত্রীর মৃত্তিকা বা ভূমি কর্ষন করে শস্য উৎপাদনের জ্ঞানও পেয়েছে। মানুষ কেবল বীজ বপন করে। ভূমি ব্যবহার করে। কিন্তু ফসল কেন ফলে? ফসল কিভাবে ফলে? কোথা থেকে এলো মানবজাতির এ বীজ? এ ভূমি? বিষয়গুলি বিজ্ঞানের অনুসন্ধানের বিষয় হতে পারে। তবে এসব বিষয় এখানের আলোচ্য নয়।

আদম বীজ বপন করেছে। মানবজাতির উদ্ভব হয়েছে। আদম তাই মানবজাতির আদি পিতা। যুক্তিসম্মত কথা। পিতা হতে হলে বীজ বপন করতে হবে। সে বীজ থেকে শাখা-প্রশাখা হয়ে নানান জাতির সৃষ্টি হবে।

ইব্রাহীম (আঃ) এর দুই পুত্র ইসমাইল ও ইসহাক বা আইজ্যাক। ইসহাকের সন্তান জ্যাকব বা ইয়াকুব। ইয়াকুবই হচ্ছে 'ইসরাইল'। ইসরাইল থেকে ইহুদি-খ্রীষ্টান জাতির উদ্ভব হয়েছে। ইসরাইকে তাই তাদের আদি পিতা বলা চলে। ইসমাইল থেকে মুসলিম জাতির উদ্ভব হয়েছে। ইব্রাহিম (আঃ) থেকে প্রবাহিত হয়ে ইহুদি ও মুসলিম জাতির সৃষ্টি হয়েছে। তাই তিনি এই সকল জাতিসমুহের পিতৃতূল্য।

পিতা হতে হলে বীজ বপন করতে হবে। সে বীজ থেকে শাখা-প্রশাখা হয়ে বিভিন্ন জাতির সৃষ্টি হবে। বাঙ্গালী জাতির পিতা কে? পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা কি বাঙ্গালী না? তারা কি পূর্ববঙ্গের জাতির পিতাকে বাঙ্গালী জাতির পিতারূপে মেনে নেবে? কিংবা এদেশের চাকমা, মার্মা বা অপরাপর জাতি গোষ্ঠীসমুহ কি তা মন থেকে মেনে নিতে পারবে? এমন কি পূর্ববঙ্গের সকল বাঙ্গালীরাই কি কথিত জাতির পিতার সরাসরি উত্তরপুরুষ? কিংবা কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহও কি একই যুক্তিতে পাকিস্তানের জাতির পিতা হতে পারে? আধুনিক এবং যুক্তি ও বিজ্ঞানসম্মত যুগে রাষ্ট্রে একজন 'জাতির পিতা'- এমন ধারণা বিদ্যমান রাখার বা থাকার প্রয়োজন কি?

'নগর পিতা' ধারণার সৃষ্টি হয়েছে কেন? একদিন জেলা-উপজেলার পিতা, এমন কি ইউনিয়ন পিতা, গ্রাম পিতা, পাড়া পিতাও সৃষ্টি হবে। এগুলি হচ্ছে কোন একটি বিষয়কে বিতর্কিত করার প্রয়াস মাত্র। বস্তুত এসব পিতা হচ্ছে- গ্রাম বা পাড়ার প্রধানের মতো। তো পিতা বলার দরকার কি? সবখানেই তো একজন প্রশাসনিক প্রধান রয়েছেই। দেশে রয়েছে রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী।

কেউ বোঝে, কেউ বোঝে না। সাহস নিয়ে অনেকে মুখ ফুটে সত্য কথা বলতে পারে না বা এটাও সত্যি যে, বলা যায় না বা বলতে চাইলেও সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই পাখিকে দিয়ে মনের কথা বলাতে হয়, যেমন 'তুই রাজাকার'। একইসূত্রে নগর পিতার ধারণার উদ্ভব। কিন্তু যারা এর উদ্ভাবক, গলা ফাটিয়ে কিংবা চিৎকার করে বললেও তারা সে সত্য স্বীকার করবে না।

একটা দারুণ খেলা! জাতির পিতার ধারণাকে বিতর্কিত করার একটি প্রাথমিক প্রয়াস হচ্ছে এই 'নগর পিতা'র ধারণা। একটা দলের সাথে একাত্ম হয়ে থাকার ভাব প্রদর্শন করার মধ্য দিয়ে বিতর্কের বীজ বপন করে দেয়া। বস্তুত এর উদ্ভাবকেরা এ ধারণা পছন্দ করে না। আবার মুখ ফুটে বলতেও পারে না। দুটি সমস্যা আছে। একটা সরাসরি বিরোধীতা বা সংঘর্ষে চলে যাওয়া। যা করার সামর্থ নেই। অপরটি স্বার্থহানির। অর্থাৎ সাথে আছি ভাব প্রদর্শন করে যে স্বার্থ অর্জন করা হচ্ছে, সেটি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ভয়।

বলেছি যে, এ এক দারুণ খেলা! বিতর্কের বীজ বপন করে দেয়া হলো। নিজে ততটা ঝুঁকি না নিয়ে অন্যদের ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়ে উদ্দেশ্য অর্জন করা। মনে সুপ্ত আশা- যদি অন্যরা বিষয়টিকে বিতর্কের মধ্যে নিয়ে আসতে পারে। বস্তুত কঠিন পরিস্থিতিতে বিরোধীতা প্রদর্শনের এগুলিই উত্তম উপায়।

খেলা বলছি এ জন্য যে, এটা আবার উভয় পক্ষ গোপনে বোঝে। কিন্তু কে কোন পক্ষে সেটি প্রকাশ করে না। যারা এর মাধ্যমে স্বার্থ উদ্ধার করছে তাদের মধ্যে অনেকে এ ধারণাকে পছন্দ না করলেও স্বার্থকে জিয়িয়ে রাখার জন্য এর পক্ষে কথা বলে। কেননা স্বার্থান্বেষীদের কাছে সত্য, জ্ঞান বা আদর্শ কিছুই গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তাদের স্বার্থ। ফলে তারা নতুন এ ধারণা নগর পিতাকেও বড় করে তোলে, জাতির পিতার ধারণাকে সমুন্নত রাখার স্বার্থে। কেননা তারা এ ধারণা লালন করে সুফলপ্রাপ্ত।

সমাজে আরেকটা দল আছে যারা কম বোঝে এবং আবেগী কিংবা অনুসারি। তারা ভেতরের স্বার্থের খেলা থেকে অনেক দুরে। সরাসরি কোন উপকার পায় না। তারা নতুন ধারণার তালে নাচতে থাকে। এ দলে সাধারণ মানুষ বেশী। অর্থাৎ মানুষ বেশী। ফলে পুরোনো ধারণা তো দুর হয়ই না, উল্টো নতুন ধারণাটিও কালক্রমে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়। যদিও এটাও ঠিক যে, এভাবে একটি বিতর্কও সৃষ্টি করা সম্ভব হয়।

বিতর্ক সৃষ্টি করা খারাপ না। বিতর্কের মধ্য দিয়ে সত্য-মিথ্যে, ভূল-শুদ্ধ চিহ্নিত করা সহজ ও সম্ভব হয়। যৌক্তিকতা তীক্ষ্ণ হয়। মানুষ সঠিক পথটি চিনতে ও বুঝতে পারে বা অন্তরে হলেও উপলব্ধি করে।

সমাজে প্রতিষ্ঠিত আজকের পিতাতূল্য ধারণা একসময় বা কালক্রমে আর পিতাতূল্য থাকে না। এসব ধারণা কালক্রমে দেবতাতূল্য হয়ে যায়। যখন কোন কিছু দেবতাতূল্য হয়ে যায়, তখন তার বিপক্ষে মুখ ফুটে সমাজে কথা বলা যায় না বা তেমন পরিস্থিতি থাকে না বা স্বর্থান্বেষীরা তেমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে দেয় না- এমতাবস্থায় সেটি 'শিরক' এর পাপের দিকে ধাবিত হয়। কেননা সেটি অন্যায় বা পাপ কর্মের পথকে উন্মোচন করে দেয়। পাঠক ধাবিত হয় বলেছি। শিরক এর পাপ হয়েছে তা বলিনি। এ পার্থক্য বুঝাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে বিষয়টি বোঝা এতই সহজ না। তাই একটু আলোচনা করা প্রয়োজন।

কোন কিছুকে দেবতাতূল্য করে ফেলা শিরক এর পাপের সমান। পাপ না। তবে বিষয়টি পাপ সৃষ্টির সম্ভাব্যতা সৃষ্টি করে। অর্থাৎ পাপের বীজ বপিত হয় এর মধ্য দিয়ে। তাই এক অর্থে পাপ।

প্রশ্ন হচ্ছে, শিরক কেন পাপ? এটি বুঝতে হবে সর্বপ্রথম। তবেই এর যৌক্তিকতা মানব মস্তিস্কে প্রবেশ করবে এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ বিষয়টিকে মেনে নেবে বা গ্রহণ করবে এবং পালন করতেও উদ্যোগী হবে। এটি কেবল মুসলিমদেরই বিষয় না, কিংবা এটি কেবল কথিত ধর্মেরও বিষয় না। মানবজীবনের ভাল-মন্দের সাথে সম্পর্কিত বিষয় এটি। এর সাথে মানবসমাজে নির্যাতনকারী ও নির্যাতিতের সম্পর্ক আছে। উৎপীড়ক ও উৎপীড়িতের সম্পর্ক আছে। এর সাথে সমাজে ধনী-দরীদ্রের পাহাড় পরিমাণ বৈষম্য সৃষ্টির সম্পর্ক আছে। গুরুত্ব বিবেচনায় তাই 'শিরক'কে ধর্মীয় বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত করে দিয়ে এর মূলোৎপাটনকে অত্যাবশ্যকীয় করে দেয়া হয়েছে। যখন রাষ্ট্র, সরকার, সংবিধান

আধুনিক এতসব বিষয়াদি ছিল না- ধর্মই তখন মানব সমাজকে সঠিক পথে চলতে নির্দেশনা দিয়েছে। অবশ্যপালনীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমুহকে তাই ধর্মের অন্তর্ভূক্ত করে দেয়া হয়েছে। কেননা সাধারণ বা অধিকাংশ মানুষ ধর্মের কথা শোনে। ধর্মের মাধ্যমে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস এটি। কিন্তু চিরকালই বুদ্ধিমান, ক্ষমতাশালী ও সুযোগ সন্ধানি কিছু মানুষ সেসব থেকেও নিজেদের স্বার্থ হাসিল করেছে। আর এটি সম্ভব হয়েছে সাধারণ মানুষের অশিক্ষা-কুশিক্ষা, উদাসীনতা, অন্যায়ের বিপক্ষে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারা ইত্যাদি নানান কারনে।

শিরক পাপ কেন? তার পূর্বে আলোচনা করতে হবে 'পাপ' নিয়ে। এ বিষয়েও একটি স্বচ্ছ ধারণা থাকা প্রয়োজন। পাপ কি? কেবলমাত্র মস্তিস্কে শব্দের ধারণাগত পার্থক্যের কারনে একই বিষয় কারও কাছে খুব বড় মনে হয় এবং কারও কাছে বিষয়টি তেমন বড়ভাবে মনে ধাক্কা দেয় না। সহনীয় মনে হয়। আর সে কারনেই শিরক এর পাপ কথাটি উচ্চারিত হলে কিছু মানুষ যেমন আগুনের মতো জ্বলে ওঠে, সেই একই মানুষ ব্যাংকের আমানত লুণ্ঠন নিয়ে টু শব্দটি করে না। কারন পাপ সম্পর্কিত ধারণা সব মানুষের মস্তিস্কে একই রকম না।

পাপ হচ্ছে অন্যায়। নিয়ম বিচ্যূতি। নিয়মের লংঘন। সীমা অতিক্রম। কেউ বলে ঈশ্বরের নিয়ম লংঘন। ঈশ্বরের কোন নিয়মই অন্যায় করতে বলে না। কোন ধর্মই ঈশ্বরের নাম নিয়ে তা বলে না। ন্যায়ের পথে থাকতে বলে। পাপ হচ্ছে এক কথায় 'অন্যায়' বা অন্যায়ের কারনে বা অন্যায়করণের কারনে সঞ্চিত বা প্রাপ্তব্য মন্দ ফল বা পরিণাম। বস্তুত যা বিধাতার নিয়মেরই লংঘন। সকল অন্যায়ই বিধাতার নিয়মের লংঘন। বিষয়গুলিকে আমরা সেভাবে দেখতে শিখিনি বা শিখাই না। এসব নিয়ম বিচ্যূতিও করি অন্যায়ভাবে একটু বেশী পাওয়ার জন্য।

শব্দের তারতম্য, ভাষার তারতম্য বেশ বড় প্রভাব রাখে মানব মনে। তাই পাপ বললে ঈশ্বরের বা আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত কোন বিষয়ের ক্ষেত্রে বিচ্যূতি মনে হয়। অথচ সব অন্যায়ই ঈশ্বরের বা আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত কোন বিষয়ের বিচ্যূতি। অথচ শিরক এর পাপ বললে কিছু মানুষ আগুনের মতো জ্বলে উঠে, সেই একই মানুষ ব্যাংকের আমানত লুণ্ঠন নিয়ে টু শব্দটি করে না। অথচ দুটোই পাপ। বরং শেষেরটি বড়। কেননা শেষেরটিকে রহিত করার জন্য শিরক-কে পাপ ঘোষনা করা হয়েছে। এ দু'য়ের মাঝে একটি সম্পর্ক আছে। এটি কেবল একটি উদাহরণ মাত্র। এমনি অসংখ্য উদাহরণ দেয়া যেতে পারে।

ওপরের উদাহরণে দু'টোই পাপ বা অন্যায়। বস্তুত পরের পাপ যেন সংঘটিত হতে না পারে সে কারনেই প্রথমটি অর্থাৎ শিরককে পাপ বা অন্যায়ের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। প্রথমটি দিয়ে পরেরটিকে বন্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ বিষয়গুলিকে সেভাবে বোঝেনা বা তাদেরকে সেভাবে বুঝতে শিক্ষা দেয়া হয়নি। তারা কোন বিষয়ের মর্ম কথাটি বোঝে না। তারা শব্দের ওপর ভর করে চলে। তাই আড়ালে কিছু মানুষ সহজেই সেই পাপ করতে পারে, যে পাপের সম্ভাব্যতার কারনে শিরককে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে এর পেছনে বা গভীরে আবার দলীয় স্বার্থ, সুবিধা, নির্দেশনা তথা রাজনীতির সম্পর্কও থাকতে পারে।

ওপরে পাপ নিয়ে কথা বলেছি। কিন্তু পাপেরও ধরণ আছে। শিরক এর পাপ বড় পাপ। শিরক এর পাপকে কেন বড় পাপ বলে মনে করা হয়? তার আগে বুঝতে হবে 'বড় পাপ' কোনটি। সবচেয়ে বড় পাপ বা অন্যায় কোনটি? নিশ্চয়ই খুন বা মানব হত্যা, ধর্ষন, ব্যাভিচার, চুরি, মিথ্যে বলা ইত্যাদি। সব পাপের শুরুর একটা বীজ থাকে। আবার তা থেকে বেঁচে আসারও একটা উপায় থাকে। মানবসমাজ বিন্দু পরিমাণ অন্যায় করুক মহান আল্লাহ সেটি প্রত্যাশা করেন না। তাই শিরককে কঠিন পাপ ঘোষনা করেছেন। কেননা এটি এমন এক পাপ- যা পাপের বীজ, একই সাথে পাপীর রক্ষাকবচ। বিষয়গুলি বুঝতে হবে।

এখানে অনেক বিশ্লেষনে যাব না। আগ্রহী পাঠককে নিজেকে বিশ্লেষন করেও কিছু বিষয় বুঝে নিতে হবে। দায়িত্ববানের জন্য এটিও একটি দায়িত্বশীলতা যে কেন এভাবে বলা হল সেটি সন্ধান করা। সব পাপের অন্তর্নিহিতে সবচেয়ে বড় পাপ হচ্ছে 'আর্থ-সামাজিক বৈষম্য'। একে সকল পাপের উৎস বা বীজ বলা যেতে পারে। এ বৈষম্য আর্থ-সামাজিক-মানসিক সকল ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। যা অন্যান্য পাপ সংঘটনের বিষয়গুলিকে নানাভাবে উস্কে দেয়। পাপ করে বেঁচে আসার ক্ষেত্রেও এ বৈষম্যই অবদান রাখে।

বৈষম্য সৃষ্টির বীজ হচ্ছে 'শিরক'। শিরক বৈষম্য সৃষ্টির উপায়, হাতিয়ার বা উছিলা হিসেবে কাজ করে। তাই এটিই সবচেয়ে বড় অন্যায়। পাঠক, পূর্বেই বলেছি যে এখানে অতি বিশ্লেষনে যাব না। নিজেদেরকেই বিচার-বিবেচনা ও বিশ্লেষন করে এ কথা বলার কারন বের করার চেষ্টা করতে হবে। এখানে কেবল বিষয়ের প্রতি ইংগিতটুকু দিয়ে দেয়া হল।

'শিরক' কি? শিরক হচ্ছে আল্লাহ, গড বা ঈশ্বরের সমকক্ষ কোন কিছু সৃষ্টি করা বা সাব্যস্ত করা। আসলে আল্লাহর সমকক্ষ কেউই কখনও, কোনদিন, কোনকিছু সৃষ্টি করে না বা করতেও পারে না। আবার করলেই বা সমস্যা কি? কেননা আল্লাহর তাতে কিছুই যায় আসে না। মানবের কোন খেলা আল্লাহকে মোটেও প্রভাবিত বা বিচলিত করে না। মানুষ নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার মন্দ খেলার মধ্য দিয়ে। তাই তিনি এসব খেলা বন্ধের নির্দেশ দেন। মানুষ তা পালন করলে নিজেরাই উপকৃত হবে। পালন না করলে নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আল্লাহর কিছুই আসবে-যাবে না।

শিরক প্রতিষ্ঠা করার মধ্য দিয়ে সমাজে এমন কিছু সৃষ্টি করা হয় বা হয়ে যায়, বা দুর্বল মানব মনে এমন কিছু গেঁথে যায় যা আল্লাহ, গড বা ঈশ্বরের নির্দেশকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ না করলেও পাশ কাটিয়ে ভিন্ন নিয়ম প্রতিষ্ঠা করার উপায় বা মাধ্যম সৃষ্টি করে। বস্তুত যা আল্লাহর নির্দেশকেই অমান্য করে। প্রথম প্রথম সে নিয়ম ভাল মনে হয়। বিশেষত তাদের কাছে যারা ভিন্ন নিয়ম সৃষ্টি করে নানান সুবিধা লুটে নেয় এবং তাদের দোসরদের কাছেও। যারা কিছুই পায় না তারাও বড়দের তুষ্টিতে নিজেরাই তুষ্টির ভাব প্রদর্শন করে। অতঃপর কালক্রমে এর বিষ একসময় মানবজীবনকে বিষাক্ত করে তোলে। বিষয়গুলি ধীরে ও সন্তর্পনে ঘটে। যার যাঁতাকল থেকে মানুষ যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী জীবন উৎসর্গ করেও বের হয়ে আসতে পারে না। তখনই মহামানবদের আবির্ভাব ঘটে মানুষকে মুক্তি দিতে। তেমন পরিস্থিতি যেন বারবার সৃষ্টি না হয় সেজন্যই 'শিরক' হারাম বা নিষিদ্ধ। এমনকি না বুঝে কিছু মানুষ সরল-অন্তরে পিতৃতূল্য কিছু সৃষ্টি করতে চাইলেও যদি সেখানে তেমন পরিণতির সম্ভাবনা থাকে, তবে সেটি থেকেও বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়।

এবার আসি শিরক এর সাথে ঈশ্বর বা আল্লাহর প্রসঙ্গে। শিরক হচ্ছে আল্লাহর সমকক্ষ কিছু দাড় করানো। আল্লাহর সমকক্ষ কিছু দাড় করালে আল্লাহর কি ক্ষতি? তার আগে বুঝতে হবে আল্লাহ কে বা কি? মানুষ তো আল্লাহ কে বা কি তা-ই জানে না। মানুষের কাছে আল্লাহ হচ্ছে তার সীমাবদ্ধ জ্ঞানে কিছু বিশেষনাত্মক নাম। যেমন, আল্লাহ মহান! আল্লাহ বিশাল! আল্লাহ অতি উচ্চ! অতি মর্যাদাসম্পন্ন! কিন্তু কেউ জানে না আল্লাহ কে বা কি।

ওপরে উল্লেখ করেছি যে, আল্লাহর সাথে শিরক করলে আল্লাহর কোন ক্ষতি নেই। ক্ষতি মানুষের, মানবজাতির, মানবজীবনের। ঈশ্বর, আল্লাহ বা গড বা সকল ধর্মই মানুষকে সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে বলেছে। কোন ধর্মের মানুষ বলবে না, বলতে পারবে না বা দাবী করবে না যে তার ধর্ম তাকে অন্যায় কাজ করতে বলেছে। বরং ধর্মে অন্যায়কে প্রতিহত করতে বা তার পথগুলি বা ছিদ্রগুলি বন্ধ করে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। আর আল্লাহ বা গড বা ঈশ্বর যা বলেছেন তাই তাঁর নির্দেশ বা দিক-নির্দেশনা। যা ভঙ্গ করার মতো মানুষের কোন উপায় নেই।

স্বার্থান্বেষী মানুষ বুদ্ধি করে নিজেদের স্বার্থ হাসিলে সে নির্দেশকে ভঙ্গ করতে চায় বা পাশ কাটিয়ে চলতে চায়। তখন তারা দেবতাতূল্য এমন কিছু সমাজে বা মানুষের মনোজগতে সৃষ্টি করে, যার বিপক্ষে সাধারণ মানুষের কথা বলার আর সাহস থাকে না। তাদেরকে তেমন অতি উচ্চে উন্নিত করা হয়। তাদের বিপক্ষে কথা বলার সাথে সাথে আধুনিক যুগেও মধ্যযুগীয় কায়দায় গর্দান নিয়ে নেয়া হয়। অতঃপর তাদের নাম দিয়ে নির্দেশনা জারি করা হয়। যে নির্দেশনা স্বার্থান্বেষী ও তাদের দোসরদের স্বার্থকেই রক্ষা করে। এর বিপরীতে কথা বলা যায় না। প্রতিবাদ করা যায় না।

কিছু উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে পরিস্কার করা দরকার। যেমন আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে- বিচারিক ক্ষেত্র বা নির্দেশনা ব্যাতিত মানুষ হত্যা না করা। কিন্তু অতিতেও দেখা গেছে কোথাও ব্রীজ বানাবার জন্য কারও নাম নিয়ে বলি দেয়া হয়েছে। বলি দেয়া হয়েছে নিজ বিপক্ষ শক্তিকে নির্মূল করার জন্য। কোন দেব-দেবতা উছিলা হয়ে কাজ করেছে। আল্লাহর নির্দেশকে অমান্য করার জন্য তাঁর সমকক্ষ কাউকে বা কিছু সৃষ্টি করে নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিল করা হয়েছে। আজও এমন অনেক কাজ হয় ভিন্ন কৌশলে। আরও বহু উদাহরণ দেয়া যেতে পারে।

অতএব পিতৃতূল্য এমন কিছু রাষ্ট্র বা সমাজে প্রতিষ্ঠা না করা যা দেবতাতূল্য হয়ে যায়, যার নাম নিয়ে আল্লাহ প্রদত্ত ন্যায্যতার নিয়মকে ভঙ্গ করে ক্ষমতাশালী বা স্বার্থান্বেষীরা সকলকে তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে নিজেরা সব লুটে নেয় এবং সমাজে বৈষম্য সৃষ্টি করে। এটি অন্যায় সংঘটনের বীজ। এর আর্থ-সামাজিক-মনোজাগতিক অনেক কুফল বা পরিণাম আছে সমাজে।

বাংলাদেশ বা বাঙ্গালী জাতির ক্ষেত্রে পিতৃতূল্য কাউকে সৃষ্টি করার সমস্যা আছে। ওপরেও উল্লেখ করেছি। আমরা এমন কাউকে জাতির পিতৃস্বরূপ উপস্থাপন

করতে পারি না যার রক্ত আমাদের সকলের দেহে প্রবাহিত নয়। আরও যেসব জনগোষ্ঠি বা পাহাড়ে বসবাসকারী বা উপজাতি এদেশে আছে তারা কি তাদের জাতির পিতা হিসেবে বাঙ্গালীর জাতির পিতাকে মন থেকে মেনে নেবে? আবার ভারতীয় বাঙ্গালীরা কি আমাদের জাতির পিতাকে বাঙ্গালী জাতির পিতা হিসেবে মেনে নেবে? কথাগুলি ওপরে বলা হয়েছে।

বস্তুত রাষ্ট্র পরিচালিত হয় অবশ্যম্ভাবী কিছু নিয়ম-নীতির ভিত্তিতে। সেখানে জাতির পিতা আদৌ কোন প্রয়োজনীয় বিষয় নয়। সমগ্র বিশ্ব যখন ছোট হয়ে আসেছে, মানুষের জ্ঞান যখন সমৃদ্ধ হচ্ছে তখন তো এসব অপ্রয়োজনীয় ধারণা আদৌ প্রয়োজনীয় নয়।

তবে কি আমাদের দেশে কোন জাতির পিতা থাকবে না? যখন আমরা দেখতে পাই পাকিস্তানে আছে, আমেরিকায় আছে তখন? অবশ্যই থাকবে; ততদিন আমাদের দেশেও জাতির পিতা থাকবে, যতদিন সমগ্র বিশ্বব্যবস্থা থেকে এ অনর্থক ব্যাবস্থা বাদ না হচ্ছে।

এটিই একটি ভূল। এ ভূলেরই সংশোধনের কথা বলা হয়েছে। জাতির পিতা নয়। এমন অপ্রয়োজনীয় ধারণা নয়। কোন ব্যাক্তির আবেগতাড়িত হয়ে এমন ঘোষনায় কেউ সমগ্র জাতির পিতা হয়ে যেতে পারে না। ভূলটি সংশোধন করা প্রয়োজন। এটি হতে পারে ‘একটি স্বপ্নকে বাস্তবায়নে সম্মিলিত প্রয়াসে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী বা স্বপ্নদ্রষ্টা কিংবা অন্যকিছু।’

সত্যি বলতে যদি গড, ভগবান বা আল্লাহর ধারণা মানবের হৃদয় ও মস্তিস্কে যথাযথভাবে সমুন্নত থাকে, তবে এ জগতে আর কোন বিকল্প ধারণারই প্রয়োজন হয় না। কিন্তু জ্ঞানী তার স্বার্থ হাসিলে বিকল্প ধারণা সৃষ্টি করে। মানুষকে বিভ্রান্ত করে। বিভ্রান্ত মানুষকে কাজে লাগিয়ে স্বার্থ উদ্ধার করে। বিভ্রান্তির পথে পা বাড়ানোও পাপ। কেননা মানুষকে বলা হয়েছে তার নিজ জ্ঞানকে কাজে লাগাতে। আল্লাহকে ছেড়ে যে অন্যের দ্বারস্ত হয় সে জ্ঞানহীন। নিচের কথাগুলির মর্মার্থ গভীর মনোযোগের সঙ্গে অনুধাবন করা একান্তই বাঞ্ছনীয়। কেবল শাব্দিক অর্থ নয়, অন্তর্নিহিতের মর্ম অর্থ অনুধাবন করতে হবে!

“অর্জুন জানতে চায়ঃ কোনটি অধিক সঠিক? ভক্তিযুক্ত চিত্তে যারা নিরন্তর তোমার (কৃষ্ণের ব্যাক্তিক রূপের) আরাধনা করে তারা, নাকি যারা ইন্দ্রিয়াতীত তোমার অপ্রকাশিত ও নৈর্ব্যাক্তিক (নিরাকার) ব্রহ্মাকে উপাসনা করে তারা?

ভগবান বলেন: যার মন আমার ব্যাক্তিকরূপে নিবিষ্ট, সর্বদাই গভীর ও অপ্রাকৃত বিশ্বাস নিয়ে আমার উপাসনা করে, যথাযথতার দিক থেকে আমি তাকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করি।

কিন্তু যারা সকল ইন্দ্রিয় সংযত করে, সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন হয়ে, সকল জীবের কল্যাণে রত হয়ে- আমার অপ্রকাশিত রূপ যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার অতীত, যা সবকিছুকে অধিভূক্ত করে আছে, যাকে ধারণা-কল্পনা করা যায় না (নিরাকার), ধ্রুব ও নিশ্চল- পরম সত্যের নৈর্ব্যাক্তিক বা নিরাকার স্বরূপকে পরিপূর্ণরূপে উপাসনা করে, তারা অবশেষে আমাকে লাভ করে।

(তবে) যারা ভগবানের অপ্রকাশিত নৈর্ব্যাক্তিক রূপে অনুরক্ত, তাদের পক্ষে সে পথে অগ্রগমন অত্যান্ত কষ্টকর। কেননা দেহবিশিষ্টদের জন্য অব্যাক্তের উপাসনা দুরুহ বা কঠিন হয়।

.. যে তার সকল কর্ম আমাকে সমর্পন করে, কোনরূপ বিচ্যূতি ছাড়া ভক্তিযোগে সর্বদা আমার উপাসনা ও ধ্যান করে, জন্ম-মৃত্যুর এ মহাসমুদ্র থেকে তাকে আমি দ্রুত উদ্ধার করি (মুক্তি দেই)।

অতএব তোমার মনকে শুধুমাত্র আমাতে নিবিষ্ট কর- 'ভগবানে' এবং তোমার সকল বুদ্ধিমত্তাকে আমাতে নিয়োজিত কর। এইরূপে কোনরূপ সন্দেহ ব্যাতিত তুমি সর্বদা আমাতে বসবাস করবে।" (গীতা ১২:১-৮)

".. চার ধরণের পূণ্যবান মানুষ আমাকে ভক্তি প্রদর্শন তথা উপাসনা বা ভজনা করে- আর্ত, অর্থ-সম্পদ প্রত্যাশী, জিজ্ঞাসু ব্যাক্তি এবং সে, যে সত্যের সন্ধান করে।

এদের মধ্যে যে একনিষ্টভাবে আমাতে একীভূত হওয়ার জ্ঞান রাখে, সেই পূর্ণজ্ঞানী বা তত্ত্বজ্ঞানী ভক্তই শ্রেষ্ঠ। ... সকল ভক্তরাই নিঃসন্দেহে অতি উচ্চ স্তরের, কিন্তু আমার সম্পর্কিত জ্ঞানে যে তত্ত্বজ্ঞানী, আমি তাকে আমাতে বসবাসের জন্য বিবেচনা করি। আমার অপ্রাকৃত, অতীন্দ্রিয়, দেহাতীত বা লোকত্তর সেবায় বা ভজনায় বা উপাসনায় নিবেদিত থেকে সে আমাকে লাভ করে।

... যাদের মন বস্তুগত কোন প্রাপ্তির প্রত্যাশায় বিচ্যূত, তারা অপরাপর বিবিধ দেব-দেবতায় নিজেদেরকে সমর্পন করে এবং প্রাপ্তির প্রত্যাশা থেকে তারা তাদের নিজস্ব প্রকৃতি অনুসারে নির্দিষ্ট বিধি-বিধান অনুসরণ করে সেইসব দেবতাদের ভজনা-উপাসনা করে। (অথচ) পরমাত্মারূপে আমিই সকলের হৃদয়ে বিরাজ করি।

কিন্তু যখনই কেউ কোন দেব-দেবীর ভজনা করতে ইচ্ছে করে, আমি সেখানেই তার বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করে দেই, যেন সে কোন নির্দিষ্ট উপাস্যতে একান্তভাবে নিজেকে নিয়োজিত রাখে।

তেমন বিশ্বাসে নিজেকে নিয়োজিত করে, ভক্ত কোন নির্দিষ্ট দেব-দেবীর আনুকূল্য কামনা করে এবং তার প্রত্যাশিত বিষয় বা বস্তু লাভ করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সকল সুবিধা, অনুগ্রহ বা কাম্য বস্তু আমি একাই প্রদান করি (কিন্তু তারা জানে না)।

স্বল্প জ্ঞানের মানুষ দেব-দেবীদের উপাসনা করে ... বুদ্ধিহীন মানুষ যারা আমাকে জানে না ... তাদের সামান্য জ্ঞানের কারনে , তারা আমার উচ্চ পর্যায়ের পরম প্রকৃতিকে জানে না- যা নিত্য, অব্যয় ও অক্ষয়। বোকা ও বুদ্ধিহীনদের কাছে আমি নিজেকে কখনই প্রকাশ করি না।" (গীতা ৭:১৬-২৫)

বাস্তব জীবনেও মানুষ বস্তুগত কোন কিছু প্রাপ্তির প্রত্যাশা থেকে মহামানব তথা দেব-দেবীর মতো কিছু একটা সৃষ্টি করে। তাদের অত্যাধিক ভক্তি প্রদর্শন করে। তাদের ভজনা করে- উপাসনা করে। সাধারণ মানুষ এসব দেখে বিচলিত হয়। সত্য পথ থেকে বিচ্যূত হয়। তাই আত্মবিশ্বাসহীন মানুষ, যারা জ্ঞানকে কাজে লাগায় না আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন না। বিশ্বাস তথা আত্মবিশ্বাস আসে জ্ঞান থেকে। তবে পার্থিব জগতে এক ধরণের জ্ঞানী আছে তারা আবার আত্মবিশ্বাস ও জ্ঞানহীন মানুষদেরকে পছন্দ করে?

এ ধরণের জ্ঞানী ব্যাক্তিগণ নিজ অন্তরে জানে যে, সে নিজেও আল্লাহকে মানে। সে বিকল্প কাউকে মানে না। কিন্তু সে উদাসীন বা জ্ঞানহীন মানুষকে বিভ্রান্ত করে, তাদেরকে কাজে লাগিয়ে বা বলা যায় এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে একটু ভাল থাকার চেষ্টা করে। বড় হওয়ার চেষ্টা করে। মর্যাদাবান হওয়ার চেষ্টা করে।

জ্ঞানী নিজ অন্তরে জানে যে সে আল্লাহর সমকক্ষ বা বিকল্প কোন কিছুকে ভালবাসে না, গ্রহণ করে না। সে আল্লাহকেই ভালবাসে এবং সে এটিও জানে বা বোঝে যে আল্লাহ সব জানেন। অন্তরের কথাও জানেন। অতএব তার অন্তরের ভালবাসাকেও আল্লাহ জানেন। ফলে সে বোঝে যে পাপ তাকে স্পর্শ করবে না। যত পাপ নির্জ্ঞান মানুষের। তাদের ভূল কর্মকান্ডের। নির্জ্ঞানতাই পাপের কারন। আর এখানেই কাজ করে মহাজ্ঞানীর নির্জ্ঞানতা। এখানেই জ্ঞানী ভূল করে। তাই কোরআনে উদাহরণ তুলে ধরে বলা হয়েছে যে,

"তারা শয়তানের মতো। যে মানুষকে অবিশ্বাস করতে বলে, অতঃপর যখন সে অবিশ্বাসী হয়, তখন শয়তান বলেঃ নিশ্চয়ই! তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি বিশ্ব-পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করি।

অতঃপর উভয়ের পরিণতি হবে এই যে, তারা নরকে যাবে এবং চিরকাল তথায় বাস করবে। এটিই অন্যায়কারীদের (দুষ্টদের) শাস্তি।" (আল-কোরআন ৫৯:১৬-১৭)

সত্যি বলতে যদি গড, ভগবান বা আল্লাহর ধারণা মানবের হৃদয় ও মস্তিস্কে যথাযথভাবে সমুন্নত থাকে, তবে এ জগতে আর কোন বিকল্প ধারণারই প্রয়োজন হয় না। কিন্তু কিছু জ্ঞানী তাদের স্বার্থ হাসিল করার জন্য গডের সমকক্ষ উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন কিছু বিকল্প ধারণার সৃষ্টি করে বা 'শিরক' করে। বিকল্প ধারণা সৃষ্টি করার মাধ্যমে তারা তেমন দেবতাতূল্য মহামানবকে কাজে লাগিয়ে বিধাতার নির্দেশকে পাশ কাটিয়ে চলার চেষ্টা করে। অন্যথায় বিধাতার দিক-নির্দেশনা মেনে চলতে গেলে তাদের অন্যায়-অপরাধ করে অতি লাভবান হওয়ার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ বিধাতা প্রদত্ত দিক-নির্দেশনা যে অন্যায় কাজকে নিষিদ্ধ করেছেন দেবতাতূল্য মহামানবকে কাজে লাগিয়ে তাকেও তারা হালাল গণ্য করার মতো করে সমাজে প্রতিষ্ঠা করে। মানুষকে বিভ্রান্ত করে এবং এভাবে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করে।

বিভ্রান্তির পথে যে পা বাড়ায় বস্তুত সেও পাপ করে। সেও পাপি। কেননা মানুষকে বলা হয়েছে তার জ্ঞানকে কাজে লাগাতে। আল্লাহকে ছেড়ে যে অন্যের দ্বারস্ত হয় সে জ্ঞানহীন। জ্ঞানহীন কর্মকান্ডও পাপ। সে পাপের ভার সমাজের সকল মানুষের- যারা অন্যায়কে প্রতিরোধ করে না কিংবা যারা অন্যায় সংঘটনের সম্ভাব্য কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদটুকুও করে না।

ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্র বৃহতেরও বৃহৎ

(Smaller than Small, Greater than Great)

ঐ যে চোখের সামনে সু-উচ্চ নাড়কেল গাছটি দাড়িয়ে আছে- পুরো গাছটিকেই দু'চোখ দিয়ে দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, সু-উচ্চ ঐ নাড়কেল গাছটিকে পিপড়েগুলো কি নিচ থেকে সম্পূর্ণ দেখতে পাচ্ছে?

ধরে নেই এ জগতে সাত শত কোটি মানুষ আছে। সংখ্যাটি কি কম? তারপরেও পৃথিবীতে স্থূল ভাগের কত অংশ আজও ফাঁকা রয়ে গেছে। আর বিশাল জলরাশির পুরোটাই তো জনমানবশূন্য। তাহলে পৃথিবী কত বড়! অথচ সেই পৃথিবীও বৃহস্পতির চেয়ে কত ছোট! সূর্য্যের চেয়ে বৃহস্পতিও ছোট। মহাবিশ্বে আছে আরও কত নক্ষত্র, যারা সূর্য্যের চাইতেও অনেক বড়। চারিদিকে ক্ষুদ্র আর বড়র খেলা।

সাত শত কোটি পিপড়েকে যদি এক সাথে করা হয়, তবে কি তাদের দিয়ে পুরো একটি নাড়কেল গাছকে ঢেকে ফেলা যাবে? নাকি তারপরেও কিছু ফাঁকা জায়গা থেকে যাবে? অথচ পৃথিবীতে আছে কত কত নাড়কেল গাছ!

মানুষ পুরো পৃথিবীটাকে জানে। পৃথিবীর সকল নাড়কেল গাছ ও পিপড়ে সম্পর্কে মানুষের রয়েছে তাই এক রকমের ধারণা। কিন্তু পিপড়ে কি বিষয়গুলি মানুষের মতো করে জানে? পিপড়ের কাছে পৃথিবী ও পৃথিবীর মাঝে সকল নাড়কেল গাছ সম্পর্কে হয়তো পূর্ণ ধারণা নেই। যেমন আমাদের পূর্ণ ধারণা নেই মহাবিশ্ব সম্পর্কে। চারিদিকে কত কত ক্ষুদ্র আর কত কত বৃহতের খেলা!

জীবনের এক এক রকম শর্তে একই ভূবন এক এক জনের কাছে এক এক রকম। কারও কাছে বড়- অনেক বড়। কারও কাছে ক্ষুদ্র- অনেক ক্ষুদ্র।

একটা ভাইরাসকে খালি চোখে দেখা যায় না। অথচ তারাও মানুষের মত সব কাজ করে। তাদেরও খাদ্যের প্রয়োজন আছে। তাদেরও প্রজনন আছে। আছে সমাজ। তাদের প্রয়োজনে তারা মানবদেহে প্রবেশ করে। মাত্র একটি কোষে জীবনযাপন করে। বংশ বৃদ্ধি করে। এক সময় এক কোষ থেকে আরেক কোষে ছড়িয়ে যায়। এত বিশাল মানব দেহ বা মানুষকে সে বিচলিত করে তোলে। ভয়ানক হতে পারে তার প্রভাব। মৃত্যুরও কারন হতে পারে! অথচ খালি চোখে তাকে দেখাই যায় না।

ভাইরাস যে কোষে প্রবেশ করে সে কোষের যিনি ধারক, সেই মহাবিশ্বকে কি সে পুরোপুরি জানে? তার কি সে ক্ষমতা আছে সেই বিশ্বকে জানার বা বোঝার? তাকে কি সে সক্ষমতা দিয়ে তৈরী করা হয়েছে? জীবনযাপন করতে গিয়ে সেই একটি কোষে তারাও জীবনযুদ্ধে লিপ্ত হয়। কখনও কুরুক্ষেত্র বানিয়ে ফেলে।

এমনও কোন উন্নত প্রাণী থাকতে পারে যার কাছে মানুষও আণুবীক্ষনিক। তিনি মানবের পুরো বিশ্বকে এক নজরেই জানেন-দেখেন। সমগ্র মহাবিশ্বে কোথায় কি ঘটে চলেছে একবারেই তিনি তা জানেন-দেখেন-বোঝেন। যেমন মানুষও তার দেহের কোথায় কি ঘটে চলেছে একবারেই তা দেখে, জানে বা বোঝে কিংবা অনুভব করে। কিন্তু পিপড়ে বা ভাইরাস যেমন মানব দেহকে পূর্ণাঙ্গ জানে বা বোঝে না, তেমনি সে মহাদেহ বা মহাবিশ্বকে মানুষ জানে না। জানার চেষ্টায় রত।

পিপড়ে, ভাইরাস যেমন কোন না কোন দেহে বসবাস করে খেয়ে-পড়ে বেঁচে আছে, মানুষও তেমন। একটি কোষে সে জীবন যুদ্ধে লিপ্ত। এক সময় সেও হয়তোবা বংশ বিস্তার করে আরেক কোষে বা গ্রহে প্রবেশ করবে।

মানুষ যেন তার ধারক বা মহাবিশ্ব বা মহাদেহকে বিচলিত না করে, তার মৃত্যু বা ধ্বংসের কারন না হয়, সেটি তার নিজের অস্তিত্বের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। মহাবিশ্বের ধ্বংস তার নিজেরও ধ্বংসের কারন। পরিবেশের সংরক্ষণ তাই গুরুত্বপূর্ণ। সে কারনে এত সব ধর্ম ও বিধি-বিধান। যা অনুসরণ করে চললে প্রত্যেক পর্যায়ের দেহ সচল থাকবে। ধ্বংস ত্বরান্বিত হবে না।

মহাবিশ্বের প্রতিটি কণা বা অনু-পরমাণু সব সচল বা চেতনা সম্পন্ন। কিন্তু নানান শর্তে ধরণগুলি বিভিন্ন প্রকারের। কে তাদেরকে সচল বা চেতনসম্পন্ন করে রেখেছে? কে তাদের অন্তর্গত এই পরিবর্তনশীলতার কারণ, যার কারনে প্রতিটি বস্তু সচল, পরিবর্তনশীল, চেতনাসম্পন্ন ও জীবন্ত মনে হয়? বিজ্ঞানীর কাছে জানতে চাইলে বিজ্ঞানী ইংরেজী কিংবা গ্রীক ভাষায় অনেক অনেক উপাদানের বৈজ্ঞানিক নাম বলে দেবে। যে সব উপাদান এসবের পেছনে দায়ী। আর এ সব উপাদানের পেছনে যারা ক্রিয়াশীল তারা সবাই আরেক অর্থে ফেরেশতা বা অবতার।

"শপথ তাদের (ফেরেশতাদের), যারা মর্যাদাক্রমে সুশৃংখল/সারিবদ্ধভাবে (নিজেদের) বিন্যাস করে রাখে ... (ফেরেশতারা বলে) আমাদের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে সুনির্ধারিত স্থান/অবস্থান এবং আমরা তো সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান থাকি

(কার্য নির্বাহের জন্য) এবং অমরাই আল্লাহর মহাত্ম/পবিত্রতা ঘোষনা করি।" (আল-কোরআন ৩৭:১, ১৬৪-১৬৬)

পৃথিবীকে যদি অনেক দুর থেকে একটি কোষ হিসেবে দেখা হয়, তবে হয়তো খালি চোখে এর পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে না। অথচ এখানে কত পরিবর্তন ঘটে চলেছে। পদ্মা সেতুর মত বৃহৎ প্রকল্পও তো কিছু পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। কারা করছে এসব কাজ? মানুষ করছে। মানুষই ফেরেশতা যে পরিবর্তন করে চলেছে। বীজ থেকে গাছ হয়। ভেতরে কেউ ক্রিয়া না করলে কি গাছ বড় হবে? যারা কর্ম করে চলেছে তারা এক বাক্যে ফেরেশতা নামে অভিহিত। যারা উন্নয়নের পেছনে কাজ করে চলেছে তারা ফেরেশতা। তারাই সকল শুভ পরিবর্তনের জন্য দায়ী। তারাই সচলতা, পরিবর্তনশীলতার পেছনের কারন। সচলতা বা পরিবর্তনশীলতাই চেতনা বা প্রাণের একটি উত্তম উদাহরণ।

শয়তান বলে পৃথক কোন অস্তিত্ব নেই। শব্দটি দ্বারা কর্ম বা গুণ প্রকাশ পায়। ফেরেশতা যেমন ফেরেশতা, তেমনি ফেরেশতাই শয়তান। ফেরেশতা শয়তান তখন যখন সে পরিচালনাকারীর অবাধ্য হয়। বিপরীত কাজ করে।

ফেরেশতা আর শয়তান সবই বিবিধ আকৃতি-প্রকৃতির প্রাণীসকল। কর্মের কারনে পৃথকীকৃত নামের পরিচিতিমূলক বিভাজন হচ্ছে ফেরেশতা ও শয়তান। বিজ্ঞানীদের ভাষায় যে শয়তান কোন কোন ক্ষেত্রে ভাইরাস নামেও পরিচিত। জাগতিক বিবেচনায় সেও প্রাণী। আর প্রাণীই কোন না কোন প্রোগ্রামকে ধারণ করে চালিত হয়। যেমন বিজ্ঞানীদের ভাষায় এ্যালিয়েন, যাকে কোন কোন ক্ষেত্রে জ্বিন নামে অভিহিত করা হয়েছে। এগুলি কেবলই কিছু নামের পার্থক্য। নামের সাথে কিছু গুণাগুণ সম্বলিত কর্মের পার্থক্য থাকতে পারে। তবে মূল বিষয় একই। প্রাণ, সচলতা, শক্তি ও বিরোধী শক্তি।

মহাদেহ বা মহাবিশ্বকে ধরে রাখতে ফেরেশতা ক্রিয়াশীল। শয়তানও ধরে রাখতে চায়। তবে ফেরেশতাকে মেনে নিতে পারে না। দ্বন্দ্বের শুরু। যে দ্বন্দ্ব কখনও ধ্বংসের কারন হতে পারে। আবার জ্ঞান সম্মতভাবে চললে ভাল পরিবর্তনেরও কারন হতে পারে। কেননা আজকের ফেরেশতা কখনও শয়তানে পরিণত হতে পারে। আবার আজকের শয়তান ফেরেশতা হয়ে যেতে পারে। আর এদের মধ্য থেকেই বিধাতা বা প্রতিপালক। তাঁর প্রতীক একটি 'আসন' বা 'কুরসি'। তার নিজস্ব ভর বা শক্তি কম। কিন্তু এ দুয়ের কারও সমর্থনে তাঁকে প্রবল

প্রতীয়মান হয়। আবার যে তার সমর্থন পায় সে ফেরেশতা হয়ে যায়। অন্যজন হয় শয়তান।

সকল প্রজাতিতে নিজেদের মধ্য থেকেই থাকে ফেরেশতা ও শয়তান এবং থাকে সকলের চালক বা ভগবান। একই বিদ্যুৎ যেমন সব যন্ত্রকে চালনা করে, তেমনি সকল প্রাণীর ভেতরে একই আত্মার শক্তি চলমান। এটি কেবলি একটি উদাহরণ। সে চালনা করে সব। সে বৃহতের মধ্যে আছে, সে ক্ষুদ্রের মধ্যেও আছে। তার একটুখানি পরশে সব সচল, চেতনাসম্পন্ন ও জীবন্ত হয়ে ওঠে।

"... সকল জীবসত্ত্বায় আমি জীবনের গতি - জ্ঞান, চেতনা। ... আমার স্বর্গীয় প্রকাশমানতার কোন শেষ নেই। ... সকল .. মহাসৃষ্টি উদ্ভূত হয় আমার স্বর্গীয় দ্যুতির একটুখানী পরশ থেকে।" (গীতা ১০: ২২, ৪০, ৪১)

"তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একই সত্ত্বা থেকে। ...।" (আল-কোরআন ৬: ৩৯)

"আত্মা; ক্ষুদ্রের চেয়েও ক্ষুদ্র, বৃহতের চেয়েও বৃহৎ" - উপনিষদ

দুই নেত্রী

(Two Leaders)

বাড়ীর পশ্চিমে একটি দিঘী। দিঘীর পাশ দিয়ে সরু পায়ে হাঁটা পথ। উত্তর পাশে আরেকটি দিঘী। দক্ষিন পাশ দিয়ে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা ছোট্ট সরু একটি খালের মত আছে, যেটিকে বলি 'বাইদ'। এ বাইদ বাড়ীর পেছন দিক দিয়ে ঘুরে উত্তরের দিঘীটির সাথে সংযুক্ত। বাইদ আর পুকুরগুলি দাদার ভিটা বাড়ীটিকে চতুর্দিকে ঘিরে রেখেছে। ভিটা বাড়ীটি হয়েছে পুরো বাড়ী থেকে নিরিবিলি। অনেকটা দ্বীপের মত। পুরো বাড়ীর কোলাহল এখানে নেই।

পূর্ব পাশের দরজা দিয়ে বেড় হলে ঘর থেকে পৃথক রান্না ঘর। দরজাটির সামনে ডালিম গাছ। পাশে পেপে গাছ। চারিপাশ নানান গাছ গাছালিতে ভরা। শুপারী গাছের অন্ত নেই। গাছের ছায়ার নীচে দাদীর রান্নাঘর। রান্না ঘরের পেছনে বাইদের কিনারা ঘেঁষে পাঁচ মিশালী গাছ। আছে আম গাছ। গায়ে কাঁটাযুক্ত মান্দার গাছ। গাব গাছ। কাউ গাছ। ডেউয়া গাছ। লই গাছ। পেয়ারা গাছ। কাঠাল গাছ। শুপাড়ী গাছ। চালতা গাছ। হিজল গাছ। ডুমুর গাছ। নাড়কেল গাছ। বেঁতশ লতা। আরও অনেক গাছ। এ দিকটায় বাইদের অপর পাড়ে খাঁয়েদের বাড়ীর বাঁশ ঝাড়। নীচে অজস্র পাতায় ভরা। গাছ-গাছালিতে ঢাকা পল্লী মায়ের স্বল্প সময়ের অভিজ্ঞতাটি ছিল বড়ই মধুর।



রান্না ঘর থেকে বেড়িয়ে আসা বাতাসের গন্ধ নিয়েই বলে দেয়া যেত এটি দাদীর রান্না। দাদী গত হয়েছেন অনেকদিন। পথে প্রান্তরে চলতে গিয়ে আজও কখনও সে রান্নার গন্ধ পাই। হয়তো আর কারও দাদী তেমনি রান্না করছে। দাদীর কথা মনে পড়ে।

দাদীর কথা মনে হলে মানসপটে নানুর ছবিও ভেসে ওঠে। ছেলেবেলায় দু'জনেরই ঘনিষ্ট সাহচর্য্য পেয়েছিলাম। নানু ছিলেন ফর্সা ধবধবে। দাদী শ্যামলা হলেও চেহারাটি যে এক সময় বেশ কাঁটা কাঁটা ছিল, সেটি বোঝা গেলেও দাদার

মুখেও তার স্বীকারোক্তি শুনেছি। দু'জনের চারিত্রিক বৈশিষ্ঠ দু'রকম মনে হত। নানুর কথা মনে হলে মনে হত কঠিন বরফ থেকে গলে গলে পানি ঝরছে। দাদীর কথা স্মরণে এলে মনে হত শ্লেট পাথরের রং-এ কঠিন শীলায় গঠিত শক্ত একটি পাহাড় দাড়িয়ে আছে। নানুর আদর সোহাগ প্রদর্শনে কোন হিসেব-নিকেশ সীমা-পরিসীমা ছিল না। ন্যায়-অন্যায়ের বিচার্য্য বিষয় ছিল পরে। দাদীর ছিল প্রথমেই ন্যায়-অন্যায়ের বিচার্য্য বিষয়। দাদীর ছিল ন্যায়ের পক্ষে প্রকাশ্য সমর্থন এবং অন্যায়ের প্রতি প্রকাশ্য বারণ। দাদী ছিল যৌক্তিক, নানু ছিল মানবিক।

এখন মনে হয়- সময় ও পরিস্থিতির ভিন্নতার কারনে এ দুটো গুনই পার্থিব জীবনে অতীব প্রয়োজনীয়। এ গুণাগুণগুলির কাছে আমরা আশ্রয় পাই, আশ্রয় নেই। আবার যখন বড় হয়ে যাই, তখন এ গুণগুলির মাঝেই অন্যকে আশ্রয় দেই।

দুটো গুণই সবার ভেতরে বিরাজ করে। তবে প্রবণতাটি একেক জনের একেক দিকে গড়ে ওঠে। বিভিন্ন কারনে মানুষ একেক দিকে ঝুঁকে পরে। যে যেদিকে ঝুঁকে পরে তাঁর সে গুণটিই প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। সে রূপটিই তখন মানুষের সামনে ধরা দেয়। এর অর্থ এই নয় যে অন্য গুনটি তাঁর মধ্যে নেই।

নিজেদের রাজনীতির মাঠে কখনও আমরা নানুর দিকে আবার কখনও দাদীর দিকে ঝুঁকে পরতাম। হয়তো তারা নিজেরাও সেটি জানত না। নিজেরাই নিজেদের মধ্যে যুক্তিতর্কে লিপ্ত হতাম- নানুর গুনটি ভাল অথবা দাদীর গুনটি ভাল এই বলে। প্রকৃতপক্ষে বলতাম নানু ভাল, নয়ত দাদী ভাল। সে-ই তখন তাকে ভাল বলতাম যখন যার কাছ থেকে সমর্থন পেতাম। আবার পরিবর্তীত পরিস্থিতিতে যখন নিজের সমর্থিত দিক পরিত্যাগ করতাম, তখন উল্টোদিকে ঝুঁকতাম নতুন উপলব্ধিবোধ নিয়ে। তখন ঐ একই মুখে আওড়াতাম উল্টো কথা। সবই ছিল নিজ সুবিধার খেলা।

পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ রাখতে তারাও সময়ে সময়ে তাদের রূপটি পরিবর্তন করতেন। নীতিহীনতার দোষের কারনে তখন দোষারোপ করতাম। আমাদের বুঝ না আসা পর্যন্ত তারা এভাবেই সারাটি জীবন সামাল দিয়ে গেছেন। আর আমাদের বিবাদগুলি বেশীর ভাগই ছিল একটু কম বা বেশী প্রাপ্তি বিষয়ক। কিংবা পূর্বের কোন ঘটনার প্রতিশোধ বিষয়ক।

দুই নেত্রী

তারা কখনও পক্ষপাত করেন নাই। তাদের তেমনটি করার কোন প্রয়োজনও ছিল না। নিজেদের কোন সুবিধা প্রাপ্তির জন্য আমরা নিজেরাই তাদেরকে নিজেদের রঙ্গে রাঙ্গিয়েছি। সুবিধা প্রাপ্তির লোভটা যত অঘটনের মূল।

নানু যেদিন প্রথম লাল শাক দিয়ে লাল টুকটুকে ভাত মুখে তুলে খাইয়ে দিয়েছিলেন, তখন বয়স আড়াই কি তিন। আজও সে কথা মনে পরে। একটা সময়ে এসে তার চেয়েও অনেক বেশী শারিরীক শক্তির অধিকারী হয়ে উঠলাম।

দাদী যেদিন প্রথম অ আ ক খ শিখিয়েছেন সেদিনের সেই রঙ্গিন বইটির পাতা আজও চোখে ভাসে। একটা সময়ে এসে তার চেয়েও অনেক বেশী শিক্ষিত হয়ে উঠলাম।

সংসারে সবাই অনেক শক্তিমান এবং শিক্ষিত হয়ে উঠলাম। তবুও তারাই আমাদের নেত্রী। নেতা-নেত্রী হতে শক্তিও লাগে না, শিক্ষাও লাগে না। সাধারণ জ্ঞানই যথেষ্ট। লাগে 'গ্রহণযোগ্যতা'।

তারা দু'জনেই গত হয়েছেন। এখন বুঝি দু'জনেই সকলকে সমান ভালবাসতেন। যেমন এখন আমরা ছোটদের জন্য করি। তারা যা করেছেন সবই আমাদের মঙ্গলের স্বার্থে। সংসারের শান্তির স্বার্থে। সবাইকে এক রাখার স্বার্থে। সৃষ্টিকর্তা তাদেরকে শান্তিতে রাখুন ....। (লেখা ২০১৩)

ভাষা ও ধর্ম

(Language and Religion)

নাটকে দেখলাম একটি পাখি বলছে ‘তুই রাজা..’। সে নিজে থেকে এটা বলেনি। পাখিটিকে এ ভাষায় এ কথা বলতে শেখানো হয়েছে। পাখি এ ভাষায় এ কথা বলতে পারার কথা নয়। তার ওপর একটি ভাষা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। কেবল তাই-ই নয়, কি বলতে হবে সেটিও শিখিয়ে দেয়া হয়েছে।

পাখিরা ভাষার জন্য আন্দোলন করতে জানে না। যদি জানতো এবং সফল হত, তবে কেউ এমন কাজ করতে সাহস পেত না। অবলা পাখিকে দিয়ে নিজের উদ্দেশ্য হাসিল করা হয়েছে। পাখিটির ভাগ্য ভাল, যার হয়ে সে না জেনে- না বুঝে নিজের অজান্তে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এ কাজ করেছে, তার জন্য তাকে জীবন দিতে হয়নি। মানসিকতা সকলেরই এক। নিজের সুবিধার জন্য অন্যকে ব্যবহার করা। নিজের জীবনের ঝুঁকি অন্যের কাঁধে চাপিয়ে দেয়া।

কাজটি নিজে না করে কেন এভাবে করাতে হল? পাখিকে দিয়ে বলাতে হল? ভয়ে। একটা দানবের ভয়ে। দানবকে ভয় পেতে হল কেন? জীবনের মায়ায়। একমাত্র জীবনকে সবাই মায়া করে। মায়া করবে এটাই স্বাভাবিক। জীবনকে সবাই সুন্দরভাবে পেতে চায়। জীবনকে সুন্দরভাবে পেতে চাই- ‘স্বাধীনতা’। যে স্বাধীনতা অন্যের বিরক্তির কারন হবে না- তেমন স্বাধীনতা।

কিছু অবিবেচক অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে চায়। তারা তাদের নিজেদের গোষ্ঠীগত জীবনকে আরও ভালভাবে উপভোগ করতে চায়। চায় সবাইকে তার অধীন করে রাখতে। তাতে তার বা তাদের জীবন ধন্য হবে। সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টির সূত্র অনুযায়ী- যাদের ওপর সে চাপ পরে তারা তা কোনদিন হতে দেয় না। শুরু হয় সংঘাত। এভাবে তারা তাদের নিজেদের এবং সমাজের সকলের জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে। এই অবিবেচকদের কারনে একটা প্রজন্মকে দুর্বিসহ জীবন পার করতে হয়। ভাগে কিছুই জোটে না। ক’টা দিন অন্যকে বঞ্চিত করে খাওয়া-দাওয়া, গান-বাজনা করে এক ধূর্ততার সাথে জীবন কাটিয়ে দেয়া এবং অপ্রয়োজনীয় কাজ সৃষ্টি করে, অন্যকে ছোট করার মাধ্যমে, ব্যাস্ততার ভান করে জীবনের সার্থকতা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করা। মূর্খতা! এগুলি মূর্খতা! জ্ঞান ও বুদ্ধিসম্মত কাজ নয়। একটা সময় ও বয়সে এই মানুষগুলি দেহের কিছু রসায়নের

কাছে পরাস্ত হওয়া। এরা দানব বা অসূর প্রকৃতির। এদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট গীতায় চমৎকারভাবে তুলে ধরা হয়েছে (দ্রষ্টব্য ১৬:১৩)।

একই কাজ একই জনের কাছে একবার ভালভাবে প্রতিভাত হয়- আরেকবার মন্দভাবে। সুবিধামত তাই একই মানুষ দুটি রূপেই আবির্ভূত হয়।

যখন আমার ওপর কোন ভাষা চাপিয়ে দেয়া হয়, তখন সেটা অন্যায় মনে হয়। যখন অন্যের ওপর আমি নিজ প্রয়োজনে কোন ভাষা চাপিয়ে দেই, তখন তার পেছনে যথেষ্ট যৌক্তিক কারন আছে বলে মনে হয়। কিংবা কোন পরিস্থিতিকে দায়ী করা হয়। যখন আমার ওপর কেউ ভাষা চাপিয়ে দেয়- কি পরিস্থিতিতে সে তা চাপিয়ে দিল তা বিবেচনা করি না। বিষয় সমুহের আরও অনুসন্ধান প্রয়োজন হলে হতেও পারে। আর যদি কোন পরিস্থিতিতে বাধ্য না হয়ে চাপিয়ে দিয়ে থাকে, তবে অবশ্যই সেটি অন্যায়।

সৃষ্টিকর্তা এক। তা তাকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন। শুনেছি প্রথম মানব এক। তা তাকে অ্যাডম, আদম কিংবা মনু যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন। মানবের মূল ধর্মটিও এক। তা যত প্রকার নামই দেয়া হোক না কেন। একটাই ধর্ম। সার্বজনিন ধর্মটি হল- অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানো বা অন্য কথায় সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা। এটিই আল্লাহর ইচ্ছে ও নির্দেশনার প্রতি সমর্পন। সমর্পনই সত্য ধর্ম। সব ধর্মে এ একই নির্দেশনা রয়েছে। সে অর্থেই মানবের ধর্ম এক।

“নানারূপ ধর্ম পরিত্যাগ কর এবং কেবলমাত্র আমার প্রতি নিজেকে সমর্পন কর। আমি তোমাকে সকল পাপ থেকে মুক্ত করে দেব। এ বিষয়ে দুঃশ্চিন্তা বা ভয় কর না।” (গীতা ১৮:৬৬)

“আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পন ব্যতিত যে ধর্মের সন্ধান করে, তা গৃহিত হবে না এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবে। ” (আল-কোরআন ৩:৮৫)

কোনদিন মানুষ যদি সঠিক কাজ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে চায় বা তার ওপর অর্পিত এ সত্য ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়, তবে বিশ্ব ব্রহ্মান্ড যার- তিনি নিজেই তার সৃষ্টির ভারসাম্য রক্ষায় তার ব্যাবস্থা গ্রহণ করবেন। সেদিন হয়তো মানুষ নামক প্রাণীর আর প্রয়োজন নাও থাকতে পারে। তিনি নতুন কিছু সৃষ্টি করে তার ব্রহ্মান্ড পরিচালনা করবেন। কিংবা মানুষের মধ্যেই প্রেরণা সৃষ্টি করে মানুষকে দিয়েই তিনি প্রয়োজনীয় কাজগুলি করিয়ে নেবেন। যে কাজ প্রকৃতি এবং সমাজের

ভারসাম্য নষ্ট করে তা-ই অন্যায়। কেবল অন্যায় বা সত্য বিচ্যূতিই সৃষ্টিকর্তাকে ভাবিয়ে তোলে।

ভাষার কাজ কি? মনের ভাবটি প্রকাশ করা এবং সে ভাবটি সঠিকভাবে অন্যকে বুঝতে সহায়তা করা। প্রতিটি ভাষাভাষি মানুষ তার নিজ নিজ ভাষায় এ কাজটি ভালভাবে করতে পারে। এটা বাংলা হতে হবে বা ইংরেজী হতে হবে বা আরবী হতে হবে বিষয়টি এমন নয়। এটা ইশারা হলেই বা সমস্যা কি? চোখের দিকে তাকিয়ে থেকেই যদি অন্যের মনের ভাবটি বুঝে নেয়া যায় তো সমস্যা কোথায়? মনের ভাব প্রকাশ করা এবং মনের ভাব বুঝে নেয়াই তো আসল উদ্দেশ্য! ভাষারও সেই একই কাজ।

ভাষার জন্য জীবন দেয়ার প্রয়োজন কি? যেদিন এ পৃথিবীতে ছিলাম না সেদিন তো এ ভাষাকেও জানতাম না। তবে এর জন্য কেন জীবন দিয়ে ফেলতে হবে। যে সময়ে ভাষার জন্য জীবন দিলাম সে সময়ে ভাষা না হয়ে অন্য কোন উদ্ভুত পরিস্থিতি হলে হয়তোবা তার জন্যই জীবন দিতে হত।

আসলে মহান স্রষ্টার মহান সৃষ্টি কখনও ক্ষুদ্র কারনে মহামূল্যবান জীবনকে বিসর্জন দিয়ে দেয় না। তারা ভাষা, একটা নির্দিষ্ট সীমানা, একটা নিজের আপন জন তার জন্য জীবন দেয় না। মানবের ধর্ম তা বলে না। সৃষ্টিকর্তার নির্দেশও তা নয়। মানুষ তার মহামূল্যবান প্রাণটি বিসর্জন দেয় কেবল সৃষ্টিকর্তার নির্দেশনায় ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য। আর সেটি হলো 'অন্যায়কে প্রতিহত করা'। 'সত্য ও ন্যায়কে সমুন্নত রাখা ও প্রতিষ্ঠা করা'। এটাই ধর্ম। এটাই মানব ধর্ম। এটাই ধর্মের কাজ। এতেই ধর্ম প্রতিষ্ঠা পায়। সত্য হচ্ছে, মানুষ স্রষ্টা নির্দেশিত ধর্ম রক্ষার্থে বা প্রতিষ্ঠায় প্রাণ বিসর্জন দেয়। অর্থাৎ মানুষ প্রাণ বিসর্জন দেয় অনেক মূল্যবান কারনে।

আমরা ভাষার জন্য প্রাণ দেই নাই। আমরা সীমানার জন্যও প্রাণ দেই নাই। আমরা ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণ দিয়েছি। অন্যায়কে প্রতিহত করেছি। এটিই স্রষ্টা প্রদত্ত নির্দেশনায় মানবের প্রকৃত ধর্ম। এ নির্দেশনা সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। তাই সকল মানবের ধর্ম এক।

"নিশ্চয়ই! তোমাদের এই জাতি/ধর্ম এক জাতি (মানবজাতি)/ এক ধর্ম (ইসলাম/সমর্পন/ মানবধর্ম) ... কিন্তু মানুষ তাদের ধর্মকে নিজেদের মধ্যে বহুধা বিভক্ত করেছে। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উল্লসিত। অতএব

তাদেরকে তাদের অজ্ঞতায় নিমজ্জিত থাকতে দাও কিছুকালের জন্য।" (আল-কোরআন ২৩:৫২-৫৪)

সাধারণ মানুষ সাধারণভাবে জানে ভাষার জন্য জীবন দিয়েছি। কখনও স্বাধীনতার জন্য জীবন দিয়েছি। মুলত মানুষ জীবন দেয় ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য। ন্যায়কে প্রতিষ্ঠার জন্য। সত্যকে সমুন্নত রাখার জন্য। এটিই মানবের জন্য বিধাতা কর্তৃক নির্দেশিত ধর্ম। এ পথে চলাই বিধাতার প্রতি সমর্পন। এটিই তাঁর প্রকৃত নির্দেশনা।

প্রতিটি মানুষ তার নিজ ভাষায় স্বাচ্ছন্দে ও আনন্দের সাথে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে। সেখানে অন্যের হস্তক্ষেপ করা অন্যায়।

কিছু ন্যায়-অন্যায় সুস্পষ্ট। কিছু ন্যায়-অন্যায় নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। প্রয়োজন আলোচনা, গবেষনা, প্রচারণা ও জনতার আন্তরিক মতামত গ্রহণ। কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করা মত নয়। (লেখা ২০১৩)

নারী : মা-মেয়ে ও স্ত্রী

(Women: Mother-Daughter and Wife)

সেদিনের সে স্মৃতি চোখে জল এনে দেয়। একটা মায়া। সাঁঝের সে মায়া। এ মায়ার সাথে জড়িয়ে আছে দুরের গাছ-গাছালি আর বাঁশ বাগানের ওপর দিয়ে ছড়িয়ে থাকা সন্ধ্যা আকাশের লালাভ সে রঙটিও। আছে; আরও আছে। দাড়িয়া বান্ধা, গোল্লাছুট কিংবা ছি-বুড়ি খেলা শেষে কিংবা কোন নদীর কিনারায় বসে থাকা বন্ধুদের আড্ডা শেষে ঘরের দিকে ফিরে যাওয়ার স্মৃতি। যেমন পাখিরা ফেরে। মাগরিবের আযান; মনে মনে রাতের পড়ার ভাবনা- সব স্মৃতিকে ছাপিয়ে যে মায়ার স্মৃতি চোখে জল এনে দেয়- সে তো মায়ের মুখচছবি। মায়ের পড়নের শাড়িটি। কখনও চোখের চশমাটি। উদগ্রীব চাহনিতে সন্তানের আগমনের পথে চেয়ে থাকার স্মৃতি। সে স্মৃতির কথা লিখতে গিয়ে কি বোর্ড ভিজে যাচেছ। সন্তানের কাছে মায়ের অবস্থান এ জগতে তুলনাহীন।



একটি শব্দ। 'মা'। অথচ মা তো একজন মেয়ে। কারও স্ত্রী। কারও পূঁজনীয় সেই একই মা তার স্বামীর কাছে কেমন? মা-বাবার মধুর সম্পর্ক সন্তানকে স্বর্গীয় পরিবেশ দান করে। যে সন্তান পরিবেশের সে মধু আহরণ করতে পেরেছে সে তো 'ভাগ্যবান'। একই সাথে হয়তোবা তেমন কোন সন্তান বিধাতা প্রদত্ত তার প্রাপ্ত সৌভাগ্য সম্পর্কে উদাসীন! উপরন্তু সৃষ্টিকর্তার কাছে অনেক না পাওয়ার বেদনায় কাঁতর।

আজ ঘরে নিজের স্ত্রী এসেছে। কারও আদরের মেয়ে। নিজের কাছে কেমন? শারীরিক চাহিদার আকাংখা যতদিন প্রচন্ড, ততদিন অনেক কিছুই ভাবনায় আসবে না। অতপর একদিন ..। নিজ নিজ যৌক্তিক কারনে নিজের অবস্থানে অনড় দু'জনের আচরণে পরিবর্তন আসতে পারে। তখন সন্তানের মা তার স্বামীর দৃষ্টিতে কেমন? একই প্রশ্ন বাবার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

যে মা সন্তানের কাছে তুলনাহীন। সে একই মা হতে পারে তার স্বামীর সাথে শীতল সম্পর্কে কোনরকমে জড়িয়ে আছে। কথাটি বাবার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

যে নারীকে একজন তার মা হিসেবে পূঁজো করছে। সে একই নারীকে হয়তোবা আরেকজন বাস্তবতা ও সাংসারিক নানান জটিলতার কারনে স্ত্রী হিসেবে আজ আর পূঁজো করতে পারছে না। অধিক যাতনা-ক্লিষ্ট হয়ে গেলে, হয়তোবা পুরো নারী জাতিকেই গ্রহণ করে নিতে দ্বিধান্বিত হচ্ছে।

ঘরে যেদিন ফুটফুটে একটি মেয়ের জন্ম হলো, সেদিন সে একই স্বামীর অবস্থানটি নারী জাতির প্রতি কেমন হতে পারে? তার আদরের মেয়েও তো একদিন কারও স্ত্রী হবে। নতুন অভিজ্ঞতায় নারী জাতিকে আজ তেমন একজন স্বামী বা পুরুষ কিভাবে মূল্যায়ন বা গ্রহণ করবে?

এক জটিল মানসিক অবস্থার সূঁই-সূতো দিয়ে সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্টির চাদর সেলাই দিয়ে রেখেছেন। যে চাদরে উত্থিত সম্ভ্যাব্য আগ্নেয়গীরির লাভাও কখনও ক্ষমার বৃষ্টি বর্ষনে শান্ত হয়ে আসে।

নেতৃত্ব

(Leadership)

একটু চিনি কিংবা গুড় লেগে থাকলে মুহুর্তেই ঝাঁকে ঝাঁকে পিপড়ে চলে আসে। কোথা থেকে আসে? কে সংবাদ পৌছায়? কিভাবে পৌছায়? বিষয়গুলি ভাবতে অবাক লাগে! নিশ্চয়ই একজন থেকে একজনে সংবাদ পোঁছে যায়। যদিও এখন আর এসব অবাক করার বিষয় নয়। একটু লেখাপড়া করলেই বিষয়গুলি জানা সম্ভব। আর যেটা আজও জানা সম্ভব হয়নি, কিছুদিন অপেক্ষা করলে সে রহস্যও বিজ্ঞানীরা জানিয়ে দিতে পারবে।

বিজ্ঞানীরা গবেষনার মাধ্যমে কোন একটি বিষয়ের ভেতরের রহস্যটি প্রমান করে নিশ্চিতভাবে জানিয়ে দেয়। তারা ভেতরের সত্যটি বের করে আনে। বিজ্ঞানী সত্যের সন্ধানি। সত্য উদঘাটনে গবেষনা করে।

গবেষনা ছাড়াও মানুষ অনেক কিছু উদঘাটন করে ফেলতে পারে। তাই তো যখন গবেষনা প্রতিষ্ঠান ছিল না তখনও মানুষ ভাষা আবিষ্কার করেছে। পাথর দিয়ে আগুন জ্বালাতে শিখেছে। বিজ্ঞানী বা কোন গবেষকের প্রয়োজন হয়নি।

সমাজ বিজ্ঞানী বা সামাজিক গবেষক সমাজ নিয়ে গবেষনা করে। কিভাবে গবেষনা করে? তারা মানুষের সাথে কথা বলে। অনেক মানুষের সাথে কথা বলে তারা সত্যটি বের করে আনার চেষ্টা করে। গবেষক সত্যটি জানে না। জানে সাধারণ মানুষ। গবেষক জানলেও পরে জানে। সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলার পরে।

গবেষক যা প্রমান করে সাধারণ মানুষ আগে থেকেই সাধারণভাবে সেটা জানে বা বুঝে। গবেষক কিছু পদ্ধতি অনুসরণ করে গবেষনা করে। অনেকের নিকট থেকে বিষয়ের ওপর তথ্য সংগ্রহ করে। সেগুলিকে নিয়মের মধ্য দিয়ে সাজায় বা প্রক্রিয়াকরণ করে। বহু মানুষের বক্তব্য থেকে কিছু ট্রেন্ড দেখতে পায়। একটা ফলাফল দেখতে পায়। এভাবে ঘটনার ভেতরের সত্য রহস্যটিকে উন্মোচন করে আনে। অর্থাৎ এটিই যে সত্য সেটি প্রমাণ করে। অতঃপর ফলাফল জানান দেয়ার মাধ্যমে বহু মানুষের গোচরীভূত করে।

কিন্তু সামাজিক এসব গবেষনা করে লাভ কি? ফলাফল বহু মানুষের গোচরীভূত করে কি লাভ? বস্তুত এর মধ্য দিয়ে একটি চাপ সৃষ্টি করা হয়। চাপ সৃষ্টি করা হয়

সমাজের মানুষের মনোজগতে একটা পরিবর্তন সৃষ্টি করার জন্য। চাপ সৃষ্টি করা হয় স্ব স্ব কাজে দায়িত্বপ্রাপ্তদের ওপর, যেন তারা প্রাপ্ত ফলাফলের প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যেগী হয়।

বছর বছর বাজেটের বরাদ্দ সাপেক্ষে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর পরিকল্পিতভাবে তথ্য সংগ্রহ করে সামাজিক গবেষক যে ফলাফলে উপনীত হন, রাজনীতিবিদ বা নেতা বিষয়গুলি পূর্ব থেকেই জানে। গবেষকের মাধ্যমে কেবল প্রমাণের অপেক্ষা। জনগনের নেতা বা রাজনীতিবিদ সার্বক্ষনিক সাধারণ মানুষের সাথে মেলা-মেশা করে। সাধারণ মানুষের সাথে মেলা-মেশা করলেই তথ্য জানা যায়। তাই সত্যিকারের এক একজন রাজনীতিবিদ বা নেতা এক একটি সামাজিক গবেষনা প্রতিষ্ঠান।

একজন থেকে একজনে মূল সংবাদটি নেতার কাছে পৌঁছে যায়। যেমন পিপড়েদের বেলায় ঘটে। রাজনীতিবিদগণ সেটাই করে। তারাও সত্যের সন্ধানি। সত্যিকারের নেতা তাই মানুষের সাথে দুরত্ব বজায় রেখে চলে না। চলে প্রটোকলধারীরা।

পিপড়েরাও মানুষের মত কর্মকান্ড করে। আমরা দেখতে পারি না, বুঝতে পারিনা বলে অবাক হয়ে যাই। কেবল পিপড়ে কেন, অনেক ক্ষেত্রে কিছু মানুষের কর্মকান্ডও ধরতে না পারার কারনে অবাক হয়ে যেতে হয়। অথচ অবাক করা বিষয়গুলির পেছনেও কাজ করে কিছু নিয়ম ও প্রক্রিয়া। একজন থেকে একজনে তথ্য পৌঁছে যায়। তথ্য অনেকের কাছেই পৌঁছায় কিন্তু কোন কাজ হয় না। কাজ হয় তখন, যখন তা কোন নেতার কাছে পৌঁছায়।

নেতা উদ্যেগী। নেতা প্রতিক্রিয়া প্রদর্শনকারী। নেতা ক্রিয়াশীল। নেতা পরিকল্পনাকারী। সংগঠক। নেতা সম্মিলিত ভালবাসার প্রতীক। ভালবাসা দিয়ে সম্পর্ক গড়ে তোলে। নেতা হিতকারী। সমন্বয়কারী। নেতা নির্দেশদাতা। নেতার মুখের কথায় মানুষ ছুটে চলে সম্পর্কের কারনে। ভালবাসার টানে। নেতা অনুপ্রেরণাদানকারী। কিন্তু গোপন প্রাপ্তির বাসনা- নেতৃত্ব ধ্বংসের কারন!

"... নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য বা স্ব-ধর্ম পালন কর এবং সফলতা-বিফলতার প্রতি আসক্তি বা কর্ম ফলভোগের চিন্তা বা বাসনা পরিত্যাগ কর। ...।" (গীতা ২:৪৮)
(লেখা ২০১৫)

বাস্তব-অবাস্তব

(Real-Unreal)

টিভিতে নাটক চলছে। নাটক দেখছি। আচ্ছা, নাটকে যা দেখছি সেটিকে কি বাস্তব বলা যায়? নাটকটি কি বাস্তবে হচেছ?

মঞ্চে নাটক চলছে। নাটক দেখছি। নাটকে যা দেখছি সেটি কি বাস্তব? নাটকটি কি বাস্তবে হচেছ? কোনটি বাস্তব? কোনটি বাস্তবে ঘটছে? টিভির নাটকটি? নাকি মঞ্চের নাটকটি? কিন্তু এগুলিতো বাস্তবে ঘটছে না। নাটকে ঘটছে। আবার এগুলি স্বপ্নও নয়। স্বপ্নে দেখছি না। বাস্তবে দেখছি। অতএব বাস্তব। আবার বাস্তবেও ঘটছে না। নাটকে ঘটছে। বাস্তব-অবাস্তব ও স্বপ্নের এক জটিল খেলা।

রাজনীতিতে নাটক চলছে। এটা বাস্তব। কিন্তু এক হিসেবে বাস্তব হচেছ সেটি যেটি সত্য। রাজনীতিতে সত্যের বাইরেও নাটক চলছে। সত্যের বাইরে যে নাটক চলছে সেটি বাস্তব সত্য নয়। নাটক। লোক ভুলানো। অথচ বাস্তবে ঘটছে।

কোনটি বাস্তব? টিভির নাটক, মঞ্চের নাটক নাকি রাজনীতির নাটক। সবগুলিই বাস্তব। একটিও অবাস্তব স্বপ্ন নয়। বাস্তব-অবাস্তবের ধারণায় আছে মাত্রা।

পৃথিবীতে মানুষ যে নাটক করে চলেছি, সেটি কি সত্যিই বাস্তব নাকি কোন স্বপ্ন। এমন মাত্রার স্বপ্ন যা বাস্তব মনে হয়!

বাস্তব এ পৃথিবীতে যখন আমরা ঘুমে অচেতন হয়ে স্বপ্ন দেখি, তখন সেটিও তো বাস্তব মনে হয়। বাস্তবের মত সকল অনুভূতিগুলি কাজ করে। প্রিয়াকে নিয়ে ঘুরে বেড়াই, একটুও অবাস্তব মনে হয় না। আনন্দ অনুভূত হয়! সিংহ আক্রমন করলে আতংকিত হই ততটাই যতটা বাস্তবে হই। বিপদে সাহায্যের জন্য ডাক দেই সেভাবেই যেভাবে বাস্তবে দিয়ে থাকি। যতক্ষন স্বপ্নে বিভোর থাকি ততক্ষন বাস্তব কি তা চিনিনা-জানিনা। ওটাকেই বাস্তব জানি। ঘুম ভেঙে যখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটে তখন বুঝি ওটা স্বপ্ন ছিল। বাস্তব নয়।

অবস্থার পরিবর্তনে আমরা বাস্তবে ফিরে আসি। অল্প সময় ঘুমাই তার চেয়েও অল্প সময় স্বপ্ন দেখি। অথচ ততটুকু সময়ে অনেক বড় ঘটনা ঘটে যায়। ঘুম ভাঙার পর বুঝি খুব স্বল্প সময় ঐ অবস্থাটিতে ছিলাম। অথচ ততটুকু সময়ের মধ্যেই পূর্ণাঙ্গ ঘটনা ঘটে যায়।

ঘুম অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। আবার ঘুম ভেঙে গেলে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। যখন যে অবস্থায় অবস্থান করি তখন সে অবস্থাটিকেই বাস্তব ভাবি। বাস্তব কি জানিনা!

মৃত্যুও অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। জানিনা, হতে পারে মানুষ আমরা এই পৃথিবীতে এক স্বপ্নে বিভোর। যা বাস্তব হিসেবে জানি। অথচ বাস্তব নয়। অবস্থার পরিবর্তনে যখন বাস্তবে পা রাখব, তখন এ জীবন স্বপ্ন মনে হতে পারে। এমন এক স্বপ্ন যা বাস্তবের মত। অবস্থার পরিবর্তনে, সময়ের হিসেবে অতি ক্ষুদ্র সময়ের মনে হতে পারে এ বাস্তব জীবন। স্বপ্নের মত।

"যেদিন তিনি তোমাদেরকে আহবান করবেন, অতঃপর তোমরা তাঁর প্রশংসা করতে করতে চলে আসবে এবং তোমরা অনুমান করবে যে, তোমরা সামান্য সময়ই (পৃথিবীতে) অবস্থান করেছিলে।" (আল-কোরআন ১৭:৫২)

"... পার্থিব জীবন এক মরিচীকা বই আর কিছু নয়।" (আল-কোরআন ৫৭:২০)

সত্যিকারের বাস্তব কি হয়তো সেটি বোঝা আমাদের জ্ঞানের পরিধীর বাইরে। মৃত্যুও একদিন এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাবে। মৃত্যু কি জানা নেই। বুঝিও না। কখনও পড়েছি-

"আল্লাহ মানুষের আত্মাকে গ্রহণ করেন তার মৃত্যুর সময় এবং যে আত্মা এখনও মরেনি সেটি তার নিদ্রাকালে। তিনি সে আত্মাটিকেই রাখেন যেটির জন্য তিনি মৃত্যুর নির্দেশ জারি করেছেন এবং অপরাপরদের নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অবকাশ/ছেড়ে দেন। নিশ্চয়ই! এতে চিন্তাশীলদের জন্য রয়েছে নিদর্শন।" (আল-কোরআন ৩৯:৪২) (লেখা ২০১৩)

ব্যাং

(Bang)

দশম শ্রেণীর ক্লাস চলছে। ক'দিন পর এস এস সি পরীক্ষা। বছরের শেষ দিকের ক্লাস। কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ পড়েছিল। সেগুলো পড়ানো হচ্ছে।

তপন স্যার জীব-বিজ্ঞান বিষয়টি পড়ান। আজ ব্যাঙের প্রজনন বিষয়ে পড়ানো হবে। সবকিছু ঠিকমত চলছিল। ব্যাঙের মিলনের বিষয়টি বোঝাতে গিয়ে স্যার একটু ইতস্তত করছিলেন। কিভাবে বোঝাবেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলেন না। দরজা-জানালা, এদিক-ওদিক তাকিয়ে শব্দ আবিস্কারের চেষ্টা করছেন। পরিপক্ক দু'চারজন এরই মধ্যে মুখ টিপে হাসতে শুরু করেছে। বয়োঃসন্ধিকালের প্রভাব বলা যেতে পারে।

স্যার উপযুক্ত শব্দ আবিস্কারের চেষ্টায় রত। নিরব হাসি ক্লাসময় দ্রুত ছড়িয়ে গেল সমুদ্রের জোয়ারের পানির মত। প্রথম দিকে বিষয়টি স্যার লক্ষ্য করেননি। বুঝতে পেরে ভাবনার এক ফাঁকে রাগ করে একটু ধমকও দিলেন।

স্যার ছিলেন মাটির মত ঠান্ডা মানুষ। ধমক শেষে স্যার আবার শব্দ চয়নে মননিবেশ করলেন। স্যারের ধমকের উল্টো ফল হল। ধমক শুনে হাসির রেশ অনেকগুণ বৃদ্ধি পেল। বইয়ের আড়ালে মাথা রেখে সবাই নিঃশব্দে হাসছে। চোখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। চাপা হাসিতে অনেকের গাল লাল হয়ে গেছে। চোখে পানি চলে এসেছে। কিন্তু শব্দ করা যাচ্ছে না।

স্যার সম্ভবত একটি যথাযথ শব্দ খুঁজে পেয়েছেন। দরজার দিক থেকে ক্লাসের দিকে মুখ ফিরিয়েছেন। কিছু একটা বলতে যাবেন মনে হচ্ছে। এমন সময় লক্ষ্য করলেন ক্লাসের সবাই মুখ চেপে চোখে-মুখে হাসছে। স্যার ধমক দিয়ে উঠলেন। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে সবাই একটু চুপ হওয়ার চেষ্টা করছে। মুখ তুলে স্যারের দিকে তাকিয়ে কথা শোনার চেষ্টা করছে।

স্যার ব্যঙের মিলনের বিষয়টি নিয়ে আবার আলোচনা শুরু করলেন। স্যার বলছেন- একটি ব্যাঙ যখন আরেকটি ব্যাঙের ওপরে ওঠে ..। এ সময় স্যারের মুখের কোনেও ঈষৎ হাসির রেখা দেখা গেলো। স্যারের চোখও হাসছে! সেই ঈষৎ হাসি আবার ক্লাসময় ছাত্রদের মধ্যে চাপা হাসির সৃষ্টি করলো। তারপর সে হাসি সুনামির রূপ ধারণ করলো। শব্দ করা যাচেছ না। অথচ হাসতে হচেছ। সবার

চোখ দিয়ে পানি গড়াতে লাগলো। স্যার বিরক্তির ভাব প্রকাশ করছেন। কিন্তু সার্বিক অবস্থা দেখে তিনি নিজেও আর সামাল দিতে পারছিলেন না। পরদিন পড়াবেন বলে চলে গেলেন।

প্র্যাকটিকাল ক্লাসে হাতে-কলমে শিক্ষা দেয়া হবে। ব্যাঙ কাটা হবে। সবাইকে ব্যাঙ সংগ্রহ করে আনার জন্য বলা হল। শুরু হল ব্যাঙ সংগ্রহের কার্যক্রম। রাতের আঁধারে বাতি নিয়ে খালে-বিলে হেন জায়গা নেই যেখানে ব্যাঙ খুঁজতে না গেলাম। এ সময় প্রথম দেখলাম একটি ব্যাঙ আরেকটি ব্যাঙের ওপর বসে আছে। যেটি স্যার ক্লাসে বোঝাতে চেয়েছিলেন।

চল্লিশ বছর পরের কথা। ফুটপাতে হাঁটছি। একটি ছেলে কাজের কিছু ছোট ছোট যন্ত্রপাতি বিক্রয় করছে। নিজে থেকে সামনে এগিয়ে এলো। হাতে ছোট্ট একটি স্ট্যাপলার মেশিনের মত যন্ত্র। যন্ত্রটির ভেতরে কাগজ নয়- কাপড়। স্ট্যাপলার মেশিনের মত চাপ দিলে কাপড়টি সেলাই হয়ে যাচ্ছে। চমৎকার লাগলো দেখে।

তপন স্যারের কথা মনে পড়ে গেল। স্যার জিলা স্কুলের সামনের রাস্তাটিতে দাড়িয়ে একরাতে তার একটি গবেষনাধর্মী চেষ্টার কথা বলছিলেন। তিনি এরকমই একটি মেশিন উদ্ভাবনের চেষ্টা করছিলেন, যা দিয়ে কাঁথা সেলাই করা সম্ভব হবে। ছোট্ট এ সেলাই মেশিনটি দেখে স্যারের ব্যাক্ত করা সেই ধারণার সাথে মিল খুঁজে পেলাম।

ভাবতে অবাক লাগে! মানুষের স্মৃতি একটি বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অপর একটি বিষয়কে কিভাবে সম্পর্কযুক্ত করে ফেলে।

অবাক হয়ে স্ট্যাপলার মেশিনটি দেখছি। পাতলা বেগুনি রঙের সার্ট পরিহিত তপন স্যারের ফর্সা-সুন্দর চেহারাটি স্মৃতিতে ভেসে উঠছে। তপন স্যারকে মনে পড়তেই ক্লাসে সেদিনের ব্যাঙের ঘটনাটি মনে পড়ে গেল। অশ্রুসজল হাস্যোজ্জল দু'চারজনের সেদিনের রক্তিম চেহারাও মানসপটে ভেসে উঠলো।

লেখাটিকে দীর্ঘ করব না। ব্যাঙ শব্দটি উচ্চারিত হতেই শব্দটি নিয়ে আরও একটি কথা মনে পড়ে গেল। একটি ঘটনার সাথে অপর একটি ঘটনা কোন কারনে মস্তিস্কে সম্পর্কযুক্ত হয়ে যায়।

ব্যাং

ছোট্ট একটি প্রাণী ব্যাঙ। তাকে নিয়ে কথা বলছিলাম। এবার বিগ ব্যাং নিয়ে বলে শেষ করতে চাই। কখনও পড়েছিলাম এবং বৈজ্ঞানিক দিক নির্দেশনাজনিত একটি সূত্রের সন্ধান পেয়েছিলাম।



"যারা অবিশ্বাস করে তারা কি জানে না যে, নভোমন্ডল ও পৃথিবী একত্রিত ছিল, অতপর আমি তাদেরকে পৃথক করেছি ... তারপরেও কি তারা বিশ্বাস করবে না?" (আল-কোরআন ২১:৩০)

কোরআনে বলা হয়েছে, কেবল জ্ঞানসম্পন্নরাই আল্লাহর বাণী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। সেগুলিকে কাজে লাগায়। জিওগ্রাফি কিংবা ডিসকভারী চ্যানেলে নানান বিষয় দেখানো হয়। যারা কোরআন, গীতা এসব গ্রন্থগুলির ভেতরের কথাগুলি জানেন বা বোঝেন, তারা নানান বিষয়ে প্রচারিত আধুনিক কিংবা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাসমুহের মূল উৎসগুলি সেখানে খুঁজে পান এবং ভেবে অভিভূত হন যে, এ গ্রন্থসমুহই আদি দিক নির্দেশনা। যা মানবকে আজকের পর্যায়ে নিয়ে এসেছে।

মা

(Mother)

মায়ের চেয়ে আপন এ পৃথিবীতে আর কেউ নেই। মা কতটা দিন কষ্ট করে সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেছেন। অতপর লালন-পালন করেছেন। প্রাচীন কাল থেকেই তাই মায়ের সাথে সন্তানের ভাল আচরণে ধর্মগ্রন্থগুলো নির্দেশনা দিয়ে এসেছে। এ পৃথিবীতে মা সবচেয়ে আপনজন। সর্বজন স্বীকৃত। এ একটি বিষয়ে কোন বিতর্ক নেই।



মা কেন এত ভাল? সন্তানকে কেন এত ভালবাসেন? কেন জীবন দিয়ে ভালবাসেন সন্তানকে? কি সেই রসায়ন, যার জন্য মা সন্তানকে আপন প্রাণের কাছাকাছি ভালবাসেন? কখনও কখনও বেশী। রাসায়নিক সে সূত্র কিভাবে মায়ের ভেতরে প্রবেশ করেছে? মা কি নিজে সেই রসায়নের স্রষ্টা?

রসায়নের স্রষ্টাতো হবে পরে। তার পূর্বে তো তার নিজের অস্তিত্ব। এই যে মায়ের অস্তিত্ব, সেটিও কি মায়ের নিজের সৃষ্টি? মা কি নিজেকে নিজে সৃষ্টি করেছেন? অতপর সন্তানের প্রতি ভালবাসার যে রসায়ন, সেটি কি মা নিজের মধ্যে নিজে প্রবেশ করিয়েছেন? কোন কিছুতেই মায়ের হাত নেই।

মা আপনা থেকেই মা। সন্তান গর্ভে ধারণ করে কষ্ট করার কারনে মা। মায়ের ভেতর আপনা থেকে নানান রসায়ন প্রবেশ করেছে। আপনা থেকে সব কিছু যিনি হওয়ান কৃতিত্বটা তার।

তিনি চাইছেন বলে মা সন্তানকে এত ভালবাসেন। সে রসায়নের স্রষ্টাও তিনি। সে রসায়ন মায়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়েছেন তিনি। তিনি চাইলে মা সন্তানকে খেয়েও ফেলতে পারতো। তেমন রসায়ন তিনি মায়ের মধ্যে দিয়ে দিতে পারতেন। জীব-জগতে তেমন নিদর্শনও আছে।

তিনি চাইলে সিংহ মহিষকে খেয়ে ফেলতে পারে। কেননা তিনি সে সূত্রে সিংহকেও সৃষ্টি করেন, আবার মহিষকেও সৃষ্টি করেন। তিনি চাইলে মহিষ আর সিংহের বন্ধুত্বও গড়ে তুলতে পারেন। তিনি চাইলে সিংহের কাছে মহিষকে লালন-পালন করাতে পারেন।

মানবের হৃদয়, সিংহের হৃদয়, মহিষের হৃদয় যে রসায়নে কোন কিছুকে আকর্ষন বা বিকর্ষন করে, সে সত্যের সূত্রের স্রষ্টা তিনি। তিনি ভেতরের রসায়নের পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়ে জীবন ও জগতের সব হিসেব-নিকেশ ওলট-পালট করে দিতে পারেন।

মানুষ, সিংহ, মহিষ এক একটি ছাঁচ। ভেতরের রসায়ন 'চরিত্র'। সিংহের রাসায়নিক সূত্র মানবের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিলে মানুষ মহিষের ওপর ঝাঁপিয়ে পরবে। মানুষের রসায়ন সিংহের মধ্যে প্রবেশ করালে মানুষ দেখে সিংহ ঘাপটি মেরে পালিয়ে যাবে।

নানান ছাঁচ আর নানান ক্যামিকেলস এর খেলা এ জীবন। বাজারের কৃত্রিম জুসের মত। একেকটার রূপ-রস-গন্ধ একক রকম।

"জীব সত্ত্বাসমুহ .. দেহ ধারণ করে একটি নির্দিষ্ট প্রকারের কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা ও স্পর্শের অনুভূতি লাভ করে, যা মনের সাথে একসাথে সম্পৃক্ত হয়। এই প্রকারে সে একটি নির্দিষ্ট ধরণের অনুভূতির গুণাগুণ লাভ করে।" (গীতা ১৫:৯)

আমরা যেটাতে অভ্যস্ত হয়ে যাই এর বিপরীতটা মেনে নিতে পারি না। যে মেনে নিতে পারে না সেটি তার নিজস্ব সমস্যা। বুঝাবার জন্য স্রষ্টা নানান নিদর্শন প্রদর্শন করেছেন। কেউ দেখে, কেউ ব্যাস্ততার কারনে পারে না। তবে সবারই বুঝতে পারার সম্ভাবনা আছে।

মায়ের ভালবাসায় মায়ের কৃতিত্ব নেই। কৃতিত্ব যিনি সেভাবে মাকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর। তাই জগতের সকল প্রশংসা তাঁর।

"... সকল প্রশংসাই আল্লাহর! কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।" (আল-কোরআন ৩১:২৫)

এই যে মাকে এত ভালবাসি। কেন? মা না থাকলে কি ভালবাসতে পারতাম না? মাকে পেলাম কিভাবে। মা নিজে নিজে সৃষ্টি হয়ে আসেননি। ভালবাসার মন নিয়ে নিজেও তাকে সৃষ্টি করিনি। মাকে পেয়েছি বলে তাকে চিনি। ভালবাসি। স্রষ্টা মাকে সৃষ্টি করেছেন বলে মাকে প্রাণ দিয়ে এত ভালবাসতে পারি। তাকে

ভালবাসতে পারার পেছনেও স্রষ্টা আসল। স্রষ্টাই সবার সামনে মা রূপি মাকে উপস্থাপন করেছেন। তাকে মায়ের মত পেয়েছি তাই এত ভালবাসি। আর যিনি ভালবাসার জন্য মাকে এভাবে সামনে উপস্থাপন করেছেন তাঁর স্থান কোথায়?

সমস্ত ভালবাসার পেছনে সেই তিনি 'একজন'। যেই একজনকে আমরা কেউই চিনি না। মায়ের জন্য যত ভালবাসা, তার চেয়েও অধিক প্রাপ্য তাঁর; যিনি এত ভালবাসা ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে সৃষ্টি করেছেন আমাদের। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর!

মানব সৃষ্টি ও বিবর্তন
(Creation of mankind and Evolution)

কথাগুলি জ্ঞান কিংবা বিজ্ঞান সম্মত হবে কিনা জানিনা। কেননা এর সত্যাসত্য জানা নেই। এর স্বপক্ষে কোন প্রমাণও নেই। এটি কেবলই একটি ধারণা। তবুও লিখে রেখে যেতে চাই। লেখকের সে স্বাধীনতা আছে বা থাকতে হয়। কখনও কারও কাজে লাগলে লেগেও যেতে পারে। আবার যদি কোন কাজে নাও লাগে, তবুও তাতে কোন সমস্যা নেই। পাঠ করেও অনেকে আনন্দ পেতে পারে।

একদা আল্লাহ বললেন, 'হও'। আমি হয়ে গেলাম। কেননা আল্লাহ হও বললেই তা হয়ে যায়। বলা হচ্ছে,

"কোন কিছুর প্রতি আমার নির্দেশনা, যখন আমি কিছু করার ইচ্ছে করি, তখন তাকে কেবল বলি: হও! এবং তা হয়ে যায়।" (আল-কোরআন ১৬:৪০)

"আমার নির্দেশনা, কেবল একটিমাত্র নির্দেশনা যা চোখের পলকের এক মুহূর্তে সম্পন্ন হয়।" (আল-কোরআন ৫৪:৫০)

এই যে আমি হয়ে গেলাম, তার কি কোন প্রক্রিয়া নেই? আমার পূর্বে পূর্ববর্তী দু'জন মানুষকে হতে হয়েছে। তারা একটি পরিবেশে বড় হয়েছে। তাদের সামাজিক কর্মকান্ডসমুহ সম্পন্ন হয়েছে। তাদের মধ্যে মিলন ঘটেছে। একটি বীজ কোন ভূমিতে পতিত হয়েছে। সেটি পরিপূর্ণরূপ লাভ করতেও দশ মাস সময় লেগেছে। অতপর আমি ভূমিষ্ট হয়েছি। দীর্ঘ প্রক্রিয়া; অনেক সময়ের ব্যাপার!

যেটি আমার কাছে দীর্ঘ সেটি আরেকজনের কাছে মুহুর্ত। একেক অবস্থা ও অবস্থানে এই প্রক্রিয়া ও সময় কখনও দীর্ঘ, কখনও মুহুর্ত। ঠিক যেমন আমাদের একদিন বৃহস্পতির একদিনের সমান নয়। আবার আমাদের একদিন একটি পিপড়ের কাছে কত দীর্ঘ জানা নেই। আল্লাহর দৃষ্টিতে যেটি মুহুর্ত, আমাদের জন্য সেটি মিলিয়ন-বিলিয়ন হতে পারে। বলা হচ্ছে,

"... তোমার পালনকর্তার একদিন তোমাদের গণনার সহস্র বছরের সমান।" (আল-কোরআন ২২:৪৭)

"মানবীয় হিসেবে হাজার হাজার বছরে ব্রহ্মার একদিন এবং তাঁর রাতের সময়ের হিসেবও তেমনই।" (গীতা ৮:১৭)

একেক অবস্থা ও অবস্থানে এই প্রক্রিয়া ও সময় দীর্ঘ কিংবা মুহূর্ত। আমরা গুগল সার্চ এ কমান্ড দেই। মুহূর্তে সেটি আমাদের সমীপে হাজির হয়ে যায়। ভেতরে কি কোন ক্রিয়া নেই? কোন প্রক্রিয়া নেই? সেই প্রক্রিয়ার অভ্যন্তরে কর্মরত উপাদান সমুহের কাছে সময়ের ব্যাপ্তি কেমন তার কি কোন গবেষনা প্রসূত উত্তর বা ফলাফল জানা আছে? মুহূর্তে সব আমাদের সমীপে হাজির হয়ে যায়। তেমনিভাবে বলা হচ্ছে,

"... একদিন সমস্ত কিছু তাঁর সমীপে পৌঁছাবে, যার পরিমাণ তোমাদের গণনায় সহস্র বছর।" (আল-কোরআন ৩২:৫)

"... সেদিন তাদের মনে হবে যেন তারা দিনের এক মুহূর্তের বেশী সময় পৃথিবীতে অবস্থান করেনি। এটি সুস্পষ্ট বার্তা। ...।" (আল-কোরআন ৪৬:৩৫)

আল্লাহ মানুষকে তাঁর নিদর্শন প্রদর্শন করেন যেন মানুষ জানতে পারে যে, আল্লাহ সব করতে পারেন। বলা হচ্ছে,

"সৃষ্টিগতভাবে মানুষ ত্বরাপ্রবণ। আমি মানুষকে আমার নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করব, তবে আমাকে ত্বরা করতে বল না।" (আল-কোরআন ২১:৩৭)

বর্তমান পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহর অনেক নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে চলেছে। চৌদ্দ'শ বছর পূর্বে যখন এসব কথা বলা হয়েছে তখন তা কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না। এমন কি গত শতাব্দীতে কিংবা বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকেও সেসব কল্পনা করা সম্ভব ছিল না।

গুগল সার্চের ভেতরে যে প্রক্রিয়া তা এত দ্রুত সম্পন্ন হয় যে, সাধারণভাবে মানুষ তা ধরতে বা বুঝতে পারে না। মুহূর্তে আমাদের কমান্ড কার্যকরী হয়ে যায়। আজ মুহূর্তে তথ্য চলে আসছে। একদিন হয়তোবা বস্তু বা দ্রব্যও চলে আসবে মুহূর্তে।

এখন অবশ্য এমন আজগুবি কিছু ভাবতে দ্বিধাবোধ হয় না। কেননা এত এত অসম্ভব কিছু আমাদের চোখের সামনে বা জীবদ্দশাতেই বাস্তব রূপ লাভ করেছে যে, এখন বিশ্বাস হয় যে আরও অনেক অসম্ভবকে আল্লাহ চাইলে সম্ভব করে দিতে পারেন। আল্লাহ সব পারেন। জগতে কখনও হয়তোবা তেমন অবস্থা পূর্বেও বিদ্যমান ছিল। যেমন বলা হচ্ছে,

"সোলায়মান বলল, 'হে পরিষদবর্গ, তারা আত্মসমর্পন করে আমার কাছে আসার পূর্বে কে আমাকে তার (সেবার রাণীর) সিংহাসন এনে দেবে?' এক

শক্তিশালী জ্বিন বলল, 'আপনি অপনার স্থান থেকে ওঠার পূর্বেই আমি আপনাকে তা এনে দেব ...।' (কিন্তু) যার গ্রন্থ সম্পর্কিত জ্ঞান ছিল (জ্ঞানী বা বিজ্ঞানী) তেমন একজন বলল, 'আপনার চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আমি তা আপনাকে এনে দেব।' অতপর সোলায়মান যখন তা সামনে রক্ষিত দেখল তখন বলল, 'এটি আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ ...।'" (আল-কোরআন ২৭:৩৮-৪০)

আল্লাহর নির্দেশের সাথে সাথে আমি যদি নিজেকে বা অন্য কাউকে হয়ে যেতে দেখতাম, তবে প্রক্রিয়াটি সহজে জানতে, বুঝতে বা ধরতে পারতাম না। তাই আল্লাহ বলেন,

"তিনিই আল্লাহ যিনি সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আকাশ এবং পৃথিবীকেও তিনি সেভাবেই সৃষ্টি করেছেন। এদের মাঝে তাঁর আদেশ অবতীর্ণ হয় ধীরে, যেন তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম ...।" (আল-কোরআন ৬৫:১২)

আমাদের অবস্থা ও অবস্থান থেকে আমরা আল্লাহর আদেশকে ধীরে কার্যকর হতে দেখি। তাই প্রক্রিয়াটি বুঝতে পারি এবং শিখি।

এত কথা বলতে হল কেবল এইটুকু বোঝাবার জন্য যে, আল্লাহ হও বললে হয়ে যায়, বিষয়টি সত্য। তথাপি এর ভেতরে আছে বড় প্রক্রিয়া, অনেক কর্মযজ্ঞ। যেমন বীজ থেকে একটি গাছ বড় হয়ে ফুলে-ফলে সুশোভিত হতেও ভেতরে অনেক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া কাজ করে। অনেক রূপ ও পরিবর্তনকে ধারণ করে। সময়ের সাথে সাথে এই পরিবর্তনই বিবর্তন। আমরা কেবল নির্দিষ্ট সময় পরে সব হয়ে যেতে দেখি। এই নির্দিষ্ট সময়টি কারও কাছে দীর্ঘ, কারও কাছে মুহূর্ত। অবস্থা ও অবস্থানের নানাবিধ শর্তাবলীর তারতম্যের কারনে তেমনটি হতে পারে। যা বিজ্ঞানীরা ভাল বলতে পারবেন।

বাইবেলে বলা হয়েছে, শুরুতেই গড বিশ্ব-ব্রহ্মান্ড তথা স্বর্গ-মর্ত্য সৃষ্টি করেন। গড বললেন, 'লেট দেয়ার বি লাইট'। সব আলোকিত হয়ে উঠলো। গড নির্দেশ দেয়ার সাথে সাথেই সেটি হয়ে যায়।

গড অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশ থেকে আলোকিত অংশকে পৃথক করলেন। আলোকিত অংশের নাম দিলেন 'দিন' এবং অন্ধকার অংশের নাম দিলেন 'রাত'। সৃষ্টির প্রথম দিন সমাপ্ত হলো।

তৃতীয় দিন পানিকে নির্দিষ্ট স্থানে একীভূত করলেন। বললেন, 'লেট দ্যা ড্রাই ল্যান্ড'। শুষ্ক ভূমি সৃষ্টি হলো। শুষ্ক ভূমিকে গড 'পৃথিবী' নামে অভিহিত করলেন। একীভূত পানিকে নাম দিলেন 'সাগর'। অর্থাৎ গড নির্দেশ দেয়ার সাথে সাথেই সেটি হয়ে যায়।

এই হয়ে যাওয়ার মধ্যেও কি কোন প্রক্রিয়া নেই? তাহলে প্রথম দিন, দ্বিতীয় দিন, তৃতীয় দিনের কথা আসলো কেন? এগুলি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার এক একটি দিন। এতগুলি দিনের কর্মযজ্ঞ ব্যাতিত মুহুর্তেই তো সব হয়ে যেতে পারত, তাই নয় কি? কোরআনে বলা হয়েছে,

".. তোমরা কি সেই সত্ত্বাকে অস্বীকার কর যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দুই দিনে ... এবং চার দিনে তার রসনার ব্যবস্থা করেন ... অতপর তিনি নভোমন্ডলীকে দুই দিনে সপ্ত আকাশে পরিণত হতে নির্দেশ দিলেন ...।" (আল-কোরআন ৪১:৯-১২)

বস্তুত আল্লাহ বলার সাথে সাথে মুহুর্তেই সব হয়ে গেছে; এটিও সত্য। কিন্তু মানবীয় হিসেবে প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনের প্রসঙ্গ এসছে। বাইবেল ও কোরআন উভয় গ্রন্থই বলছে যে, ছয় দিনে গড সমগ্র সৃষ্টি-কর্ম সম্পন্ন করেন। সেই এক একটি দিনও আবার মানবীয় হিসেবে অজস্র সহস্র বছর। কিন্তু আল্লাহর হিসেবে মুহুর্ত।

এত কথা বলতে হল শুধু এ বিষয়টিকে তুলে ধরার জন্য যে, মুহুর্তই হোক আর দীর্ঘই হোক সর্বত্র রয়েছে একটি প্রক্রিয়া। সে প্রক্রিয়া কারও কাছে দীর্ঘ, কারও কাছে মুহুর্ত।

নানান শর্তে এক একটি বিষয় এক এক জনের কাছে এক এক রকম। একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষ আর একটি শিশু যদি একসাথে এক মাইল পথ পায়ে হেঁটে চলতে শুরু করে, তবে শিশুটির কাছে যেটি অত্যান্ত দীর্ঘ ও পরিশ্রমসাধ্য মনে হবে, পূর্ণ বয়স্ক ব্যাক্তির কাছে ততটা মনে হবে না। অর্থাৎ অবস্থা, অবস্থান, শক্তি-সামর্থ ইত্যাকার নানাবিধ শর্তের কারনে একই বিষয় কারও কাছে দীর্ঘ ও কঠিন, আবার কারও কাছে মুহুর্ত ও সহজ বোধ হতেই পারে। একই ব্যক্তির কাছে দুঃখের সময়গুলি দীর্ঘ মনে হয়, আবার সুখের সময়গুলি সংক্ষিপ্ত মনে হয়। অর্থৎ নানাবিধ শর্তের কারনে এক একটি বিষয় দীর্ঘ কিংবা মুহুর্ত।

"নিঃসন্দেহে! ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্তের মতোই। তিনি তাকে ধূলো থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং বলেছেন, 'হও! এবং সে হয়ে গেল।" (আল-কোরআন ৩:৫৯)

কোরআনের কথা সত্য। আমরা কি ওপরের আয়াতের শাব্দিক অর্থ বিবেচনা করব, নাকি মর্মার্থ? অর্থাৎ 'হও' বলেছেন আর ধূলিকণা সরাসরি ঈসাতে রূপান্তরীত হয়েছে? তিনি কি মায়ের গর্ভে একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জন্ম গ্রহণ করেননি?

ঠিক তেমনি আদমকে 'হও' বলেছেন, আদম সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সেখানেও আছে জটিল প্রক্রিয়া। আবার সেটি অত্যান্ত দীর্ঘ প্রক্রিয়াও হতে পারে। অপরাপর মানুষের সৃষ্টি এবং প্রথম মানব আদমের সৃষ্টির প্রক্রিয়া এক নাও হতে পারে। কেননা পরের সৃষ্টিগুলি কপি-পেষ্ট করার মত। কিন্তু আদমের সৃষ্টির প্রক্রিয়া তুলনামূলক জটিল ও দীর্ঘ হওয়াই স্বাভাবিক।

আদমকে সৃষ্টির পূর্বে তাকে রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি সৃষ্টি করতে হয়েছে। পৃথিবী সৃষ্টি করতে হয়েছে। সেখানে আছে জল ও স্থল। মানবীয় হিসেবে এতসব সৃষ্টি করতে মিলিয়ন মিলিয়ন বছর সময় লেগে যেতে পারে।

আদমের পূর্বে কোন মানব ছিল না। অতএব তিনি মায়ের গর্ভে জন্ম নেননি। অর্থাৎ তার সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি অপরাপর মানুষের সৃষ্টির প্রক্রিয়া থেকে ভিন্ন। তার সৃষ্টি বা পরিপূর্ণ মানবরূপ লাভ সময়ের সাথে সাথে নানান পরিবর্তনকে ধারণ করে বিবর্তনের মধ্য দিয়েও হতে পারে। একটি প্রক্রিয়া। বিষয়টি একেবারেই অমূলক নয়। আমরা কেউই এসব বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছুই জানি না। আল্লাহ জানেন। তিনি আমাদেরকে বিস্তারিত জানাননি। তাই আমরা অনুমান বা ধারণা করি। আবার কখনও গবেষনা করে সে সত্য উদঘাটনের চেষ্টা করি।

প্রথমে কোন বীজ থেকে জলে এককোষী প্রাণীর সৃষ্টি হতে পারে। অতপর সেখান থেকে মৎস্য জাতীয় প্রাণী। অতপর উভচর প্রাণীর সৃষ্টি। তারপর ডাঙ্গায় বসবাসকারী প্রাণী। সেখান থেকে নানান রূপের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এক পর্যায়ে মানুষের আকৃতি লাভ। বিষয়গুলি এভাবেও ঘটতে পারে। মিলিয়ন মিলিয়ন বছর সময় লেগে যেতে পারে এ বিবর্তন প্রক্রিয়ায়। মানবের পরিপূর্ণ রূপ লাভের এ প্রক্রিয়ারই পূর্বের কোন এক অংশে মানব বানরাকৃতি গ্রহণ করে থাকতে পারে। এভাবে ভাবলেও কোন সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

বস্তুত একই প্রাণ বিবিধ প্রকার ছাঁচের ভেতর অবস্থান করে। বলা হচ্ছে,

"... আমিই সেই পালনকর্তা, আত্মারূপে সকল জীবের অন্তরে বসবাস করার মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করি।" (গীতা ৪:৮) "... সকল জীবসত্ত্বায় আমিই জীবনের গতি ...।" (গীতা ১০:২২)

ছাঁচ হচ্ছে ডিজাইন। ছাঁচের পার্থক্যের কারনে প্রাণীদের আমরা বিভিন্ন নামে ডাকি বা চিহ্নিত করি। কিন্তু সব যন্ত্রের মূল উপাদান একই প্রকার। সকল প্রাণীকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বিষয়গুলি সহজেই বোঝা যাবে। দু'টি হাত, দুটি পা তা যে নামেই ডাকি না কেন। অর্থাৎ কখনও দুটি হাত না বলে চারটি পা বলি। আছে চোখ। চোখ না থাকলেও দেখার বা বোঝার কোন না কোন রকম ব্যবস্থা আছে। আছে নাক। নাক না থাকলেও শ্বাস নেয়ার কোন না কোন রকম ব্যবস্থা আছে। আছে জিহ্বা, মুখ, পেট, ফুসফুস, মাথা, ক্ষুদ্র হোক বৃহৎ হোক মস্তিস্ক ইত্যাদি। বলা হচ্ছে,

"জীবসত্ত্বাসমুহ এইভাবে অন্য দেহ ধারণ করে একটি নির্দিষ্ট প্রকারের কর্ণ, জিহ্বা এবং নাসিকা ও স্পর্শের অনুভূতি লাভ করে, যা মনের সাথে একসাথে সম্পৃক্ত হয়। এই প্রকারে সে একটি নির্দিষ্ট ধরণের অনুভূতির গুণাগুণ লাভ করে ও উপভোগ করে।" (গীতা ১৫:৯)

আল্লাহর ব্যবস্থাপনায় কর্মের কারনে পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা আছে। আল্লাহর ব্যবস্থাপনায় কত রকমের শাস্তি ও কত রকমের পুরস্কার থাকতে পারে তার সব আমাদের জানা নেই। কত প্রকারের নারকীয় কষ্ট ও কত প্রকারের স্বর্গীয় সুখ হতে পারে আমাদের সব জানা নেই। আমরা কিছু জানি কিন্তু সব জানি না এবং মানুষের পক্ষে আল্লাহর সব জানা সম্ভবও না। যেমন বলা হচ্ছে,

"কেউ জানে না তাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ তাদের জন্য আনন্দের কি কি লুক্কায়িত আছে।" (আল-কোরআন ৩২:১৭)

স্বর্গ কোন সুখের স্থান ও অবস্থান। আবার নরক কোন কষ্টের স্থান ও অবস্থান। কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক কেউ তা জানে না। পার্থিব জীবনেও অনেকে নরকের শাস্তি ভোগ করে চলেছে। বলা হচ্ছে,

"অনেক জ্বিন ও মানুষ এখনও নরকের আস্বাদ গ্রহণ করছে।" (আল-কোরআন ৭:১৭৯)

অর্থাৎ সব সময় নরকে যেতে হবে না। কখনও নরক নিজেই এসে ভর করবে। এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর ব্যবস্থাপনায় পুরস্কার ও শাস্তির নানান ব্যবস্থা আছে। সব আমরা জানি না। কিছু জানি। কিছু বুঝি বা অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধিবোধ থেকে অনুমান করি।

মানুষ একটা ছাঁচ। এ ছাচের মধ্যে তাকে রাখা হয়েছে। সে সৃষ্টির সেরা। অতএব সে পুরস্কৃত। সুখী অবস্থায় আছে। কিন্তু এ প্রাণটাকে যদি হাতির ছাঁচে রাখা হয়? অনেক বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়? কিংবা পিপড়ের ছাঁচে? যে নিজ ওজনের বিশগুণ বেশী বোঝা টেনে বেড়াবে? বা অন্য কোন নিকৃষ্ট জীবের ছাঁচে? তখন সে হয়তোবা হতে পারে শাস্তিপ্রাপ্ত। নরক যন্ত্রনা এভাবেও ভোগ করা যেতে পারে। বলা হচ্ছে,

"অসুর জাতীয় প্রাণী- জগতে পুণঃ পুণঃ জন্ম নেয়, এমন ব্যাক্তিগণ কখনই আমাকে পায় না। ধীরে ধীরে তারা ভীষন ঘৃণিত ধরণের জীবে পরিণত হয়।" (গীতা ১৬:২০)

অর্থাৎ শাস্তির একটা ধরণ হতে পারে ধীরে ধীরে পুণঃ পুণঃ জন্মের মাধ্যমে নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর ধরণের জীবে পরিণত হওয়া। একটি প্রক্রিয়া। যা মানুষের মতো উৎকৃষ্ট কোন কিছু আহারও করতে পারবে না। যেমন বলা হয়েছে,

"তাদের সম্মুখে রয়েছে নরক। তাদেরকে পূঁজ মেশানো পানি পান করানো হবে। যা সে পান করবে কিন্তু গলধঃকরণ করতে পারবে না। প্রতি দিক থেকে তার কাছে মৃত্যু যন্ত্রনা আসবে কিন্তু সে মরবে না।" (আল-কোরআন ১৪:১৬-১৭)

অর্থাৎ শাস্তি প্রাপ্তরা নিকৃষ্ট ধরণের জীবে পরিণত হয়ে নিকৃষ্ট কিছু আহার বা পান করবে। উপস্থাপন ভিন্ন হলেও গীতা ও কোরআনের বক্তব্যের মর্মার্থে সাজুয্যতা আছে।

আদম হাওয়া স্বর্গে সুখী অবস্থায় ছিল। আল্লাহর আদেশ অমান্য করায় তারা শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছে। বিষয়গুলি আমরা জানি। তারা স্বর্গ থেকে বহিস্কৃত হয়েছে। এসেছে পৃথিবীতে। বাইবেলে বলা হয়েছে,

গড অ্যাডামকে বললেন, তোমাদেরকে পৃথিবীতে বসবাস করতে হবে। শরীরের ঘাম ঝরিয়ে তোমাদেরকে আহার সংগ্রহ করতে হবে, যতদিন না ফিরিয়ে আনা হবে। ধুলো থেকে সৃষ্টি তোমাদেরকে ধুলোয় মিশে যেতে হবে।

অতঃপর গড অ্যাডাম ও ইভকে চামড়ার পরিচ্ছদ দ্বারা আবৃত করেন। কোরআনে এভাবে বলা হয়েছে,

"আমি (আল্লাহ) বললাম: নেমে যাও। ... কিছুকালের জন্য তোমাদেরকে পৃথিবীতে অবস্থান করতে হবে এবং সেখানে তোমাদের জন্য জীবনোপকরণের ব্যবস্থা থাকবে। ... তোমরা সেখানেই জীবনযাপন করবে, সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে এবং সেখান থেকেই পুনরুত্থিত হবে।" (আল-কোরআন ২:৩৬, ৭:২৫)

স্বর্গ থেকে তারা পৃথিবীতে কিভাবে এসেছে? রকেটে চড়ে? তারা তো শাস্তিপ্রাপ্ত। হতে পারে তারা নিকৃষ্ট জীবে পরিণত হয়েছে। অতপর বিবর্তনের ধারায় তারা মিলিয়ন মিলিয়ন বছর পরে আবার মানুষে রূপান্তরীত হয়ে পৃথিবীতে আগমন করেছে। প্রথম মানব আদমের সৃষ্টি এই বিবর্তনের ধারায়ও হয়ে থাকতে পারে। শাস্তিপ্রাপ্ত হয়ে পুনরায় সেই একই প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়ে পৃথিবীতে অবস্থান নেয়। বিষয়টি এমনও হতে পারে। পাঠক! স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য বলি যে, এগুলি কেবলি ধারণামাত্র।

বিবর্তনের এ ধারার কোন এক পর্যায়ে মানুষ বানর আকৃতিরও হয়ে থাকতে পারে। শাস্তিপ্রাপ্তদের এমন পরিণতি হওয়া অস্বভাবিক নয়? যেমন বলা হয়েছে,

"বল (হে মোহাম্মদ) : আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়েও নিকৃষ্ট পরিণামের সংবাদ দেব যা আল্লাহর কাছে আছে? যাদের প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন, যাদের প্রতি তিনি ক্রোধান্বিত হয়েছেন এবং যাদের কতককে বানর ও শুকরে রূপান্তরীত করেছেন ...।" (আল-কোরআন ৫:৬০)

আবার বলা হয়েছে, "হে অবতীর্ণ গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায়! ... (বিশ্বাস স্থাপন কর) এমন হওয়ার পূর্বেই, যখন আমি মুখমন্ডল সমুহকে বিকৃত করে পশ্চাৎ দিকে বা পেছন দিকে বা পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেব, কিংবা অভিসম্পাত করার পূর্বেই, যেমন অভিসম্পাত করা হয়েছিল 'সাব্বাথ' বা শনিবার দিবস পালন ভঙ্গকারীদের।" (আল-কোরআন ৪:৪৭)

পেছন দিকে বা পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। পূর্বের অবস্থাটি কি ছিল? অভিসম্পাতের কারনে পূর্বের অবস্থায় ফিরে গিয়েছিল 'সাব্বাথ' ভঙ্গকারীরা। বলা হচ্ছে,

"এবং তোমরা তাদেরকে ভালভাবেই জান যারা 'সাব্বাথ' বা শনিবার দিবস পালন সম্পর্কিত অঙ্গীকারের বিষয়টি ভঙ্গ করেছিল। কিরূপে আমি তাদেরকে

বলেছিলাম, ‘তোমরা লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত বানর হয়ে যাও’ এবং এ বিষয়টিকে তাদের নিজেদের ও পরবর্তীদের জন্য এবং খোদাভীরুদের জন্য এক সতর্ককারী দৃষ্টান্তরূপে (আমি/আল্লাহ) রেখে দিয়েছি।” (আল-কোরআন ২:৬৫-৬৬)

বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় মানুষ থেকে বানর কিংবা বানর থেকে মানুষ হওয়া অস্বাভাবিক বা অসম্ভব কিছু না। আল্লাহ সব করতে পারেন! (লেখা ২০১৩)

মানুষ এক কনটেইনার

(Man: A Container)

পৃথিবীর তাবৎ ভাল লিখনের শিক্ষক। কেননা সে ভাল পথে চলতে শেখায়। সহজ-সরল-সোজা পথে চলতে শেখায়। কোথায় পায় লিখন সে শিক্ষা যা ভাল? প্রকৃতি থেকে। পাহাড়, নদী-নালা, খাল-বিল, গাছ-পালা, আকাশ-বাতাস, বৃষ্টি, চন্দ্র-সূর্য্য-তারা সবাই অবিরাম কাজ করে চলেছে। অপরের জন্য। তাদের থেকে লিখন শিক্ষা পায়। ভালটি শেখে।

যে সব মানুষ গত হয়ে গেছে তাদের ভাল কর্ম থেকেও ভালটি শেখে। যারা ভাল পথে আজও ডাক দিয়ে যায় তাদের থেকেও ভালটি শেখে। ভাল লিখনকে সাদা-মাটা জীবন যাপন করতে শেখায়। ভাল তার সবচেয়ে ভাল শিক্ষক।

মন্দকে লিখন ঘৃণা করতে শিখেছে। ভাল লিখনকে সে শিক্ষা দিয়েছে। সমাজও দিয়েছে। তবু লিখন মন্দকে ঘৃণা করে না। জীবনের অভিজ্ঞতা লিখনকে এ উপলব্ধীবোধে উপনীত করেছে। মন্দও লিখনের শিক্ষক। মন্দ থেকেও লিখন শিক্ষা পায়। মন্দ থেকেও সে ভালটি শিখেছে। মন্দ তাকে ভালটি আঁকড়ে ধরতে শিখিয়েছে। মন্দের ফলাফল ভাল পথে চলতে শিখিয়েছে। মন্দই ভবিষ্যতে মন্দ থেকে বিরত থাকতে শিখিয়েছে।

মন্দ মস্তিষ্ককে ধারালো করেছে। সমাজের জটিল সব অংক বুঝতে সহায়তা করেছে। যা 'ভাল' লিখনকে শেখায়নি। বুঝতেও দেয়নি। ভাল লিখনকে নিরাপদে রেখে শিক্ষা দিয়েছে। মন্দ সূক্ষ জটিল বিষয় শিখিয়েছে। ঝুঁকিতে ফেলে শিখিয়েছে। ভাল তার শৈশবের শিক্ষক। মন্দ তার পরিণত সময়ের শিক্ষক।

ভাল-মন্দ সব শিক্ষাই লিখন প্রকৃতি থেকে পায়। গভীরভাবে বলতে গেলে স্রষ্টা থেকে। তিনি মক্তব-মাদ্রাসা, স্কুল-কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান না। অথচ তিনি মক্তব-মাদ্রাসা-স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান। এ মহা বিশ্বব্রহ্মান্ডই এক মহা বিদ্যালয়। সৃষ্টিকর্তা নিজেই তার শিক্ষক। তিনি সরাসরি শিক্ষা দেন না। অথচ তিনি সরাসরি শিক্ষা দেন এক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

প্রকৃতির নানান লীলা খেলার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে তিনি শিক্ষা দেন। এখানে ছাত্রকেই দায়িত্বশীল হয়ে, আগ্রহ নিয়ে প্রকৃতির লীলা-খেলা গভীরভাবে পর্যবেক্ষন ও বিশ্লেষন করে শিখতে হয়। শিক্ষায় এখানে স্বাধীনতা আছে। কোন

জোর-জবরদস্তি নেই। শিখতে না চাইলে না শিখবে। যারা নিজ আগ্রহে শিখবে না, তারা প্রয়োজনে অন্যের দ্বারস্থ হবে। সৃষ্টিকর্তা সহযোগীতার ব্যবস্থা রেখেছেন। তেমন ক্ষেত্রে আমরা ভাবি মানুষ শিখিয়েছে। মানুষ যা করে স্রষ্টার শেখান জ্ঞানে বাধ্য হয়ে করে।

নিউটন তো লিখনকে সরাসরি কোন সূত্র শেখাননি। তবে লিখন নিউটনের সূত্র শিখলো কি করে? স্কুল-কলেজে লেখাপড়া করে। বই পড়ে। শিক্ষকের কাছে। তারা সূত্রটি পেল কিভাবে? স্কুল-কলেজে লেখাপড়া করে। বই পড়ে। শিক্ষকের কাছে। নিউটন ছাড়া আর কেউই নিউটনের সূত্র আবিস্কার করেনি। নিউটন ও লিখনের মাঝে বাকিগুলো সব মাধ্যম। তারা সূত্রটিকে লিখন পর্যন্ত পৌঁছাতে বাহকের ভূমিকা পালন করেছে। মাঝখানের মাধ্যমগুলি বাদ দিলে নিউটনই লিখনকে তাঁর সূত্রগুলি শিখিয়েছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, নিউটন তাঁর সূত্রগুলি পেল কিভাবে? উত্তর হচ্ছে, প্রকৃতির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়। প্রকৃতিতে ঘটনা আকারে তিনি যা দেখেছেন তাকে নিয়ে তিনি ভেবেছেন। বিচার-বিশ্লেষন করেছেন। একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। নিউটন শিখেছেন প্রকৃতি থেকে।

প্রকৃতি নিউটনের নিয়ন্ত্রনভূক্ত নয়। প্রকৃতিকে যিনি নিয়ন্ত্রন করেন মূলত তিনিই ভেতরের ও বাহিরের কারনগুলি সৃষ্টি করেন। সেই কারনের ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে মানুষ শিক্ষা লাভ করে। প্রকৃতি থেকে কেউ একজন প্রথম তথ্য সংগ্রহ করে, বিচার-বিশ্লেষন করে অতপর একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। প্রজন্মান্তরে সেটি পরিবাহিত হয়। যুগপযোগী উন্নয়ন ঘটে।

এমনিভাবে সর্বপ্রথম পৃথিবীর বুকে ‘আদম’ কিংবা ‘মনু’র সংগৃহীত শিক্ষাটিই মূল বা শুরু। আদমই প্রথম আকাশ-বাতাস-চন্দ্র-সূর্য দেখেছে-চিনেছে তথ্য সংগ্রহ করেছে। তিনি শিক্ষা পেলেন কোথায়? তিনি যেখান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছেন শিক্ষার মূল সেখানে। প্রকৃতিতে। আজও সে ধারাবাহিকতায় শিক্ষাকে আমরা টেনে নিয়ে চলেছি। যদিও এখন তাকে আমাদের চেয়ে কম শিক্ষিত মনে হতে পারে। তবে বিষয়টি এমন নয় যে তিনি কেবল ঐটুকুই শিখিয়েছেন, অর্থাৎ যতটুকু নিজ জীবনে দেখেছেন এবং পরবর্তীগুলো আমরা করেছি। তেমন ভাবনা সঠিক নয়।

এমনই স্রষ্টার শিক্ষাদান প্রক্রিয়া। তিনি এভাবেই মানুষকে শিক্ষা দেন; যেন মানবসন্তান নিজেকে ধীরে ধীরে প্রস্তুত করে নিয়ে তা ধারণ করতে পারে। নয়তো একদিনে শিক্ষা দিতে গেলে মস্তিস্কের সার্কিটগুলো জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যেত। সৃষ্টির আদিতে যা সৃষ্টি হয়েছে তাই এখন পর্যন্ত মানুষ শিখতে পারেনি। মানুষ নতুন কিছু শিখছে না। আজও পুরোনগুলিকেই জানতে চেষ্টা করছে।

লিখনও যাকে শেখায় বলে ভাবে, তাকে লিখন শেখায় না। লিখন কেবল বাহক। যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি নানান মাধ্যমে শিক্ষাটিকে ধারণ করিয়ে লিখন পর্যন্ত পরিবাহিত করছেন। এক একটি কনটেইনারে মানুষ এক একটি দ্রব্য বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করে। যে কনটেইনার মূল্যবান বস্তুটি ধারণ করে সে যদি গর্ব করতে পারত, তবে কনটেনারদের মধ্যেও স্ট্যাটাসের লড়াই শুরু হয়ে যেত। ভাগ্যিস তাদের প্রাণ নেই। মানুষও কনটেইনারের মত জ্ঞান পরিবহন করে চলেছে।



"বায়ু যেমন ফুলের গন্ধ বয়ে নিয়ে যায়, তেমনি এ জগতে জীবনসত্ত্বা এক দেহ থেকে অন্য দেহে তার জীবনের ধারণাগুলি বয়ে নিয়ে যায়।" (গীতা ১৫:৮)

সনদ কিংবা নোবেল নিয়ে গর্ব করার কিছু নেই। এগুলি জ্ঞান না। এগুলি কেবল কোন কনটেইনার কি মাত্রা ও গুণের জ্ঞান পরিবহন করে চলেছে, তা বোঝার জন্য মানব সৃষ্ট কিছু নির্দেশক বা ব্যবস্থাপনীয় প্রক্রিয়ার অংশ। একটি নিম্নমানের কনটেইনারেও ভূল বসত কিংবা মানবের স্বভাবসুলভ রাজনৈতিক কারনেও ভাল টোকেন লাগানো যেতে পারে। কনটেইনারগুলো যদি সত্যি সত্যি মানুষের মত মন্দ বা ভূল আচরণ করতো, তবে আমরা ইচেছ করলে তা পরিবর্তন করে ফেলতে পারতাম। তেমনি মানুষও যদি মন্দ বা ভূল আচরণ করে, তবে স্রষ্টাও কনটেইনার পরিবর্তন করে ফেলতে পারেন। জ্ঞান-অর্থ-সম্পদ নিয়ে কনটেইনারের গর্ব করার কিছু নেই।

"... যদি তিনি (আল্লাহ) ইচ্ছে করেন তবে তোমাদেরকে বিলুপ্ত করতে পারেন এবং নতুন সৃষ্টি নিয়ে আসতে পারেন।" (আল কোরআন ১৪:১৯)

শিক্ষক লিখনকে শিখিয়েছে স্রষ্টার কোন সৃষ্টিকে ঘৃণা না করতে। কিছু মানুষের সে মাত্রার জ্ঞান থাকে না বিধায় তারা ঘৃণা করে বা ঘৃণা করতে শেখায়। যে ঘৃণা

করছে, সে ঘৃণাকৃত বিষয়টির প্রয়োজনীয়তাটি বুঝতে না পারার কারনে তেমন আচরণ করছে। অথচ যেটা এ মুহুর্তে তার প্রয়োজন নয় সেটা অন্যের প্রয়োজন হতে পারে। আবার অন্য এক সময় বা পরিস্থিতিতে তার নিজেরও প্রয়োজন হতে পারে। অবশ্য যদি স্রষ্টা তাকে বিষয়টি উপলব্ধি করিয়ে দিতে চান। তাই কোন কিছুকে ঘৃণা করা বা ছোট ভাবা উচিৎ নয়।

মানুষ তবুও এক মুখে দুই কথা বলে। এক এক সময়ের এক এক উপলব্ধিবোধ থেকে বলে। এক এক সময়ের এক এক প্রয়োজনবোধ থেকে বলে। বস্তুত স্রষ্টা অপ্রয়োজনে কিছুই করেন না। তিনি যা করেন প্রয়োজনে করেন। এমন কি তাঁর সৃষ্টি মানুষও অপ্রয়োজনে কোন কাজ করে না। ভাল করুক - মন্দ করুক, বুঝে করুক - না বুঝে করুক প্রয়োজনে করে। মানুষই যেখানে সকল কাজ প্রয়োজনে করে, সেখানে তার স্রষ্টা কি অপ্রয়োজনে কিছু সৃষ্টি করতে পারে?

যা প্রয়োজনীয় তাকে ঘৃণা করা যায় না। ভাল ও মন্দ দু'টোরই স্রষ্টা একইজন। দুটোই প্রয়োজনীয়। বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয়। টিকে থাকার জন্য প্রয়োজনীয়। জীবনের সচলতার জন্য প্রয়োজনীয়। গতিময়তার জন্য প্রয়োজনীয়। জ্ঞানের প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয়। স্রষ্টাকে জানা ও বোঝার জন্য প্রয়োজনীয়। প্রয়োজনীয় কিছুকে ঘৃণা করা যায় না। গভীরভাবে - আরও গভীরভাবে বোঝার চেষ্টা করা প্রয়োজন।

ভাল ও মন্দ দু'জনই লিখনের শিক্ষক। সত্য ও মিথ্যে দু'জনই লিখনের শিক্ষক। মন্দ থেকেও লিখন ভালর শিক্ষা পায়। মন্দ সঠিক পথের দিশা দেয়। আলো-আঁধার দু'টোই শিক্ষা দেয়। নির্মল আকাশ, উত্তাল ঢেউ সবাই শিক্ষা দেয়। সৃষ্টি শিক্ষা দেয়। ধ্বংসও কিছু বলতে চায়। বোঝার জন্য ছাত্রকেই দায়িত্বশীল হতে হয়। শিক্ষকদের লিখন তাই অশ্রদ্ধা করে না। ঘৃণা করে না।

লিখন ঘৃণা করে কেবল শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানের ভূল প্রয়োগকে। না - না। লিখন সেটাও ঘৃনা করে না। মানুষতো ফেরেশতা নয় যে সে ভূল করবে না। ভূল তো সে করবেই। লিখন তাই ঘৃণা করে বার বার একই ভূলের পুনরাবৃত্তি করাকে।

কিন্তু না। লিখন সেটিকেও ঘৃণা করে না। কিছু কিছু ভূলের আনন্দ বার বার ভূল পথে টেনে নিয়ে যায়। দারুণ আকর্ষন করে। নিজেকে দমন করা যায় না। তাই লিখন ঘৃণা করে সমাজকে।

সমাজ যখন ভূলপথগামীকে সঠিক পথে চলতে উদ্বুদ্ধকরণের কোন ব্যবস্থা রাখে না, সমাজ যখন ভূলপথগামীকে ভূল থেকে নিবৃত করার কৌশলদিপ্ত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে না, সমাজ যখন একটিবারের জন্য হলেও মন্দ কাজকে দমন করতে প্রতিবাদটুকু পর্যন্ত করে না- নিরব থাকে, সুযোগের অপেক্ষায় থাকে, পরিণামে যা সকলের জন্য দুর্যোগ ডেকে আনতে পারে, যেখান থেকে সুযোগ সন্ধানিরও নিস্তার নেই- লিখন সে সমাজকে ঘৃণা করে।

রাব্বির হাম-হুমা কা-মা রাব্বায়ানি সাগীরা

(Rabbir Hum-Huma Ka-ya-ma)

“হে আমার প্রতিপালক! তাদের (মাতা-পিতার) উভয়ের প্রতি তেমনিভাবে দয়া কর, যেমনিভাবে তারা শৈশবে আমার লালন-পালন করেছেন।” (আর-কোরআন ১৭:২৪)

আজ লিখতে গিয়ে একটি বাংলা শব্দের বিকল্প শব্দ খুঁজে ফিরছি। মনে হল, একটি বাংলা থেকে বাংলা ডিকশনারী আবার কিনতে হবে। আরও কিছু বই হাতের কাছে প্রয়োজন। লেখার প্রয়োজনে বইগুলি সংগ্রহ করতে হবে। অথচ এর প্রতিটি বই বাবা তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরীর আলমারিতে সাঁজিয়ে রেখে বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। হারিয়ে ফেলেছি।

আজ মা-বাবার কথা মনে পড়ছে। বার বার মনে পড়ছে। জীবন চলার প্রতিটি পদক্ষেপে মনে পড়ছে। মনে হয় তাদের কাছে ক্ষমা চাই। নিজের ছেলে আজ বড় হয়েছে। বোঝাতে চাইলে বুঝতে চায় না। শোনাতে চাইলে শুনতে চায় না। রাগ করি না।

সৃষ্টিকর্তা বিভিন্ন নিদর্শন আমাদের মাঝে তুলে ধরেন। নিজেকে বোঝার মধ্য দিয়ে স্রষ্টার বিবিধ বিষয়াবলীকে কিঞ্চিৎ অনুভব করার চেষ্টা করে যাই।

স্রষ্টার একটি গুণ ‘আল-গাফফার’ (The Repeatedly Forgiving)। গুণটির কিয়দাংশ নিজের মাঝেও বিদ্যমান। এ গুণের বদৌলতে সন্তানের ভূল-ক্রুটি বার বার ক্ষমা করে দেই। নিজ থেকে ভেবে-চিন্তে ক্ষমা করতে হয় না। প্রকৃতপক্ষে আপনা থেকে ক্ষমা পেয়ে যায়। ভেতরে যিনি আছেন, মৃদু হেসে তিনি সব ক্ষমা করে দেন। নিজেকে কষ্ট করে কিছুই করতে হয় না।

প্রেম-প্রীতি-ভালবাসার সকল শাখা-প্রশাখা অন্তর যেন সব গুটিয়ে নিয়েছে। গুটানো সব ভালবাসা কেবল একটি চ্যানেল দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সন্তানের ওপর বর্ষিত হচ্ছে। যে ভালবাসাটুকু আজও সকলের প্রতি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে বলে মনে হয়, সেটি আসলে ভালবাসার প্রলেপ।

সন্তানের কার্যকলাপ দেখে অতীত মনে পড়ে যায়। এ যেন একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি! বাবা-মার সাথে তেমনি করেছি যেমন আজ নিজের ছেলে করে। যাই করি না কেন, জানতাম তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা-ভালবাসায় বিন্দু পরিমান কমতি নেই।

তথাপি আবদার। বয়সের প্রভাব। আজ সন্তান যা করে বুঝতে পারি। পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা-ভালবাসায় তার কোন কমতি নেই। যা করে মেনে নেই। মনে মনে হাসি আর মা-বাবাকে স্মরণ করি। সাথে সাথে অন্তর বলে ওঠে,

"রাব্বির হাম-হুমা কা-মা রাব্বায়ানি সাগীরা"

"হে আমার প্রতিপালক! তাদের (মাতা-পিতার) উভয়ের প্রতি তেমনিভাবে দয়া কর, যেমনিভাবে তারা শৈশবে আমার লালন-পালন করেছেন।" (আর-কোরআন ১৭:২৪)

নিজেকে কষ্ট করে কিছুই করতে হয় না। বলতেও হয় না। অন্তর বলে। আপনা থেকে বলে।

আজ একটি বাংলা শব্দের বিকল্প খুঁজতে গিয়ে কত কথা মনে পড়ছে। মা-বাবা কোন কষ্টটি না করেছেন। নিজেরা না খেয়ে খাইয়েছেন। নিজেরা না পড়ে পড়িয়েছেন। সন্তানের মুখের হাসি তাদের বুকে আনন্দের বন্যা বইয়ে দিয়েছে। সেদিন সেটি দেখেছি, শুনেছি, পড়েছি। বুঝিনি। উপলব্ধি করিনি। নিজের সন্তানকে দিয়ে আজ মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করি। এমনই বিধাতার শিক্ষাদান প্রক্রিয়া।

আজ তারা নেই। এ নতুন উপলব্ধির কথা তাদের জানাতে পারলাম না। ক্ষমা চাওয়া হল না। আজকের নিজেকে দিয়ে যদিও বুঝতে পারি সব ক্ষমা হয়ে গেছে। তাদের ভেতরে যার বসবাস তিনিই সব ক্ষমা করে দিয়েছেন। তিনি মহান, দয়ালু, ক্ষমাশীল।

সন্তানের প্রতি মাতা-পিতা, স্ত্রীর প্রতি স্বামী, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভালবাসার ক্ষেত্রে প্রতিটি মানুষের জন্য তিনি 'আল-গাফফার' (The Repeatedly Forgiving)। তবুও তাদের জীবন্ত চেহারায় সেই স্বীকৃতিটি দেখতে মন চায়। যা এখন আর সম্ভব নয়। তাদের দেবার মতো এখন কিছুই নেই। কেবলি প্রার্থনা।

"রাব্বির হাম-হুমা কা-মা রাব্বায়ানি সাগীরা"

পৃথিবীর তাবৎ পিতামাতার জন্য সন্তানদের পক্ষ থেকে এ এক শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা। এটি আরবী না, এটি বাংলা না, এটি ইংরেজী না। এটি সন্তানদের অন্তরের কথা। হৃদয়ের কথা। এটি প্রকাশ করার জন্য নির্দিষ্ট কোন ভাষা জানার প্রয়োজন নেই। এটি কোরআনের কথা হোক, এটি গীতার কথা হোক, এটি বাইবেলের কথা হোক- এটি সকলের অন্তরের কথা।

“যাদেরকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করা হয়েছে, তাদের অন্তরে এটি (কোরআনের বাণী) সুস্পষ্ট নিদর্শন।” (আর-কোরআন ২৯:৪৯)

যারা প্রার্থনার এত সুন্দর পথ শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন, তাদেরকে শ্রদ্ধা জানাতে ভেতরে কার্পন্য থাকা সঠিক নয়।

প্রার্থনা তথা যোগাযোগের জন্য নির্দিষ্ট ভাষা জানার প্রয়োজন নেই। নেই নির্দিষ্ট ভাষা চাপিয়ে দেয়ার প্রয়োজন। ভাষার জন্য এখানে প্রাণ দেয়ার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নেই শব্দ করার। পৃথিবীর তাবৎ ধর্মগ্রন্থ যদি পুড়ে ছাইও হয়ে যায়, তবু তা রয়ে যাবে সহজ-সরল সোজা পথে চলা বিশ্বাসী ও উপলব্ধিবোধ সম্পন্ন মানবের হৃদয়ের আচঁরে।

অন্তর কথা বলে। অন্তর যোগাযোগ স্থাপন করে। স্রষ্টার দেখিয়ে দেয়া পথ চলার নির্দেশনা বইয়ের পাতায় নয়, অন্তর ধারণ করে।

ঘাত-প্রতিঘাতের পৃথিবীতে, নিষ্পাপ যে শিশুটি একদিন- মাতাপিতা হয়ে, নিজের শারিরীক-মানসিক ও সামাজিক সক্ষমতার সাথে চলতে পথে- যতটুকু পূণ্য আর যতটুকু পাপ অর্জন করেছে, ‘হে আল্লাহ! তাদের সে পাপটুকু ক্ষমা করে দাও’। (লেখা ২০১৩)

লগ

(Log)

চকচকে একটি লাল হোন্ডা মটর সাইকেল কিনে আনা হয়েছে। সেভেনটি সিসি। ভেতরে আজ এক অন্যরকম অনুভূতি লিখনের। মটর সাইকেল ছুঁয়ে দেখতে ভাল লাগে। পরিস্কার করার নামে এর আশেপাশে দিয়ে হাঁটাহাঁটি করতেও ভাল লাগে। লেখা-পড়ায় মন বসে না। মনে মনে হোন্ডা চালাবার স্বপ্ন দেখে। যেভাবেই হোক এবার মটর সাইকেল চালানোটা শিখতেই হবে। বাল্য বয়সের কথা।

মটর সাইকেল চালানো শেখার পূর্বে শিখতে হল ‘লগ’ নামটি। মটর সাইকেলের মালিক ডাক দিয়ে লগ বইটি আনতে বললেই- লিখন দৌড়ে গিয়ে ছোট্ট একটি বাংলা খাতা নিয়ে আসে। মটর সাইকেল সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে কাজ করার এক অদম্য আগ্রহ।

লগ কি? হয়তোবা সে বয়সে প্রথম জেনেছে লিখন, কিন্তু অপ্রয়োজনীয় কথা মন দিয়ে শোনা হত না। তাই মনে রাখতো না, কিংবা বোঝারও চেষ্টা করতো না।

এস এস সি পরীক্ষার আগে লিখন জানতে পারলো লগের অংক কষতে হবে। দ্বিতীয়বার লগের মুখোমুখী হল সে। পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট যেন হাতছাড়া হয়ে না যায়, তাই ভালভাবে না বুঝে হলেও লগের ক’টা অংক শিখে রাখতে হলো।

বহু বছর পরের কথা। লিখন বড় হয়েছে। চাকুরি করে এখন। বিদেশ থেকে প্রশিক্ষক এসেছেন। লগারিদম বিষয়ে প্রশিক্ষন দেবেন। লিখন ভাবছে, লগ শব্দটি যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না।

বারবার লগের মুখোমুখী হওয়ায় বিষয়টি জানার আগ্রহ সৃষ্টি হল। একটু ঘাটাঘাটি করে লিখন যা বুঝতে পারলো, সংক্ষেপে তা এমন-

একটি সংখ্যা পেতে অপর একটি সংখ্যাকে যতবার গুন করতে হয়, তা-ই হল লগ। যেমন বলা যেতে পারে যে, ৮ সংখ্যাটিকে পেতে ২ সংখ্যাটিকে কতবার গুন করতে হয়?

উত্তরটি হচেছ- ২ X ২ X ২= ৮, অর্থাৎ ৮ সংখ্যাটি পেতে ২ কে মোট ৩ বার গুন করতে হয়। অতএব বেইজ ২ হলে ৮ এর লগারিদম ‘৩’। বেইজ হল যে

সংখ্যাটি দিয়ে গুন করা হচেছ সেটি। এই লগ মটর সাইকেলের লগ এর সাথে মিলছে না।

চাকুরি জীবনে নিজে মটর সাইকেলের লগ বুক লিখতে গিয়ে আবার লগের মুখোমুখী হল লিখন। দুটো লগের সন্ধান পাওয়া গেল। লিখন বুঝতে পারলো দুটো লগ এক নয়। মটর সাইকেলের লগ বুক অনেকটা উড়োজাহাজের ব্ল্যাক বক্সের মত। উড়োজাহাজে যা কিছু ঘটছে প্রতি মুহুর্তের বিষয়গুলি ব্ল্যাক বক্সে রেকর্ড হয়ে থাকছে। তাইতো কোন উড়োজাহাজ দুর্ঘটনা কবলিত হলে প্রথমেই তার ব্ল্যাক বক্সের সন্ধান করা হয়। অর্থাৎ সেখানে কি ঘটেছিল তা জানার জন্য। আর মটর সাইকেলের লগ বুকে ম্যানুয়ালী চলাচলের সমস্ত রেকর্ড লিপিবদ্ধ করে রাখা হচ্ছে।

কম্পিউটারে কাজ করতে গিয়ে লিখন আবার লগের মুখোমুখী হল। স্বয়ংক্রিয় লগ। ফেইস বুক কিংবা ইন্টারনেট ব্রাউজারে যা যা করা হচেছ তার সব কিছুই আপনা থেকে রেকর্ড হয়ে থাকছে। অনেকের অজান্তেই বিষয়টি ঘটছে। মাউসের একটি ‘ক্লিক’ মানেই তা ‘রেকর্ডভূক্ত কর্ম’। যে না জেনে গোপনীয় কিছু করছে বলে ভাবছে- বিষয়টি সে না জানতে পারে, কিন্তু যে জানে তার কাছে সব উন্মুক্ত। নিজেকে কিছুই করতে হয়না। আপনা থেকেই প্রতিটি কর্ম রেকর্ড হয়ে যায়। রেকর্ড সংরক্ষিত নথি বা বইটিই ‘লগ বুক’।

তুচছ এক প্রাণী মানুষ। সেই মানুষ বানিয়েছে তুচছ এক যন্ত্র। নাম তার কম্পিউটার। সকল কাজেই এর ব্যবহার। যন্ত্রটি ছাড়া মানুষের জীবনের সচলতা ও স্বাচছন্দতা আজ কল্পনাও করা যায় না। যাই তাকে করতে বলা হয় সে তাই করে দেয়। আর যাই সে করে- নিজ থেকে সে তার কৃতকর্ম রেকর্ড করে রাখে। সেভাবেই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

না জেনে-বুঝে অথবা বিশ্বাসের ঘাটতির কারনে, কিংবা বয়সের প্রভাবে ভাল-মন্দ কত কিছুই না করে চলেছে মানুষ। কোনদিন হয়তো তাকে আরও একটি লগের মুখোমুখী দাড়াতে হতে পারে।

“নিশ্চয়ই! আমি প্রতিটি বিষয়কে এমনিভাবে (সৃষ্টি) করেছি যে, তোমরা যা কর তা লিপিবদ্ধ/সংরক্ষিত হয়ে যায়।” (আল-কোরআন ৪৫:২৯)

“সবকিছুই (কর্ম বৃত্তান্ত) আমি নির্ধারিত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ/সংরক্ষণ করে রেখেছি।” (আল-কোরআন ৭৮:২৯)

"... নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে অণু পরিমান ওজনের কিংবা তার চেয়ে ছোট বা তার চেয়ে বড় একটি কণাও নেই, যা তোমার পালনকর্তা থেকে লুক্কায়িত থাকতে পারে। এ সবই নির্দিষ্ট গ্রন্থে সুনির্দিষ্টভাবে লিপিবদ্ধ আছে।" (আল-কোরআন ১০:৬১)

"তাদের (মানবের) অন্তর যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে, তোমার পালনকর্তা অবশ্যই তা জানেন। আকাশ ও পৃথিবীতে এমন কোন গোপন বিষয় নেই, সব সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ/সংরক্ষিত আছে।" (আল-কোরআন ২৭:৭৪-৭৫)

"(স্মরণ রেখ) দুইজন গ্রহীতা (ফেরেশতা) ডানে ও বামে বসে তার কর্মের হিসেব গ্রহণ/লিপিবদ্ধ করে। সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই গ্রহণ করার জন্য তার সঙ্গে তার পর্যবেক্ষক সদা প্রস্তুত।" (আল-কোরআন ৫০:১৭-১৮)

"তোমার ওপরে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত রয়েছে, সদয়; যারা কর্ম বৃত্তান্ত লিখে চলেছে, তোমরা যা কর তারা তার সবই জানে।" (আল-কোরআন ৮২:১০-১২)

".. পাপাচারীদের কর্মবৃত্তান্ত আছে 'সিজ্জিনে'- একটি লিখিত কর্মবৃত্তান্ত। সঠিক পথ অবলম্বনকারীদের কর্মবৃত্তান্ত আছে 'ইল্লিয়ীনে'- যারা প্রতিপালকের নৈকট্যপ্রাপ্ত তাদের দ্বারা তা সত্যায়িত।" (আল-কোরআন ৮৩:৭-২১)

"তারা যা কিছু করেছে সবই আমলনামায় লিপিবদ্ধ আছে এবং ছোট বড় প্রতিটি বিষয় লিপিবদ্ধ/নথিবদ্ধ। (অতঃপর) সঠিক পথ অবলম্বনকারীরা থাকবে উদ্যান ও নির্ঝরণীতে, সর্বাধিপতির অনুগ্রহে সু-প্রতিষ্ঠিতভাবে।" (আল-কোরআন ৫৪:৫২-৫৫)

আজ থেকে চৌদ্দ শত বছর পূর্বে লগের এ ধারণা বিশ্বাস করা মানুষের জন্য কঠিন ছিল। আল্লাহ বলেন,

"... তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনসমুহ দেখাবেন, যেন তোমরা তা জানতে পার ..." (আল-কোরআন ২৭:৯৩)

"আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করব, বিশ্ব-জগতে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না এটি তাদের কাছে সু-স্পষ্ট হয় যে, এটিই (কোরআন প্রদত্ত বার্তা) সত্য।" (আল-কোরআন ৪১:৫৩)

আল্লাহ মানুষকে সতর্ক করে দিয়ে বলছেন, "আমার কাছে রক্ষিত গ্রন্থ তোমাদের সম্পর্কে সত্য বিবৃত করবে।" (আল-কোরআন ৪৫:২৯)

আরও বলছেন, "সেদিন (বিচার দিবসে) প্রত্যেকেই নিজেকে মুখোমুখী পাবে যা কিছু সে ভাল কাজ করেছে এবং যা কিছু মন্দ করেছে; তখন প্রত্যেকেই কামনা করবে তার এবং তার কৃত মন্দ কর্মের ব্যবধানটি যদি অনেক দুরের হতো! আল্লাহ তাঁর নিজের সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করছেন। জেনে রেখ, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি পরিপূর্ণভাবে সদয়।" (আল-কোরআন ৩:৩০)

"সেদিন (বিচার দিবসে) কর্ম বৃত্তান্তের নথি উপস্থাপন করা হবে এবং তুমি দেখবে তাতে যা আছে সে কারনে অপরাধীরা সন্ত্রস্ত! তারা বলবে, এটি কেমন ধরণের নথি যা ছোট-বড় কোন কিছুকেই হিসেবের আওতার বাইরে রাখেনি, সবকিছুকেই বিবেচনায় নিয়েছে! তারা যা করেছে তার সবকিছুকেই তারা তাদের মুখোমুখী পাবে। তোমার পালনকর্তা কারও প্রতি অন্যায় করেন না।" (আল-কোরআন ১৮:৪৯)

বিচার দিবসে কেউ পুরস্কৃত হবে, কেউ পাবে শাস্তি। শাস্তির বিষয়ে আল্লাহ বলেন, "(জেনে রেখ) শাস্তিদানে আল্লাহ অত্যান্ত কঠোর!" (আল-কোরআন ৩:১১) তবে একইসাথে আল্লাহ বলেন, "তোমাদের শাস্তি প্রদান করে আল্লাহর কি আসে-যায়, যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর ও বিশ্বাস স্থাপন কর?" (আল-কোরআন ৪:১৪৭)

অকৃতজ্ঞতা একটি ভয়ঙ্কর অপরাধ। আর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে ভূল ও অন্যায় কাজ না করার জন্য। শাস্তি প্রদান করা আল্লাহর উদ্দেশ্য নয়। আল্লাহ বলেন, "এবং অবশ্যই আমি তাদেরকে (অকৃতজ্ঞ/ অবিশ্বাসী/ অসৎ কর্মপরায়নদের) গুরু শাস্তির পূর্বে লঘু শাস্তি আস্বাদন করাব, যেন তারা সুপথে প্রত্যাবর্তন করে।" (আল-কোরআন ৩২:২১) ভূল পথগামী মানুষকে সুপথে ফিরিয়ে আনাই শাস্তি প্রদানের লক্ষ্য।

আল্লাহ অবিবেচক বা অন্যায়কারী নন। যেমন বলা হয়েছে, "তোমার প্রতিপালক কোন জনপদ অযৌক্তিকভাবে ধ্বংস করেন না, যখন তার অধিবাসীরা অজ্ঞতা হেতু অন্যায় কাজ করে।" (আল-কোরআন ৬:১৩১)

আরও বলেন, "সত্যি বলতে তোমার পালনকর্তা অন্যায়ভাবে কোন জনবসতিকে ধ্বংস করেন না, যদি সেখানকার অধিবাসীরা সঠিক পথে চলে।" (আল-কোরআন ১১:১১৭)

আল্লাহ বলেন, "... কোন বার্তাবাহক প্রেরণ না করা পর্যন্ত আমি কখনই শাস্তি প্রদান করি না।" (আল-কোরআন ১৭:১৫) সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য সুনির্দিষ্টকরণ ও মানুষকে সতর্ক করার জন্য। অবহিতকরণ ব্যাতিত তিনি শাস্তি দেন না।

"নূহের পর আমি কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি! তাঁর বান্দাদের পাপাচার সম্পর্কে জানা ও দেখার জন্য আল্লাই যথেষ্ট।" (আল-কোরআন ১৭:১৭)

"আমি কোন জনপদ ধ্বংস করিনি কিন্তু তার জন্য তার সতর্ককারী ছিল স্মরণ করানোর জন্য; কেননা আমি কখনই নিপীড়ক নই।" (আল-কোরআন ২৬:২০৮-২০৯) (লেখা ২০১৩)

শালিক সূত্র ও মনস্তত্ত্ব
(Superstition and Psychology)



মা এসে জোর করে তুলে নিয়ে গেল। চুল থেকে তখনও পানি গড়িয়ে নামছে লিখনের। চোখের জল সে পানির সাথে একাকার হয়েছে। তোয়ালে পেঁচিয়ে বিছানার ওপর দাড় করিয়ে রেখেছে। কান্না তখনও থামেনি। আজকের খেলার মাঝপথে সমাপ্তি ঘটেছে।

বিছানার পাশে জানালার বাইরে বাউন্ডারি। বাউন্ডারির দেয়ালটিতে প্লাষ্টার লাগানো হয়নি। দেয়ালের ওপর একটি শালিক দাড়িয়ে আছে। পুরো ঘটনাটি সে পর্যবেক্ষন করছে। ফুল হাতা সার্টের হাতাটি গুটিয়ে দিতে দিতে মা বলছেন- ঐ যে দেখ, এক শালিক দাড়িয়ে আছে। সে জন্যই তোমার কপালে এত দুঃখ- এত কান্না।

কান্না বন্ধ করার জন্য এসব কথা বলছে। এতটুকু বুঝতে শিখেছে লিখন। পেছন ফিরে তাকালো। সত্যিই একটি শালিক পাখি এক পায়ে দাড়িয়ে আছে। সমস্ত ঘটনাটি সে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। পাখিটির দিকে তাকাতেই চোখ নাড়িয়ে, ঘাড় ঘুরিয়ে আরও ভাল করে সে দেখার চেষ্টা করছে।

শালিক পাখির অঙ্গ-ভঙ্গি দেখতে গিয়ে কান্নার শব্দ কিছুটা কমে এসেছে লিখনের। বুক ফুপিয়ে কাঁদছে। মনের মধ্যে জন্ম নেয়া প্রশ্নের উত্তর জানতে হবে। কাঁদতে কাঁদতেই জানতে চাইলো,

– এক শালিক দেখলে কি হয়?

মা বললেন,

– এক শালিক দেখলে ‘দুঃখ আসে’।

মায়ের মুখ-নিঃসৃত বাণী বলে কথা! মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পরার মত। মায়ের কথা শুনে হতাশ হলো লিখন। তবে কি জীবনে আর কোনদিন সুখ আসবে না? লিখনের ছোট্ট মাথা হতাশ হয়ে বিষয়টি নিয়ে ভাবতে শুরু করে দিল। এ থেকে পরিত্রানের তবে উপায় কি? কান্নার রেশ কিছুটা কমিয়ে জানতে চাইলো,

- তাহলে সুখ আসবে কিভাবে?

মা বললেন,

– দুই শালিক দেখলে।

বলে রান্না ঘরের দিকে চলে গেলেন মা।

শালিকের ফরমুলা চিন্তার জগতে কাজ করতে লাগলো। কিছুটা আশার আলোও দেখতে পেল লিখন। পরিত্রানের তাহলে উপায়ও একটা আছে। সুখ প্রপ্তির পথ চিরতরে জন্য বন্ধ হয়ে যায়নি!



বড় হয়ে কুসংস্কার, বিজ্ঞানমনস্কতা কত কত শব্দ ও বিজ্ঞানের অনেক সূত্রের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে লিখন। কিন্তু কোথাও এক শালিক আর দুই শালিকের সাথে সুখ আর দুঃখ প্রাপ্তির সম্পর্ক জনিত কোন সূত্র খুঁজে পায়নি। অথচ সূত্রটি সমাজে বেশ প্রচলিত আছে।

একটি শব্দ। শালিক। বাংলা শব্দ। ইংরেজীও হতে পারত। আরবী, ফারসী কিংবা সংস্কৃতও হতে পারত। ভাষা যাই হোক, সেটি মূখ্য নয়। বিষয়টি হচেছ শব্দটি দিয়ে মস্তিস্ক কি বুঝে নিচ্ছে।

শব্দটি উচচারিত হলে মস্তিষ্কে চিন্তার জটিল মহাসমুদ্রের অতল গহ্বর থেকে ভেসে ওঠে একটি ফাইল। যেখানে রয়েছে 'এক শালিক ও দুই শালিক' এর সেইভ করা ফর্মুলাটি। কি আশ্চর্য্য! একটি শব্দের কি অমোঘ শক্তি। উচ্চারিত হলে আরেকটি ঘটনা বা বিষয়ের বিস্তারিত উপস্থাপিত হয়ে সাময়িক স্মরণশক্তিতে এসে আশ্রয় নেয়। আশ্চর্য্য এক যোগসূত্র! উপস্থাপিত সে বিষয়টি যে অর্থ বহন করে, তা নির্দেশনা হয়েও কাজ করতে পারে। জীবনকে প্রভাবিত করতে পারে।

একটি শব্দ। কম্পিউটারে আঁকা আইকনিক বাটনগুলির মত। কপি বাটনে চাপ দিলে কপি হয়। সেইভ বাটনে চাপ দিলে সেইভ হয়। আমরা কেবল বাটন চাপি। বস্তুত ভেতরে অনেক ক্রিয়া আছে। দেখতে পাই না।

শালিক শব্দটি মস্তিস্কের ভেতর কোন এক আইকনের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। সে চাপ পরবর্তি ঘটনাগুলি ঘটায়। একটি অর্থবোধক শব্দের তাই অনেক শক্তি। নির্দেশনা হয়ে কাজ করে। মানবকে চালনা করার ক্ষমতা রাখে।

কত কু-সংস্কারের সংস্কার হল, শিক্ষার আলোয় কত ভূল সূত্র আবিস্কৃত হল, কিন্তু শালিকের সূত্রটি পরিপূর্ণরূপে অন্তর থেকে ডিলিট হল না লিখনের। শিখিয়ে দেয়া সূত্রের আঁচরটি ভেতরের অজানা কোথাও একটি ফাইল হয়ে লুকিয়ে রয়ে গেল। লিখন জানেনা সেটি ভাইরাস কি না।

শালিকের ফর্মূলাটি লিখন যেদিন প্রথম জেনেছে, সেদিন থেকে একটি শালিক দেখা মাত্র তার জোড়া দ্বিতীয় শালিকটিকে অস্থির চিত্তে সে খুঁজে বেড়িয়েছে। সুখ না এলেও অন্তত দঃখটা যেন দীর্ঘায়িত না হয় সে আশায়।

একটি শব্দ, একটি বাক্য বা একটি সূত্র মানুষকে চিরিদিন একটি গন্ডি বা সীমানার মধ্যে আবর্তিত করে ধরে রাখতে পারে। একটি কথা মানুষকে দিয়ে সারাজীবন একটি কাজ করিয়ে নিতে পারে। মায়ের একটি কথায় সারা জীবন এক শালিক দেখলেই দ্বিতীয় শালিকটিকে এদিক ওদিক খুঁজে ফিরেছে লিখন। আজও খুঁজে।

সন্তানের ওপর মায়ের মুখ নিসৃত বাণীর প্রভাব। এর সাথে স্নেহ ও ভালবাসার সম্পর্ক ও স্মৃতি জড়িয়ে আছে। সেখান থেকে বিশ্বাসের জন্ম। তেমনি ভালবাসার অনেক গ্রন্থ আছে তাতে যা বলা হয়েছে আজও মানুষ তার আবর্তে আটকে আছে। এ গন্ডি ভেদ করা সহজ নয়। সবার পক্ষে সম্ভবও হয়না। এসব বাণী, শব্দ, সূত্র নির্দেশনা হয়ে মানবের ওপর কাজ করে। মানবকে চালনা করে।

শিশু থেকে কিশোর, কিশোর থেকে যুবক। যুবক থেকে প্রৌঢ়, প্রৌঢ় থেকে বার্ধক্য। মাঝে দীর্ঘ পথ। আবার পথের শেষ প্রান্তে দাড়িয়ে পেছন ফিরে তাকালে পথটা খুব দীর্ঘও মনে হয় না। পথ যত দীর্ঘই হোক কিংবা নাতিদীর্ঘই হোক, রেখাপাতকারি একটি কথার রেশ স্বল্প সময়ের এ চলতি পথে ফুরিয়ে যায় না। আজও এক শালিক দেখে ফেললে দ্বিতীয় শালিকটিকে খুঁজে ফিরে লিখন। কেন এমন হয়? সমস্যাটি কোথায়?

বস্তুত কোথাও কোন সমস্যা নেই। সমস্যাটি মস্তিস্কে। সেখান থেকে মনে। মনের সমস্যাটি কর্মে প্রভাব ফেলে। কর্মটি তখন তৃপ্তিমত হয় না।

পূর্ব ধারনার কারনে এক শালিকের ফর্মূলাটি বিশ্বাসীর চিত্তকে দুর্বল করে দিতে পারে। বিষয়টি ওপরে খুব ক্ষুদ্র মনে হলেও অন্তরের গভীরে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে। কখনও কখনও সেটি বুঝেও বোঝা যায় না। দুর্বল চিত্ত কর্ম সম্পাদনকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে। ফলে কর্মের সফলতা বিনষ্ট হতে পারে। কার্যকারণ প্রক্রিয়ায় নেমে

আসতে পারে দুঃখ। এক শালিকে তখন দুঃখ নেমে আসে। কথাটি সঠিক প্রমানিত হয় নিজের ভেতরে।

যদি বলা হত এক শালিকে সুখ দুই শালিকে দুঃখ। বিশ্বাস করলে দুই শালিকেই দুঃখটা নেমে আসতো। সেক্ষেত্রে দুই শালিকের ভাবনাটিই চিত্তকে দুর্বল করে দিত। শালিকের এক অথবা দুই এটি মোটেও গুরত্বপূর্ণ বিষয় নয়। বিষয়টি হচেছ কি বিশ্বাস করছি। এ বিশ্বাসই চালিকা শক্তি। এ বিশ্বাসই শক্তি জোগায়, সফলতার পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। আবার এ বিশ্বাসই ভেতরের শক্তিকে নাশ করে, সবকিছু ব্যার্থতায় পর্যবসিত করে দেয়।

শাহ্জাহান, একটি অংক এবং কিছু অপ্রাসংঙ্গীক প্রসংগ
(Shahjahan and A Math)

দিল্লি নেমে ঢাকার সাথে প্রথম যে পার্থক্যটি নজরে এল সেটি হল 'রিকসা নেই'। পুরোনো দিল্লিতে কিছু আছে। রাস্তাগুলি দেখতে বেশ প্রশস্ত। মাঠ-ঘাট, বাড়ির আঙ্গিনা সব দেয়াল দিয়ে উচু করে ঢাকা। তাই বুঝি নাম হয়েছে 'ঢাকা'। অথচ রাস্তার পাশে এখানে ইটের দেয়াল কম। সব প্রশস্ত মনে হয়। প্রত্নতাত্বিক স্থানগুলি ঘুরতে গিয়ে মনে হয়েছে, সম্রাট শাহজাহানের কীর্তিগুলি অনায়াসে নিজ থেকে চিনে নেয়া যায়। ঐগুলির সৌন্দর্য্য স্বতন্ত্র।

একথা বলতেই হবে যে, তাজমহল দেখতে ভারি সুন্দর লেগেছে। এর বিপরীত বলা ঠিক হবে না। কেননা তাতে লোকে নির্বোধ ভাববে। প্রচার ও প্রসারের কারনে অনেক ব্যক্তিগত সত্য প্রকাশ এভাবেই আধিক্যের চাপে চাপা পড়ে যায়। তাজমলের চেয়ে রেডফোর্ট এর সুউচ্চ প্রাচীর এবং তার ফটক বেশী ভাল লেগেছে। তারও চেয়ে বেশী পছন্দ হয়েছে ফতেহপুর সিকরী। ব্যাখ্যায় যাব না। তাহলে ভূল প্রমানিত হবার সম্ভাবনাও আছে। প্রথম দেখায় যেমনটি লেগেছে কেবল সেটি বলছি।

সত্যকে জানার, বোঝার কিংবা অনুধাবনের পূর্বশর্ত হল নিজেকে নিরপেক্ষ রাখতে পারা। কিন্তু মজার ব্যপার হল তাজমহল দেখতে গিয়ে নিজেকে আর নিরপেক্ষ রাখা সম্ভব হল না। একটি দলের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গিয়েছি।

বিশ্বখ্যাত একজন তাজমহল দেখার কাজটি নিজে সম্পন্ন করে ঘোষনা করলেন, পৃথিবীর মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত। একদল যারা তাজমহল দেখেছে, আর অন্যদল যারা তাজমহল দেখে নাই। বাহ্! অজান্তে অনিচ্ছায় একটি দলের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেলাম!

এটিই বুঝি রাজনৈতিক দক্ষতা। মুখের এক কথায় একজনকে দলভূক্ত করে নেয়া, আবার মুখের আরেক কথায় বহিস্কার। যাকে দলভূক্ত করা হল কিংবা দল থেকে বহিস্কার করা হল, হয়তো সে নিজেও সে বিষয়ে সচেতন নয়। অথচ অজান্তে হলেও একটি দলের অন্তর্ভূক্ত হতে হচ্ছে। সূক্ষ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কলাকৌশলপূর্ণ মুখ-নিঃসৃত ধ্বনি-ই বুঝি 'রাজনীতি'।

লেখার শিরোনাম 'শাহজাহান এবং একটি অংক'। তাই রাজনীতির আলোচনায় না গিয়ে বিষয়ে ফিরে আসতে চাই। তাজমহলের সুউচ্চ চূড়া দেখতে এসে মনের মাঝে কিছু ভাবনা খেলা করে গেল।

- সত্যিই কি সম্রাট শাহজাহান চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন?
- কিভাবে?
- আজকের এই আমি কি তাকে চিনি?
- না, চিনি না তো! আমার সাথে তো তার পরিচয় নেই।
- তাহলে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকলেন কিভাবে? তাকে তো এ সময়ের আমরা কেউ-ই চিনি না, জানিনা!

আমরা চিনি ইতিহাস বইয়ের পাতায় দেখা একটি ছবিকে; যার নিচে লেখা আছে একটি নাম 'শা - হ্ - জা - হা - ন'। মনের পর্দায় আজকাল সেটিও আর ভীড় করে না। এখন দেখি সিনেমায় দেখা ঝাকড়া চুলওয়ালা এক শাহজাহানকে। এত শ্রম ও অর্থ ব্যায় করে নিজেকে স্মরণীয়-বরণীয় করে রাখার চেষ্টায় তবে স্বার্থকতা কোথায়? যদু-মধু রাম-সাম যে কোন একজনকে দিয়ে কোন একটি কাজ করিয়ে নিয়ে একটি চমৎকার মুখশ্রীর ছবি, ছাঁচ বা একটি খোলস বানিয়ে ঝুলিয়ে দিলেই তো হল। এতে নিজেকে মহান ও স্মরণীয় করে রাখার চেষ্টায় অনেক অপ্রয়োজনীয় জীবন-সংগ্রাম কমে যেত। এক সময় সে ছবি বা প্রতিকৃতিটিই দেবতায় পরিণত হয়ে যেত রক্তপাতহীনভাবেই।



শাহজাহান নামের মানুষের যে ছাঁচটিকে আমরা চিনি সেটি এখন কোথায়? এতদিনে পঁচে-গলে মাটিতে মিশে গেছে। মাটিতে মিশে গেল কেন? কারন তাকে মাটিতে শুইয়ে রাখা হয়েছিল। তাকে মাটিতে শুইয়ে রাখা হল কেন? কারন তিনি এখন আর নেই। অথচ তাকে তো ঘোড়া নিয়ে ছুটতে দেখা গেছে! হঠাৎ তবে কি হয়ে গেল?

এই তো তাঁর নিথর দেহ পড়ে আছে এখানে। তাহলে তিনি নেই বলা হচ্ছে কেন? এ দেহ কি শাহজাহান নয়? এ দেহই তো শাহজাহান। এ চেহারাকেই তো শাহজাহান বলে জানি।

বুঝেছি। তাহলে শাহজাহান নেই! এ দেহ শাহজাহান নয়। এ দেহ কেবলি শাহজাহান নামের বিপরীতে একটি খোলস! যেটিকে চিনতে শাহজাহান নাম দেয়া হয়েছিল। যার মধ্যে এখন শাহজাহান নেই। এ দেহ বা খোলসটি প্রকৃত শাহজাহান নয়। শাহজাহান চলে গেছে। পড়ে আছে কেবলি তাঁর নিথর দেহ।

এ দেহ- এ ছাঁচ, এ খোলসটি তো শাহজাহান নয়। তবে এ দেহ, এ ছাঁচ, এ খোলসটিকে কেন এতদিন শাহজাহান বলা হত? ছাঁচের ভেতরে বসবাসকারী প্রকৃত যে শাহজাহান, যে এই খোলসটিকে সচল করে রেখেছিল, সে এখন আর নেই। তাহলে প্রকৃত শাহজাহানকে কেউই আমরা চিনিনা। তাকে না দেখা যায়, না ধরা যায়, না ছোঁয়া যায়।

কে সে জন? শাহজাহান নামক খোলসটিকে যে সচল করে রেখেছিল? সত্যিকারের তার চেহারা কি? তার আকার-আকৃতি-প্রকৃতি কি? কি তার রূপ? শা - হ - জা - হা - ন, নামটি উচ্চারিত হলে মনের চোখে যে ছবিটি ভেসে ওঠে, সেটি তাহলে অচেনা শাহজাহানের খোলস বা অস্থায়ী রূপ। বাইরের আবরণটি পাল্টিয়ে দিলেই শাহজাহান অন্য রূপ ধারণ করতে সক্ষম।

এই নাম, এই চেহারা, এই উচ্চতা, গায়ের রং, মুখের ভাষা, ব্যাক্তিগত স্মরণ, ব্যাক্তিক চরিত্র সবই তবে এমন কিছু কোড- যা ঐ সময়ের ঐ চরিত্রটি ও তার কাজকে বুঝতে সহায়তা করেছে।

প্রকৃত শাহজাহান- যে ঐ দেহটিকে সচল করে রেখেছিল, তাকে আমরা কেউই চিনি না, জানি না। সে আমাদের চেনা-জানা ধরা ছোঁয়ার বাইরে। চিনি কেবল তার খোলসটি এবং তার সূক্ষাতিসূক্ষ নানাবিধ গুণগুলিকে, যা তার অবস্থানকালীন সময়ে ফুটে উঠেছিল।

তবে কি সে এক-ই জন? যে আমার ভেতরে এই মুহূর্তে বিরাজমান? কেবল নানাবিধ কোডগুলি ভিন্ন!

তাই তো নিজেকেও নিজে চিনি না। আয়নায় কেবল চেহারাটি দেখি। গুণাগুণগুলিকে বুঝতে চেষ্টা করি। অথচ নিজেকে জানি না।

যতটুকু উপলব্ধ হয় তাকে দেখা যায় না, শোনা যায় না, তার গন্ধ নেয়া যায় না, তার স্বাদ নেয়া যায় না, তাকে স্পর্শ করা যায় না। তার কোন আকার নেই। নিরাকার। এই নিরাকার আবির্ভূত হয় যে কোন ছাঁচের আকার ধারণ করে। ভেতরে লুকিয়ে থাকে।

তবে কি সে এক-ই জন যে সবার ভেতরে বিরাজমান? কখনও শাহজাহানের আকৃতি প্রকৃতি ও রূপে, কখনও নিজের রূপে, কখনও আকবর কিংবা হিটলারের রূপে ইত্যাদি। যদি তা সত্যি হয় তবে কি এ অংকটি ভূল হবে?

শাহজাহান = নিরাকার, হিটলার = নিরাকার

অতএব, শাহজাহান = হিটলার

এমনিভাবে, দর্শনদাতা = দর্শনার্থী, বক্তা = শ্রোতা, পুলিশ = চোর

একই সূত্রের প্রয়োগে, আমি = তুমি = সে।

বিভিন্ন আকারে বা ছাঁচের অভ্যন্তরে আবির্ভূত যিনি, তিনি ‘এক’। তাঁর নির্দিষ্ট কোন আকার নেই। তিনি ‘নিরাকার’। কিন্তু তিনি সর্ব আকারে অবস্থান গ্রহণে সক্ষম। তিনি রূপে বিরাজমান। তিনি অরূপেও বিরাজমান। অরূপ তার আরেকটি রূপ। তাঁকে বোঝাতে যে নামেরই ব্যবহার করা হোক না কেন, তিনি এক-ই জন।

সবার মধ্য দিয়ে সর্বসময়ে সর্বত্র সর্বরূপে তিনি বর্তমান। তাই তিনি সর্ব সময়ে সর্ব বিষয়ে অবহিত। তাই তিনি সর্বদ্রষ্টা, সর্বজান্তা। সর্ব রূপের সম্মিলিত শক্তিতে তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি কোন এককের মুখাপেক্ষি নন। তিনি নিজেই সব। সব মিলিয়েই তিনি।

পৃথিবীর তাবৎ মানুষ বা প্রাণীকে যদি কপি পেষ্ট করার মত নিখুঁতভাবে একই রূপ-গুন-বৈশিষ্ট প্রদান করা হত, তবে নির্দিষ্ট কোন একক বা অংশকে চিহ্নিত করা সম্ভব হত না। চিহ্নিতকরণের প্রয়োজনেই শ্রেণীভূক্ত প্রাণীদের পার্থক্যপূর্ণ পৃথকীকরণ। তাঁর একেকটি গুণ- একেকটি রূপে, একেকটি কাজ সম্পন্ন করে।

“হে মানব! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি পুরুষ ও নারী থেকে এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যেন তোমরা একে অপরকে চিনতে পার। ...।” (আর-কোরআন ৪৯:১৩)

পরের অংশ-

কে সে জন? যে সকলের মধ্যে বিদ্যমান? জন যে-ই হোক, তিনি 'একই জন'। যিনিই সৃষ্টির স্রষ্টা তিনিই সৃষ্টির ধ্বংসকারী। একের কৃতিত্ব তাই সকলের কৃতিত্ব। একের কলংকও সকলের কলংক। কৃতিত্ব কলংক কোনটিরই দাবীদার ধারণকৃত নির্দিষ্ট চেহারার কেউই আমরা নই। সব কর্মের কৃতিত্বের দাবীদার তিনি 'একই জন'। জগতের খেলা তাই কেবলি একটি ক্ষুদ্র অংশ হয়ে নিজেকে নিজের আবিস্কার। নিজেই নিজেকে জানা। নিজেই নিজেকে চেনা। এখানে এ চেনা-জানা কেবল কোন একক ব্যাক্তি বিশেষের নয়, অথচ সেটিও অপরিহার্য্য।

যে তাজমহল বানিয়েছে সে আমি। যে বাবরি মসজিদ ধ্বংস করেছে সেও আমি। প্রয়োজনে সৃষ্টি করি, প্রয়োজনে ধ্বংস করি। সৃষ্টি যখন সীমাকে লংঘন করে তখন ধ্বংস করি। সৃষ্টি-ধ্বংস সব মংঙ্গলার্থে করি। সীমা লংঘিত না হলে ধ্বংসের প্রয়োজন নেই। নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ।

আমার মধ্যে ভালবাসা আমার মধ্যে ঘৃণা। আমি সৃষ্টিকারী আবার আমিই ধ্বংসকারী। আমিই সকল গুণের আধার। আমার মধ্যে বিরাজ করে সর্ব প্রকার গুণ। যেটিকে জাগিয়ে তুলতে চাই, সেটিই জাগ্রত হয়। জাগ্রত গুণটি কর্ম সাধন করে। বিপরীতমুখী গুণের আধার আমি। ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, আলো-আঁধার, সত্য-মিথ্যা, ফেরেশতা-শয়তান সবি আমার মাঝে। শ্রেণী বিভাজিত গুণের ভালগুলি আল্লাহর, মন্দগুলি শয়তানের নামে পরিচিত ও পরিচালিত।

বস্তুত মন্দ কোন গুণ নেই। গুণের ভূল প্রয়োগে মন্দের সৃষ্টি। আবার জ্ঞানের সীমাবদ্ধতায় গুণের মন্দ প্রয়োগ। জ্ঞানের সীমাবদ্ধতায় মন্দ প্রয়োগে পাপ নেই। পাপ মন্দের পুনরাবৃত্তিতে। কেননা তখন জ্ঞান অর্জিত হয়ে যায়।

অতি খাদ্য ভোগকারী যে, সে আমি। না খেতে পারা জীর্ণ-শীর্ণ ব্যক্তিটিও আমি। আমি আমারই বিবিধ অংশের আচরণ প্রত্যক্ষকারী। ক্ষতিকারক অংশের সংশোধনকারী, নচেৎ উৎপাটনকারী। এভাবে সৃষ্টি সম্প্রসারন করি এবং ধরে রাখি।

সত্য জ্ঞানের অভাবে আমারই যে অংশ আজ অপরকে ভুভূক্ষ রাখতে কুণ্ঠা বোধ করে না, তাকে চিহ্নিত করি। নিজেকে চিনি। ব্যাবস্থা গ্রহণকারী আমি। দায়িত্বপ্রাপ্ত যে অপরকে বঞ্চিত করে চলেছে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে, জগতের মোহে আবিষ্ট সে আজ আমাকেই ভূলে যেতে বসেছে। অথচ আমি-ই সাঁজিয়ে রেখেছি

যত আকৃষ্টকারী উপাদান। তীক্ষ্ম বুদ্ধিমান নিজেকেই বঞ্চিত ও ভুভূক্ষ রাখার পথ তৈরী করে চলেছে। সীমিত জ্ঞানে বুঝতে পারে না।

সাময়িক তৃপ্তির লোভে নিজেকে নিজে নিরাপত্তহীনতার পথে টেনে নিয়ে যায়। নিজের কর্ম নিজেকেই আক্রমন করে। সুখ স্থায়িত্ব পায় না। দুঃখ দীর্ঘায়িত হয়। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে। প্রজন্মের বঞ্চনা- নিজেরি বঞ্চনা। ভূল আচরণ নিজের অগ্রগতিকে অজ্ঞাতে বাঁধাগ্রস্ত, নয়ত প্রলম্বিত করে। অথচ মোহাবিষ্ট অবস্থায় বুঝতে অক্ষম হয়। সব সম্পন্ন হয় সাজানো প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে।

সূক্ষ চালের অন্যায় বন্টন যখন ভুভূক্ষ রাখে, আমাকে ভারসাম্যহীন করে। যার কু-ফল অন্যায় বন্টনকারী এড়াতে পারে না। এরূপ আচরণ দ্বারা যে সুখের পিছু ছুটে বেড়ায়, সুখ ধরা দেয় না। সাময়িক অতি প্রাপ্তিতে এরা পথচ্যূত- দিশেহারা। নিরব দর্শক আমি। সাক্ষী আমি। নিজেকে নিজে পর্যবেক্ষনকারী আমি। সময়ে উপযুক্ত ব্যাবস্থা গ্রহণকারী।

সমুদ্রের ঢেউয়ের উচ্চ শিখরে আজ যে পানি অবস্থান গ্রহণকারী, সে নীচের পানি শোষনকারী। অহংকারের কিছু নেই। প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে কাল তাকে শোষিতের অংশ ফিরিয়ে দিয়ে নিজেকে নীচে নামিয়ে আনতে হবে। আরেকটি দলকে ওপরে ঠেলতেই হবে। আজ যে ওপরে তার থেকে চেয়ে নেয়ায় লজ্জার কিছু নেই। কেননা তার স্তুপিকৃত সম্পদের মাঝে লুকিয়ে আছে আমার অংশ। ব্যবস্থাপনার গলদের কারনে সম্পদ কোথাও স্তুপিকৃত হয়। ব্যবস্থাপনার গলদের মাঝে অন্যায়কারীর হাত। শোষিত বা বঞ্চিতের কোন ত্রুটি নেই। ওপরের ঢেউ যখন নীচে নেমে আসবে, কাল তাকেও চেয়ে নিতে হবে। যদি ব্যবস্থাপনার ত্রুটি বজায় থাকে। শোষিতের প্রাপ্য সঠিকভাবে বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হলে সমুদ্র কিংবা নদীর ঢেউ শান্ত হয়ে আসবে।

মানবীয় হিসেবে সবই বৃহৎ ও দীর্ঘ প্রক্রিয়ার অংশ। প্রক্রিয়ার অতি ক্ষুদ্র অংশ মানুষ প্রত্যক্ষ্য করে। মানুষ বুঝতে পারে না। বুঝতে না পেরে অতি প্রাপ্তিতে তাই একদল দম্ভ করে এবং একদল লজ্জাবোধ করে চেয়ে নিতে। মাঝখানে একটি দল দুয়ের আচরণের সুফল ভোগ করে।

আজ যে নিয়ম বহির্ভূত ভোগকারী, একদিন সে ভুভূক্ষ হবে। আজ যে ভুভূক্ষ, সে হবে ভোগকারী। ব্যবধান সময়ের। প্রজন্মের বঞ্চনা নিজেরি বঞ্চনা।

আমার সকল অংশের মৌলিক চাহিদাগুলি সমান। অথচ বন্টন অসমান। স্বেচ্ছায় নিজ আগ্রহে যারা সমাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, ন্যায় সম্মত বন্টন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা তাদের দ্বারাই সম্ভব। নয়ত সে দায়িত্ব আঁকড়ে ধরে রেখে অযাচিত সুবিধা ভোগ করার ফলাফলও তাদের।

পাঠক, যতগুলি 'আমার' বা 'আমি' এখানে লিখিত হয়েছে, একটি 'আমার' বা 'আমি'ও এ আমি নই। কে এই 'আমার' বা 'আমি' তা আমার জানা নেই। যে আমি এ লেখা লিখেছি বলে মনে করি, সে আমিও কোন আমি- তা আমি জানি না। (লেখা ২০১৬)

সনদ

(Certificate)

কলিমুল্লাহ রান্না জানে। বহুকাল রান্না করেছে। এখন তাকে আর রান্না করতে দেয়া হচ্ছে না। কারন, রান্না বিষয়ে তার কোন সনদ নেই। ভাগ্যিস! আমাদের নানু কিংবা দাদু আজ আর বেঁচে নেই! রান্না করতে হলে এখন প্রাতিষ্ঠানিক সনদ লাগবে। নচেৎ কাজ করতে দেয়া হবে না।

যিনি স্বাক্ষর প্রদান করে সনদ দেন, তিনি নিজেও কলিমুল্লাহর রান্না খেয়ে বড় হয়েছেন। ড্রাইভিং লাইসেন্সে যারা স্বাক্ষর করেন তাদের অনেকে নিজেই ড্রাইভ করতে জানে না।

কম্পিউটারে ওয়ার্ড পারফেক্টে কাজ করতেও এক সময় সনদ প্রয়োজন হত। নয়তো কম্পিউটারের কক্ষে প্রবেশ করতে দেয়া হতো না। কাজ জানুক কিংবা না জানুক সনদ হচেছ যোগ্যতা প্রমাণের ও সন্মান প্রাপ্তির মাপকাঠি। অথচ কাজ যে জানে সে সনদ ছাড়াও জানে। যেমন আমাদের কৃষক। তাদের ফলানো ফসল খেয়েই আমরা বেঁচে থাকি। ওখানেও সনদ প্রদানের প্রচলন শুরু হলে অনেক তুখোর কৃষক অর্থের অভাবে কিংবা দলীয় পরিচয়ের অভাবে কাজ হারাতে পারে।

কাজ যে জানে না সে সনদ নিয়েও জানে না। অথচ বড় বড় আসন ও বেতন তুলে নিচ্ছে কেবল সনদের জোরে। সনদ এখন মর্যাদার প্রতীক। সত্যতা ও সততার প্রতীক। যে কোন উপায়ে তাই সনদ সংগ্রহের প্রতিযোগীতা চলছে। এমন কি অসৎ উপায়েও। কাজ ভালভাবে না জানলেও সেক্ষেত্রে কাজ হচ্ছে। এ অবস্থার সৃষ্টিকারী ও রক্ষাকারীরা অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছে।

ওখানটায় আগুন লেগেছে। মানুষগুলি আগুনে পুড়ে যাচ্ছে। উদ্ধারের জন্য বহু মানুষ ছুটে এসেছে। মানবিকতা বলে কথা! কিন্তু না। একটি শক্তিশালী মোটা কালো হাত মানুষের স্বতঃস্ফুর্ত সে অংশগ্রহণকে বাঁধাগ্রস্ত করছে। আবার সে নিজেও যাচ্ছে না। অন্যকেও যেতে দিচ্ছে না।

সে যাচ্ছে না; কারন তার না যাওয়ার পেছনে যথেষ্ট শক্তিশালী যুক্তি আছে। ওটা তার কাজ ও দায়িত্ব না। টার্মস অব রেফারেন্সে নেই। তার কাজ আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি ঠিক রাখা। তাহলে অন্যদের যেতে দিচ্ছেন না কেন? সেখানেও কারন আছে। কারন,

উদ্ধার কাজে তাদের কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। প্রকৃত সত্য হচ্ছে, তাদের এ কাজে অভিজ্ঞতার কোন সনদ বা সার্টিফিকেট নেই। আবার যদিওবা কারও আছে তো সেটিও ভূয়া! সনদে যে অফিসারের স্বাক্ষর থাকার কথা তার স্বাক্ষর নেই।

মানুষগুলি ইতিমধ্যে আর জীবিত নেই। সকল কাজ প্রাতিষ্ঠানিকিকরণ ও প্রকল্পভিত্তিক অর্থ বরাদ্দের সুফল এগুলি। কোথাও কোন বোধ-বুদ্ধি, বিচার-বিবেচনা বা মনুষ্যত্ব নেই। যে কোন প্রকারে কেবল কাগজ কথা বলে। তাই কাগজ দেখাতে পারলে খুনের আসামিও পার পেয়ে যাচ্ছে। আবার নিরাপরাধ কারাগারের নিভৃতে দিন কাটাচ্ছে।

সাঁইরেণ বাজাতে বাজাতে ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি ছুটে এলো। লাশ উদ্ধার হলো। ময়না তদন্তের জন্য সদ্য ক্রয়কৃত অত্যাধুনিক ব্যায়বহুল বাহনে লাশগুলি যথাস্থানে নিয়ে যাওয়া হলো। (লেখা ১১/০৮/২০১২)

স্বাধীনতা

(Freedom)

মনে হচ্ছে যেন শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। বড় করে একটা দম নিতে ইচ্ছে করছে। ইচ্ছে করছে ফুটবলের মত একটি মাঠে দৌড়ে এপাশ থেকে ওপাশে যাই। তারপর বড় করে দম নেই।

নিজের ইচ্ছেমত একটি মাঠের এপাশ থেকে দৌড়ে ওপাশে যেতে পারাও স্বাধীনতা। সেটি যার নেই কিংবা যে সেটি হারিয়ে ফেলেছে বা এভাবেও বলা যায় যে, যার সে অধিকার অন্য কেউ হরণ করে নিয়েছে, কেবল সেই তার মর্ম বোঝে।

একজন মানুষের দাড়িয়ে থাকতে কতটুকু স্থানের প্রয়োজন হয়? খুব বেশী না। ঐটুকু স্থানে দাড়িয়েই সে পরিপূর্ণ শ্বাস নিতে পারে। কিন্তু যখন তাকে ঐটুকু স্থানে থাকতে বাধ্য করা হয়, তখন দম আটকে আসে। স্বাধীনতায় মানুষ অল্পতেই সব কাজ সম্পন্ন করতে পারে। অস্বস্তি বোধ করে না। কিন্তু যখন তা হরণ করে নেয়া হয়, তখন কল্পনায় অনেক বেশী বেশী প্রাপ্তির প্রত্যাশা জাগে। মনে যত শক্তি আছে তত শক্তি দিয়ে মুক্তভাবে ছুটে বেড়াতে ইচ্ছে করে।

একজন মানুষের যে পরিমান শারীরিক সক্ষমতা, তাতে সর্বশক্তি দিয়ে একটানা দৌড়ে ফুটবল মাঠের এপাশ থেকে ওপাশে যেতেই ক্লান্ত হয়ে যাবে। এতটুকু স্থান হলেও সে প্রাণ ভরে দৌড়াতে পারে। শ্বাস নিতে পারে।

এতকিছু ভাবছি সিংহটির করুন অবস্থা দেখে। চিড়িয়াখানায় মানুষ এসে পশু



পাখি দেখে আনন্দ পায়। সিংহটিকে দেখে বুকে একরাশ কষ্ট নিয়ে আজ ফিরে যেতে হচ্ছে। অনেকদিন ভূলতে পারিনি সে স্মৃতি। বাসায় ফিরেও নিজের কাছে মনে হচ্ছে যেন দম আটকে আসছে।

মন খুলে দৌড়াতে, প্রাণ ভরে শ্বাস নিতে দুর্বল মানুষেরও একটা মাঠ প্রয়োজন হয়। শক্তিশালী এ প্রাণীটির জন্য অনেক বড় জায়গার প্রয়োজন তার দেহকে সুস্থ রাখার জন্য, প্রাণ ভরে শ্বাস নেবার জন্য। অথচ ছোট্ট একটি খুপচি ঘরে তাকে আটকে রাখা হয়েছে! দেখে যেন নিজেরই শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

হঠাৎ যেন হাতের দু'বাহু অবশ অনুভূত হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন ইচ্ছেমত হাত নাড়াতে পারছি না। যে পাখি খোলা আকাশের নিচে মাইলের পর মাইল উড়ে বেড়ায়, এখানে সে তার ডানা মেলে ধরতে পারছে না। আমরা নিজেরা স্বাধীনতা চাই। অথচ অন্যের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন করে দিতে বা হরণ করে নিতে কুন্ঠাবোধ করি না।

একবার মনে হল এ অমানবিকতা। আবার মনে হল যাদের জীবন এর সাথে জড়িয়ে গেছে, এসব বন্ধ করে দিলে তাদের সন্তানদের লেখা-পড়া বেঁচে থাকা হুমকির মুখে পরবে। সেটিও তো আরেক অমানবিকতা। পশু-পাখির চেয়ে মানুষের জীবনের মূল্য অনেক বেশী। ধীরে ধীরে বিকল্প কিছু করা দরকার যেন কারও জীবন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

পশু-পাখিদের জন্য পর্যাপ্ত স্থান প্রয়োজন। অন্যথায় এভাবে এসব প্রদর্শন বন্ধ করে বড় ডিসপ্লেতে আকর্ষণীয়ভাবে ভিডিও প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। (লেখা ২০১৩)

হুমায়ুন আহমেদ, একটি গান এবং কিছু অপ্রাসংঙ্গীক প্রসংগ
(Humayun Ahmed and A Song)

এক

সন্ধ্যা। টিপ টিপ বৃষ্টি ছিল সেদিন। ফিরে গেলে বেড় হতে মন চাইবে না। রাতের খাবার খেয়েই ফিরতে হবে।

ইটালিয়ান একটি হোটেলে প্রবেশ করলাম। হোস্টেলের আশে-পাশে এমনি অনেক খাবারের দোকান আছে। বেশ যত্ন নিয়ে খাবার পরিবেশন করে। মিঠু বলল- নে, তাড়াতাড়ি খাবার শেষ করে নে। বৃষ্টি আবার বেড়ে যেতে পারে। তাহলে কিন্তু সর্বনাশ। হাতে সময়ও বেশী নেই।



নাকে মুখে চারটা খেয়ে বের হলাম। বাইরে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি। মাথায় রুমাল আর খবরের কাগজটা উচু করে ধরে হালকা গতিতে দৌড় শুরু করেছি দু'জন।

জিলা স্কুলের সামনের রাস্তাটিতে লাইট পোষ্টের আলোয় আবছা আলো-আঁধার খেলা করছে। চারিদিক নির্জন। কিছুদুর এগুতেই পাঞ্জাবী টুপি পড়া বয়স্ক ভদ্রলোক ব্যাস্ত সমস্ত হয়ে দৌড়ে যোগ দিলেন। মনে হল একটু তাড়া আছে। তিনজন সমান তালে দৌড়ে চলেছি।

দু'জনের মনে একই প্রশ্নের উদয় হল। চাচা দৌড়োচ্ছেন কেন? বিষয়টি বুঝতে পারলাম তখন, যখন একই সাথে দু'জনের মুখ থেকে শব্দ বেড় হয়ে এল- চাচা, আপনি দৌড়োচেছন কেন? অতপর হাসি ..

ভাবছি, আমরা তো জানি আমরা কেন দৌড়োচিছ। চাচা কেন দৌড়োচ্ছেন তিনি তা বললেন না। কেবল বললেন, মনে হয় শুরু হয়ে গেছে। চাচাও আমাদের দৌড়ের কারন বুঝে নিয়েছেন। অতপর তিনজনের অট্টহাসি ...। অন্তরের কথাটি সবার জানা হয়ে গেছে।

হোস্টেলে ফিরে রুমে না গিয়ে মিলনায়তনে চলে গেলাম। তখনও হুড়োহুড়ি করে অনেকেই মিলনায়তনে ঢুকছে। বসার একটু জায়গা দখল করতে হবে। আরামে বসে আয়েশ করে উপভোগ করতে হবে। বিটিভিতে সেদিন নাটক ছিল। ‘এই সব দিন রাত্রি’। টুনিকে নিয়ে ঘটনা চলছে।

দুঃখ কষ্টের মাঝেও অন্তরে একটু প্রশান্তি আর আনন্দ দিতে সক্ষম হয়েছিলেন প্রিয় লেখক। তপ্ত হৃদয় এক পশলা বৃষ্টির পানিতে যেন ভিজে শীতল হয়ে যেত তার সৃষ্টি ধরে চললে। তিনি নিজেও জানতেন কিনা জানিনা, কোটি মানুষকে একবারের জন্য হলেও তার নামটি মুখে নিতে হয়েছে।

কেবল হাসি আর আনন্দ দিয়ে গেছেন তাই নয়। সমাজের যেসব দুরাচারের বিরুদ্ধে সহজে কথা বলা যায় না, তিনি তাঁর নিজস্ব এক নিখুঁত ষ্টাইলে হাস্যরসের মাধ্যমে মানুষের সামনে সে সব বিষয় তুলে ধরেছেন। সমাজের ত্রুটি বিচ্যূতিগুলিকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। বিষয়গুলি অনেকেই দেখায় কিংবা অনেকেই সেসব বোঝে। কিন্তু তিনি যেমনিভাবে বিষয়গুলিকে উপস্থাপন করেছেন মানুষ সেসব বিষয়কে বিবেচনায় নিতে বাধ্য হয়েছে। মানুষকে বিষয়গুলি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বুঝিয়ে ও সফলভাবে স্মরণ করিয়ে দিতে সার্থক হয়েছিলেন লেখক। বিষয়গুলির বেশীরভাগই মনস্তাত্বিক। আর সমাজে দুর্বলের ওপর সবলের আক্রমন, প্রাথমিক পর্যায়ে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এই মনস্তাত্বিক দিক দিয়েই শুরু হয়ে থাকে। প্রথমেই মনের জোরকে ভেঙ্গে দেয়ার চেষ্টা করা হয়। তারপর অন্যান্য দিক। কেবল ব্যক্তির ক্ষেত্রেই নয়, জাতিতে জাতিতে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রেও তাই হয়।

মানুষ এমন বোকা নয় যে বিষয়গুলি তারা বোঝে না। মানুষ বোঝে। কিন্তু বলে না। বলতে পারে না। কোথায় কিভাবে বলবে জানে না। অনেকের সুযোগ হয় না। অনেকের সময় হয় না। অনেকের মন মানসিকতা হয় না। অনেকেই সাংসারিক ব্যাস্ততার কারনে পেরে ওঠে না। মানুষের মনের কথাটি যখন কেউ বলে দেয়, যখন অন্তরের কথাটির সাথে লেখকের বলা কথাটি মিলে যায়, তখনই মানুষ তাকে আপন করে নেয়। তিনি সকলের অন্তরে দাগ কেঁটে দিয়ে গেছেন।

হুমায়ুন আহমেদের জনপ্রিয়তা কেবল তার হাস্য-রসবোধের স্বীকৃতিই নয়, সামাজিক সূক্ষ সূক্ষ অনাচারের বিরুদ্ধে অধিকাংশ মানুষের অবস্থানেরও নির্দেশক। মানুষ তাঁর সাথে সহমত প্রকাশ করেছে, কিংবা বলা যেতে পারে তিনি মানুষের

অন্তরে লালিত মতামতগুলিকে প্রকাশ করে দিয়েছেন। যেমনটি কাজী নজরুল ইসলাম কিংবা অপরাপর সকল লেখকদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। একেক জনের একেক ষ্টাইল। তাঁর ষ্টাইলটিকে মানুষ গ্রহণ করে নিয়েছিল।

কেবল লেখককে প্রশংসা করলে অন্যায় হবে। যারা লেখকের সে সব বক্তব্যকে নিখুঁতভাবে মানুষের সামনে তুলে ধরতে অভিনয় থেকে শুরু করে এর পেছনে কাজ করেছেন, তারা সকলেই লেখকের নামে এ প্রাপ্ত প্রশংসার অংশীদার। সে সময় একটি টীম কাজ করেছে। তবে মধ্যমনি ছিলেন লেখক। উদ্দীপনাটি তাঁকে ঘিরে বহমান ছিল।

অজান্তেই তিনি কখন কেন্দ্রে বসে গেছেন মানুষ বুঝতেও পারেনি। এক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। তার মৃত্যুতে অঙ্গনটি মুরুব্বিবিহীন হয়ে পরেছে এমন মনে হয়।

আজকাল অনেকে বিশেষ করে নাটকের ক্ষেত্রে তার অনুকরণ করার চেষ্টা করে। তেমনটি হয় না। অনুকরণ করতে নেই। প্রত্যেকেরই নিজের মত করে কাজ করা ভাল। এ ধরণের অনুকরণ প্রবণতা- যাকে অনুকরণ করার চেষ্টা করা হয় তার সৃষ্টিকে ছোট করে।

আজও যে ভাল নাটক হয় না তা কিন্তু নয়। এখনও অনেক ভাল সৃষ্টি চোখে পড়ে! তবে কোন একটি সৃষ্টি কখন কোন মাত্রায় পৌঁছাবে এটি কেবল সৃষ্টির ওপরই নির্ভর করে না। যারা সৃষ্টিকে উচ্চ মাত্রায় তুলে নিয়ে যান, অর্থাৎ সৃষ্টির আত্মিক ভোক্তা, তারা কোন আর্থ-সামাজিক অবস্থায় আছে, অর্থাৎ সমসাময়িক সময়টিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এখনকার এক টাকার মান যেমন আশির দশকের এক টাকার মানের সমান নয়। তেমনি তখনকার সামাজিক প্রেক্ষাপটে যে সৃষ্টিটি যে মূল্য বহন করেছে, সেই একই সৃষ্টি এখন তেমনভাবে মানুষের মনে প্রভাব নাও রাখতে পারে। সামগ্রীক পরিবেশ একটি বিষয়কে ওপরে নিয়ে আসে। যিনি সৃষ্টি করবেন তাকেই তার সময়ের শ্রেষ্ট সৃষ্টি কি হতে পারে ভাবতে হবে। অনুকরণ করে সে পর্যায়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তবে স্ব-মহিমায় আজও অনেক ভাল সৃষ্টি আছে। এখন মিডিয়া অনেক বেশী। মানুষের অন্তরের ক্ষুধার বিষয়টি বুঝতে পারা কঠিন হয়ে গেছে।

মানুষের হৃদয়ে প্রত্যেকেই তার সৃষ্টি বা গুন দিয়ে একটি আসন তৈরী করে নেন। যারা আসন তৈরী করেন তারা আপন মনে নিজের সৃষ্টিটি সৃষ্টি করেন। তারা

একে অন্যের আসন দখল করার কথা ভাবেন না। ভাবেন পরবর্তীতে তাদের অনুসারীরা। মানুষের মনে একজনের আসনে অন্যকে প্রতিস্থাপন করা যায় না। প্রত্যেকে যার যার আসনে অবস্থান করে।

হুমায়ুন আহমেদ তাঁর অবস্থানে অবশ্যই আকর্ষনীয়। নজরুল কিংবা রবীন্দ্রনাথের সাথে তুলনা অনাবশ্যকীয়। সবচেয়ে সংগ্রাম করে, বিধাতার নিজ হাতে প্রদত্ত দানে ভরপুর হয়ে সৃষ্টি করে গেছেন নজরুল। তারপরেও বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ গুরুজনের আসনটি নিয়ে বসে আছেন। তাঁর এ আসন প্রাপ্তির বড় কারন- তাঁর সৃষ্টির অন্তর্নিহীতে কোথাও সৃষ্টিকর্তার অবিরাম বিচরণ এবং একটি নিরব গাম্ভীর্য্য ও গভীরতা। যদিও অনেকে তাঁর লেখায় উচ্চারিত প্রেমকে মানবীয় প্রেমের সাথে মিলিয়ে ফেলে। এটাও সত্যি যে তা মিলে যায়। সৃষ্টিকর্তাকে যে সরাসরি স্পর্শ করে, তার আসনটি হয়তোবা আপনা থেকেই উচ্চে অবস্থান করে।

অল্প কিছুদিনে অনেক প্রিয় মুখ সবাইকে ছেড়ে চলে গেলেন। যেন একটি যুগের সমাপ্তি ঘটে চলেছে। তাঁদের চলে যাওয়ায় ঘরে কি যেন নেই নেই একটি ভাব। এ মানুষগুলোর স্মৃতি, ছবি, অন্তরে প্রতিচ্ছবি, কাজ-কর্ম একটি জাতিকে একটি কেন্দ্রিয় টানের মাধ্যমে এক রাখতে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। মানুষ তাদের আপন ভেবেছে। নিজেদের কেউ একজন মনে করেছে। মানুষের আবেগের কর্মকান্ডেও আছে বিজ্ঞান। এগুলোকে অস্বীকার করা যায় না। সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিতে এগুলোও গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। যারা চলে গেলেন তাদের আত্মার শান্তির জন্য সকলেই নিরবে প্রার্থনা করে।

দুই

হুমায়ুন আহমেদ চলে গেলেন। তাকে নিয়ে ঘরে ঘরে আলোচনা। টিভি চ্যানেলগুলিতে আলোচনা। বেশীর ভাগ আলোচনাই হয় গভীর রাতে। মৃত্যুর পর কোন এক রাতে কোন এক চ্যানেলে আলোচনা চলছিল। বিশিষ্ট একজন বলছিলেন। তিনি যে বক্তব্য রেখেছিলেন তার একটি অংশের মর্ম কথাটি ছিল এমন- কোন কোন চ্যানেলে হুমায়ুন আহমেদের কফিন দেখাবার সময় একটি আবহ সংগীত বাজিয়েছে, যেটা না করলে ভাল হত। তাঁর এ বক্তব্যটিকে নিয়ে ভাবনাগুলি যেভাবে কাজ করেছে নীচে তাই তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

প্রথমত: প্রতিটি সমাজে ক্ষেত্র বিশেষে প্রচলিত কিছু নিয়ম রিতিনীতি থাকে। সে নিয়ম মেনে চললে বিতর্কের সৃষ্টি হয়না। সেটি ভাল। ফলে এ রকমটি না করলেও মন্দ হত না।

দ্বিতীয়ত: যারা এ কাজটি করেছে তারা কি উদ্দেশ্যে করেছে তা তারাই জানে। তাদের নিয়তের ওপরই বিষয়টি নির্ভরশীল।

তৃতীয়ত: এর পেছনে একটি সত্য লুকিয়ে আছে। সত্যটি কি? বিষয়টি একটু ভেঙ্গে ভেঙ্গে বোঝার চেষ্টা করি। কফিন দেখাবার সময় যে আবহ সংগীতটি বেজেছিল সেই আবহ সংগীতে কি ছিল?

১) আবহ সংগীতে একটি সুর ছিল,

২) আবহ সংগীতে কিছু কথা বা বক্তব্য ছিল।

প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী হয়তোবা দেখানো যেত যে, সুরা ইয়াসিন অথবা সুরা ফাতিহা পাঠ করা হচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে সুরার মধ্যে কি আছে?

১) সেখানেও সুর আছে,

২) কিছু কথা বা বক্তব্য আছে।

যদি অশ্লীল কিংবা ঘটনার সাথে অসামঞ্জস্য কোন কিছু না থাকে, যদি দুটো বক্তব্যের মাঝেই কোন প্রার্থনা থাকে- তো সমস্যা কোথায়?

যে সুর বা যে ভাষায়ই করা হোক না কেন, প্রার্থনা তো মানুষ একজনের কাছেই করে। বান্দা কি বলতে চায় বিধাতা তার সব সুর, সব ভাষা বোঝেন। বান্দা মুখ ফুটে কিছু না বললেও তিনি বোঝেন। তবুও বান্দা বলে বান্দার নিজের অস্থিরতার কারনে।

সকল সুর সকল ভাষা মানুষ তথা প্রাণীকুলের মাধ্যমে প্রকাশ করার কাজটি তিনিই সম্ভব করে দিয়েছেন। সম্ভব করে দেয়ার অর্থ হল অনুমোদন করে দেয়া। কেবল সেগুলি নিষিদ্ধ যা সুস্পষ্টরূপে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন এবং যা স্পষ্টতই অশ্লীল।

যুগ যুগ ধরে মৃত্যুজনিত ঘটনার ক্ষেত্রে যে সুর ও যে বাণী মস্তিস্কে গেঁথে আছে, এক্ষেত্রে ভিন্ন সুর আর ভিন্ন বাণীতে একটি প্রার্থনা করা হয়েছে। প্রার্থনার অর্থ ও নিয়ত একই। সমস্যাটি হচ্ছে মস্তিস্কে বন্দি হয়ে যাওয়া কোন প্রোগ্রামে। মানুষ এমন এক প্রাণী যে অভ্যস্ততার বাইরে সে নতুন কিছুকে সহজে গ্রহণ করে নিতে পারে না। এমনকি ইসলাম ধর্মকেও গ্রহণ করতে চায়নি। ইংরেজী ভাষা

শিক্ষা থেকে শুরু করে কম্পিউটার, মোবাইল, ইন্টারনেট সব কিছুকেই উদারভাবে গ্রহণ না করে সন্দেহের চোখে দেখেছে। আজও অনেকে তাই করে।

কম্পিউটার যেমন তার প্রোগ্রামের বাইরে কিছু করতে পারে না, মানুষের ক্ষেত্রেও তাই! নতুন প্রোগ্রাম ইনষ্টল করা সম্ভব হলে মানুষ আবার সেটিকেই গ্রহণ করে নেবে।

ওপরে আলোচিত বিষয়টি যদিও ব্যাতিক্রমী, তথাপি কারই কোন ক্ষতি করছে না। এটিকে মেনে নিতে পারলে বাস্তবে কোন সমস্যাই নেই। অথচ কারও কাছে বিষয়টি দৃষ্টি ও শ্রুতিকটু কিংবা মননে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠছে না। এই যে আমি লিখছি, অভ্যস্ততা বা অনভ্যস্ততার কারনে আমার নিজের মনেও ধাক্কা লেগেছে। তথাপি সত্য তো সত্যই। সত্যকেই গ্রহন করতে হবে।

কেউই বাধ্য করছে না। কেউই বন্দি করে রাখছে না। অথচ মানুষ নিজের ধারণ ও লালনকৃত চিন্তায় নিজেই নিজেকে যুগ যুগ ধরে কোন ভাবনার সীমানার গন্ডির মধ্যে বন্দি করে রাখছে। বাস্তবে মানুষ পরাধীন মূলত নিজের ভবনার জগতের সংকীর্ণতা ও ত্রুটির কারনে।

পরের প্রসংগ-

পাঠক, এ মুহূর্তে একবার ভাবুন তো আপনার জিহ্বায় ঝালের কোন স্বাদ পাচ্ছেন কি না? মনে করি উত্তরটি না। তবে কি আপনার দেহে ঝালের বিদ্যমানতা নেই? এবার একটি কাঁচামরিচ ভেঙ্গে জিহ্বায় স্পর্শ করুন।

দেখুন তো আপনার চোখ দিয়ে পানি ঝরছে কি না? মনে করি উত্তরটি না। কতগুলি পেঁয়াজ নিয়ে কাটতে শুরু করুন। দেখবেন চোখ দিয়ে জল ঝরছে। কোথায় ছিল এত জল?

করলা মুখে দিলে এক রকম স্বাদ, লবন মুখে দিলে আরেক রকম, তেতুলে আরেক স্বাদ। ঝালের স্বাদ কি মরিচে? টক কি তেতুলে? তিতা কি করলায়?

মরিচ ঝাল হোক, করলা তিতা হোক কিংবা তেতুল টক হোক- মানুষ কিন্তু জানেনা যে আসলেই মরিচ ঝাল কিনা, করলা তিতা কিনা কিংবা তেতুল টক কিনা। জানা কোনদিন সম্ভব নয়। কেননা করলা তার নিজ জিহ্বা দিয়ে সেটি পরীক্ষা করে ফলাফলটি মানুষকে জানায়নি।

বিষয়টি মানুষ জানতে পেরেছে তখন, যখন মানুষ নিজে জিহ্বা দিয়ে সেটি পরীক্ষা করেছে। ফলে তিতা কিংবা ঝালের যে স্বাদ তা করলা কিংবা মরিচের ভেতরে নাকি তা মানবের নিজের দেহের ভেতরে বিজ্ঞানীরাই সেটি ভাল বলতে পারবেন।

হয়তোবা স্বাদগুলির অনুভব করলা কিংবা মরিচে নয়। মহা মূল্যবান এ দেহের ভেতর নানান রকমের স্বাদের অস্তিত্ব বিদ্যমান। কিন্তু ঘুমন্ত। সুরক্ষিত করে রাখা মূল্যবান সে সব সম্পদ ভেতর থেকে বেড় করে আনতে কিছু একটার সহায়তা নেয়া হয়। সেগুলিই মরিচ, করলা, তেতুল ইত্যাদি। যাদের সংস্পর্শ পেলে এক একটি জেগে ওঠে।

নদীর ধারে খেজুর গাছের নীচে বসে আছি। হঠাৎ কোকিলের ডাক শুনতে পাই। দৃষ্টি সেদিকে ফিরে যায়। বাতাসে দুলছে ঝুমকো লতা ফুল। দৃষ্টি সেদিকে চলে যায়। একটি প্রজাপতি অনেকক্ষন নিশ্চুপ বসে আছে পাতার ওপর। যেই না আরেকটি হলুদ প্রজাপতি পাশ দিয়ে উড়ে চলে গেল, অমনি তার পিছু নিল।

আমরা কিছুই করি না। করতে চাই না। করতে জানি না। সদা নির্বাক, নিশ্চল, নিশ্চুপ! প্রকৃতি তার নানান উপকরণ ব্যবহার করে আমাদের নাড়া দেয়। প্রলুব্ধ করে। তাই করি। দোলা দিয়ে ভাবনার উন্মেষ ঘটায়। অগনিত উপকরণে ভরপুর এ মহাবিশ্ব। সব বুঝতে পারি না। আমার চোখের জল আমার ভেতর, পেঁয়াজের ভেতর না। তাই আমার চোখ দিয়ে জল ঝরে। পেঁয়াজ কেবল প্রভাবক। নির্দিষ্ট অনুভূতিটিকে জাগিয়ে তুলতে সহায়তা করে।

সহপাঠি মোনায়েম। গানের কণ্ঠটি ভারি মিষ্টি। বাদ্যযন্ত্র ছাড়াও ওর কণ্ঠে গান খুব ভাল শোনাতো। ক্লাসে স্যার আসতে দেরি- ব্যাস, ক'জনা জড়ো হয়ে ওর কণ্ঠে গান শুনে নিতাম।

"মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না ..।"

আম্মা চলে গেলেন। দুপুরে নামাজ শেষে মসজিদে বসে আছি। একে একে সবাই বেড়িয়ে যাচ্ছে। দুর থেকে মোনায়েম পাশে এসে বসেছে। মিষ্টি হাসি দিয়ে জানতে চাইল, তোমাকে মাঝে মাঝে মসজিদে দেখি। নিয়মিত দেখি না। কারনটা জানতে পারি?

বললাম- মাঝে মাঝে আল্লাহর প্রতি প্রেম-ভালবাসা জেগে ওঠে, তাই।

যদিও ভালবাসা নিরবচিচ্ছন্নভাবে অন্তরে ঘুমিয়ে থাকে। মানুষ দেখতে পায় তখন যখন সেটি উপচিয়ে পরে।

- আজ তবে কি কারনে তোমার ভালবাসা জেগে উঠেছে, জানতে পারি?

দ্বিধাদ্বন্দ্বে পরে গেলাম। সত্য কথাটি বলব কি বলব না ভাবছি। পরিবেশ এ ধরণের একটি উত্তরের স্বপক্ষে নয়। ভাবছি, উত্তরটিকে ও কিভাবে গ্রহণ করবে?

বললাম- গান শুনে।

কিছু গান আছে যার ভেতর ডুব দিলে স্রষ্টার প্রতি ভালবাসায় প্রাণ সিক্ত হয়ে আসে। মন প্রাণ জেগে ওঠে! আজ তেমনটি হয়েছে।

মোনায়েম গানের মানুষ। গলা জড়িয়ে ধরে একটি হাসি দিয়ে বললো, তুমি মনের কথাটি বলেছ। সমাজটা এমন, এখানে সত্য কথাটি বলার পরিবেশ নেই। আমারও তেমনটি হয়। বলতে পারি না।

অনেকেই এভাবে ভাবে। সত্য প্রকাশের পরিবেশের অভাবে সত্য গোপন রেখেই অনেককে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়।

অন্তর থেকে উৎসারিত অন্যায় ও কদর্যবিহীন সুন্দর ও সত্যটিকে প্রকাশ করার মুক্ত পরিবেশ কোথায় বাঁধা প্রাপ্ত হচেছ? (লেখা ২০১৬)

দায়িত্ববান

(Dutiful)

নিজেকে অতি দায়িত্বশীল ভাববার প্রয়োজন নেই। নিজেকে বড় দায়িত্বশীল করে গড়ে তোলারও প্রয়োজন নেই। সমাজের অনেক সমস্যার মূলে এই স্ব-উচ্চারিত দায়িত্বশীল জনগোষ্ঠী। যারা সমাজে নিজেদের অতি দায়িত্ববান বলে প্রকাশ করতে চান। প্রকারান্তরে তারা অন্যদেরকে অদায়িত্বশীল বলেও প্রামাণ করতে চান। এসব লুকোচুরির দায়িত্ব পালনের সর্বশেষ ফলাফল নিজে প্রস্ফুটিত হওয়া।

নিজে প্রস্ফুটিত হওয়ায় সমস্যা নেই। কেননা এটিই তাকওয়া অর্জনের পর্যায়ভূক্ত। কিন্তু সমস্যা হয় তখন, যখন চাতুর্যপূর্ণ কর্ম ও আচরণ দ্বারা ভালকে মন্দে পরিণত করে নিজেকে ভাল প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়। আর সেটি করতে গিয়ে নিজেই সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজটি করে থাকে।

নদীর যখন এক কুল গড়ে তখন অবশ্যই অন্য কুলকে ভাঙতে হয়। এটাই সত্য। এটা একটা নিয়ম, ফর্মূলা বা সূত্র। হিসেবে যখন এক টাকা ডেবিট হয়, তখন সমপরিমান এক টাকা ক্রেডিট হতে হয়। এটাই সত্য, নিয়ম বা ফর্মূলা। দায়িত্বশীলেরা যখন নিঃস্ব অবস্থা থেকে শুরু করে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নিজেরা প্রস্ফুটিত হয়, তখন যার জন্য দায়িত্ব পালন করে, সে সমপরিমান নিঃস্ব হতে থাকে। ভয়ংকর! সাবধান এসব দায়িত্ববানদের সংস্পর্শ থেকে।

যদি ওপরের সতর্ক বাণীই সত্যি হয় তাহলে পৃথিবীর এবং পৃথিবীর মানুষের উন্নয়ন ঘটবে কিভাবে? এটাই তো সিস্টেম। কিন্তু এ সিস্টেম নিষ্ঠুর! নিজের সন্তানের পাতে খাবার তুলে দেয়, অন্যের সন্তান না খেয়ে কাতরালে ফিরেও তাকায় না। উপরন্ত পরিহাস করে। অযোগ্যতা বলে প্রমাণ করতে চায়। অথচ যোগ্যতার মাপকাঠি এখন অবৈধ অর্জনে। সবাইকে সে পথে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে।

হাসান-হোসেন ন্যায়ের পথে যুদ্ধ করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছেন। এটা কি তাদের যুদ্ধে না জেতার অযোগ্যতা? যারা মানুষকে ভূল বোঝায়, বিশ্বাস ভংগ করে তাদের কাছে বিশ্বাসীদের সবসময়ই হারতে হয়, যদি তাদেরকে বিশ্বাস করা হয়। সাবধান অতি দায়িত্ববানদের বিশ্বাস করতে নেই। তাদের অতি দায়িত্ববান হওয়ার পেছনে আছে নানান প্রকারের লোভ। কখনও অর্থের, কখনও ক্ষমতার এবং কখনও মর্যাদার।

দয়িত্ববানদের বিশ্বাস করতে হলে প্রথমেই যাচাই করে নিতে হবে যে, সে কোন প্রকারের লোভী কিনা। কোন এক প্রকারের লোভী হলেও তাকে বিশ্বাস করা যাবে না। তার হাতে নিজের ভাগ্য গড়ার দায়িত্ব তুলে দেয়া যাবে না।

বস্তুত নিজের ভাগ্য গড়ার দায়িত্ব মানুষের নিজের। নিজের কর্ম নিজেকে করতে হয়। নিজের কাজের জবাবদিহির জন্য নিজেকে প্রস্তুত থাকতে হয়। শিক্ষাটি এমন হওয়া প্রয়োজন। তাহলে ঠকবাজদের হাত থেকে রক্ষা।

যে নিজেকে দায়িত্বশীল ভাবে, তার ভেতরে নিজেকে বড় প্রমাণ করার লোভ রয়েছে। মর্যাদা প্রাপ্তির লোভ আছে। সে কোন না কোনভাবে বা প্রকারের লোভী। জোর করে হলেও মর্যাদা অর্জন করা চাই। অথচ সে কিছুই করে না। প্রথমত যে উর্বর মস্তিস্কের কারনে তিনি দায়িত্ববান হয়েছেন বলে মনে করেন, সে মস্তিস্ক তার না। যিনি সেটা তার মাথায় সেট করেছেন, তিনি সেটি অন্যের মাথায়ও বসিয়ে দিতে পারতেন। সামগ্রীক পরিবেশ দান করে তাকে তার মত করে তৈরী করা হয়েছে। তাই তিনি দায়িত্ববান। দায়িত্ববান যে মুখ দিয়ে সুন্দর করে কথা বলছেন সে মুখটিও তার নিজের সৃষ্টি করা না। এমনিভাবে সে নিজেও নিজের না। তার কৃত কাজ তার না। যিনি তাকে দিয়ে সব কাজ করিয়েছেন, তিনি অন্যকে দিয়েও সেসব দায়িত্ব পালন করাতে পারেন।

দায়িত্ব পালনের প্রথম শর্ত হতে হবে, কাজটি যে নিজের না সেটি বুঝতে শেখা। ভাল অন্তরে ও নিঃস্বার্থভাবে সম্পন্ন হতে হবে কাজটি। কৃত কাজটি স্রষ্টা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে করা, সেটি বুঝতে ও স্বীকার করতে হবে। এটিই আত্মসমর্পন।

"... তোমার সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন কর ভগবানের তুষ্টির কথা বিবেচনা করে ...।" (গীতা ৩:৯)

"যে কেউ নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পন করে এবং ভাল কাজ করে তার পুরস্কার রয়েছে তার পালনকর্তার কাছে।" (আল-কোরআন ২:১১২)

".. সকল কর্মের ফল ভোগ করার বাসনা থেকে নিজেকে মুক্ত কর এবং এই চেতনায়, জ্ঞানে বা বোধে পরিপূর্ণরূপে সমর্পন কর।" (গীতা ২:৪৯)

কর্মজীবনে এমনকি মানুষের নিয়োগকর্তাগণও এমন স্বীকৃতি পেতে চায়। তবে স্রষ্টার ক্ষেত্রে কেন সেভাবে ভাবতে পারি না? কিংবা অন্তরে লুকানো সত্য কথাটিকে স্বীকার করে নিয়ে বলতে হবে যে, নিজের আকাংখা চরিতার্থ করার জন্য দায়িত্ব

পালন করছি। এমনতর প্রকাশে লজ্জা-ভয়-দোষ কিছুই নেই। বরং এটিই সত্য এবং বৃহত্তর পরিসরে এটিই সাধারণ ও স্বাভাবিক নিয়ম।

যারা নিজেদেরকে পরিবার, সমাজ কিংবা রাষ্ট্রে অতি দায়িত্ববানরূপে প্রমাণ করার চেষ্টা করে এবং অন্যদেরকে অদায়িত্বশীল বলে প্রচার করতে চায়, তারা চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেয়। কেননা তাদের এমন আচরণ বা দম্ভ প্রকাশই সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে। সমাজকে সংক্ষুব্ধ করে। যার পরিনাম বিশৃংখলা। জোর করে দায়িত্ব নেয়া ও সত্যটি ঢেকে রেখে জোর করে মানুষের মংগল করার প্রচেষ্টা চরম দায়িত্বহীনতা। সেটিও দায়িত্বহীনতা বলে বিবেচিত হতো না, যদি না আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ না হতো।

সৃষ্টিতে কোন ঘাটতি নেই। কোন দায়িত্ববানের জন্য কোন কর্ম থেমে থাকবে না। কর্ম সম্পাদনের জন্য একটার পর একটা ব্যবস্থা আসতেই থাকবে। তাই কেবল নিজেকে বড় দায়িত্ববানরূপে ভাববার বা প্রকাশ করবার কোন কারন নেই। কেবল নিজের করণীয় কাজটি করে যাওয়াই উত্তম পথ।

"... নিজেকে কখনই তোমার কর্মের ফলের কারনরূপে বিবেচনা করবে না। ...।" (গীতা ২:৪৭)

"... বল (হে মোহাম্মদ) সকল কারনই আল্লাহর হাতে। ...।" (আল-কোরআন ৩:১৫৪)

স্রষ্টার সৃষ্টি বড় নিখুত। সত্যকে বুঝতে হবে। সত্য কথাটিকে স্বীকার করতে হবে এবং সত্যটি বলতে হবে। আমরা প্রত্যেকেই নিজের জন্য করি। এ বলায় কোনকিছু হারাবার ভয় নেই, লজ্জা নেই, দোষ নেই। এ জগতে প্রত্যেকেই নিজের কোন না কোন ধরণের প্রয়োজন অনুভব থেকে কর্ম সম্পাদন করে। নিজের জন্য করে। সৃষ্টি এতই নিখুঁত যে, নিজের জন্য যখন কোন কাজ করা হয়, তখন আপনা থেকেই পরের জন্য করা হয়ে যায়। সে সূত্রেই বিধাতা তাঁর সৃষ্টিকর্ম রচনা করেছেন। সমাজের প্রতিটি অংশই দায়িত্ব পালনে রত। আমরা বুঝি কিংবা না বুঝি। অনু-পরমানু চোখে দেখা যায় না, অথচ তারাও কর্মে রত। অনেক সূক্ষ্ম বিষয় সাধারণ চোখে দেখা বা বোঝা যায় না। স্থুল বিষয়গুলিই কেবল চোখে ধরা পড়ে। অথচ প্রত্যেকেই কর্মে রত। প্রত্যেকেই দায়িত্ব পালন করে।

গাছ নিজের প্রয়োজনে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে। অক্সিজেন ছাড়ে। সে মানুষের কথা ভেবে তা করে না। নিজের জন্য, নিজের প্রয়োজনে করে। মানুষের

কথা ভেবেছেন স্রষ্টা। তাই বিষয়টিকে তিনি সেভাবে সাঁজিয়েছেন। তাতেই মানুষের উপকার হয়। মানুষ সে অক্সিজেন নিয়ে বেঁচে থাকে। মানুষের ছেড়ে দেয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড নিয়ে গাছ বেঁচে থাকে। প্রত্যেকেই নিজের জন্য নিজের প্রয়োজনে করে। তাতেই আপনা থেকে অপরের মংগল হয়ে যায়।

যারা ক্রুটি ধরেন, লেখাটিতে তারা ক্রুটি খুঁজে পাবেন। আবার তারাই যদি এটিকে ভালভাবে তুলে ধরতে চান, তবে বিষয়টিকে তারা আরও ভালভাবে তুলে ধরারও যোগ্যতা রাখেন। বিষয়টি নির্ভর করছে সমালোচকেরা কি চান তার ওপর? নিয়তটি কি?

অক্সিজেন হোক কিংবা কার্বন ডাই-অক্সাইড হোক, পরিবেশে যে কোনটির মাত্রা বেশী হলে ভারসাম্য রক্ষিত হবে না। বিনাশ ঘটবে। দায়িত্ববানেরা দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নিজেরা বেশী নিয়ে ফেললে সামাজে ভারসাম্য নষ্ট হয়। বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়। ধ্বংস নেমে আসে। বর্তমানে তাই হচ্ছে। আর সে কারনেই কথাগুলি বলা।

আশার কথা হলো- ধ্বংসও ধ্বংস নয়। ধ্বংস হচ্ছে নতুনভাবে ভারসাম্য সৃষ্টির একটি প্রক্রিয়া। দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কেউ যখন ভূল করে, পরিবেশে চরম বৈষম্য সৃষ্টি করে ফেলে- ধ্বংস হচেছ তেমন অবস্থায় ভারসাম্য রক্ষার স্বার্থে কথিত দায়িত্ববানদের দ্বারা কৃত সে ভূলের মাসূল। যতদিন মানুষ সঠিক আচরণ করবে। প্রকৃতিতে ভারসাম্য রক্ষিত হবে। ধ্বংস আসবে না।

ভারসাম্য রক্ষার কাজগুলিই হচ্ছে স্রষ্টার প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালন। যারা মন্দ কাজ করে, তাদের দ্বারা সে কাজগুলি বা সঠিক দায়িত্ব পালন হয় না। সে কারনেই মানুষকে ভাল পথে চলতে হয়। সৃষ্টির স্বার্থে বা সৃষ্টিকে রক্ষার্থে। সে কারনেই মানুষের ভাল পথে চলার এত এত নিয়ম- উপাসনা, স্রষ্টাকে স্মরণ করা ইত্যদি। ধরে নেয়া হয় এগুলি মানুষকে ভাল পথে চলতে সহায়তা করবে।

দরীদ্রকে দান, যাকাত প্রদান ইত্যাদি বিধি-বিধান ভারসাম্য রক্ষার্থে। অন্যথায় ভারসাম্য নষ্ট হবে। ভারসাম্য নষ্ট হলে বিশৃংখলা সৃষ্টি হবে। সমস্ত বিধি-বিধান কেবল ভাল হওয়া ও ভাল হয়ে থাকার জন্য। ভারসাম্য রক্ষার জন্য। এগুলিই স্রষ্টার প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালন। কেউ হিন্দু হয়ে ভাল হয়। কেউ ইহুদী হয়ে ভাল হয়। কেউ মুসলিম হয়ে ভাল হয়। যার যেমন বুঝ, পছন্দ ও সংশ্লিষ্টতা। কিন্তু যে এগুলি ছাড়াও ভাল থাকতে পারে .. .. ?

এত মানুষ (!)

(So Many People!)

এত মানুষ কেন? এত মানুষ; তো একেক মানুষ একেক রকম কেন? একেক মানুষের একেক রকমের গুণ। একেক মানুষ একেক গুনে গুণান্বিত!

আজ মানুষ মঙ্গল গ্রহে যাচ্ছে। হাতে গনা কিছু রোবট মঙ্গলে পৌঁছেছে। একেক রোবটের একেক কাজ। এত অর্থ আর এত শ্রম দিয়ে নিশ্চয়ই অপ্রয়োজনে কোন রোবট পাঠানো হয়নি। প্রতিটিই প্রয়োজনীয়। যিনি বা যারা এগুলি পাঠাচ্ছেন কেবল তারাই জানেন- কখন কোন প্রয়োজনে কোন রোবট পাঠানো হচ্ছে। না জানা লোক অর্থহীন আলোচনা-সমালোচনা করতেই পারে। আবার সবটুকু সবার জন্য প্রকাশিত নাও হতে পারে।

বিভিন্ন গুণে গুণান্বিত মানুষ পৃথীবিতে প্রতিনিয়ত আসছে। কাজ ফুরোলে আপনা থেকে শেষ হয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন গুণ বিভিন্ন কাজে লাগে। সব বিধাতার সৃষ্টি। সব প্রয়োজনীয়। অবুঝেরা কেবল নিজেরটাকে প্রয়োজনীয় ও বড় মনে করে।

সম্পূর্ণ বিশ্ব বা দেশ এমনকি এলাকাও বাদ দিলাম। একটা পরিবারেও বিভিন্ন পদের মানুষ প্রয়োজন। যদি কেবল পরিবারের দিকেই তাকাই তবে দেখতে পাব যে, প্রথমেই প্রয়োজন কাজ সৃষ্টি করার একটি কারনের। কোন কারন ছাড়া কাজ সৃষ্টি হয় না। কাজ সৃষ্টি না হলে কাজ করা হয় না। অলস জীবন-যাপন। এক ঘেয়েমি বা বিরক্তিকর জীবন। কাজ না থাকায়, কিংবা জীবনের অর্থ খুঁজে না পাওয়ায় অনেক সুখী মানুষ আত্মহত্যাও করে। অতএব কাজ সৃষ্টির একটি কারন দরকার। যেমন ধারণায় হলেও পৃথিবীবাসির সকল কর্মের কারন ‘গন্ধম’।

পরিবারে কাজ সৃষ্টির একটা কারন হতে পারে মানসিক প্রতিবন্ধি একজন অসুস্থ সদস্য। যে সকলের জন্য কাজের সৃষ্টি করে দেয়, যার কারনে সবাই সচল। তবে কি সে অপ্রয়োজনীয়-অকর্মণ্য? সে তো স্রষ্টার পর্যায়ের! সকল কাজের স্রষ্টা! সকলকে সে কাজে নিয়েজিত করেছে! অথচ প্রতিবন্ধি নিজে নির্জীব- নির্বাক-নিশ্চল!

সংসারে অসুস্থ সদস্যের জন্য একটা ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজন অর্থের। একজন অর্থ উপার্জনে মনোযোগী। তার একার পক্ষে সব সামাল দেয়া সম্ভব নয়। একজন এমন গুণ সম্পন্ন সদস্য দরকার যার অভাব আছে। অর্থের

বিনিময়ে তাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়া সম্ভব। তাহলে অভাবটাও এখন সামগ্রীক কার্য সম্পাদনের একটা প্রয়োজনীয় শর্ত। অভাব থাকতে হবে। অভাব পূরণ হয়ে গেলে কাজের মানুষ বা সহায়তাকারী খুঁজে পাওয়া যাবে না। অতএব এভাবে বলা যাবে না যে তার কোন গুন নেই। তার অর্থাভাব আছে। এ ধরণের গুণসম্পন্ন মানুষেরও প্রয়োজন আছে। সামগ্রীক কর্ম-সম্পাদনের প্রয়োজনীয় শর্ত হিসেবে এসব স্রষ্টার সৃষ্টি। অভাবিকেও তার প্রাপ্য সন্মান দিতে হবে বা কথায়-কাজে তার সন্মানে আঘাত দেয়া যাবেনা। নয়তো তাকে দিয়ে কাজ করানো নাও যেতে পারে। বলা হচ্ছে,

"... পার্থিব জীবনে তো আমিই তাদের ... একের মর্যাদাকে অপরের ওপর উন্নীত করি, যেন একে অপরের থেকে সেবা নিতে পারে।" (আল-কোরআন ৪৩:৩২)

অধিক উপার্জনকারী উপার্জনে ভাল। কিন্তু মানসিক চাপে থাকেন। অন্যান্য কাজ করতে গিয়ে গুবলেট করে ফেলেন। ঝগড়া-ঝাটি বাঁধিয়ে ফেলেন। তার মধ্যে কিঞ্চিৎ অহমবোধও কাজ করে। তিনি মনে করেন সবাইকে তার কথা মতো চলতে হবে। কিন্তু বাস্তব তা নয়। ফলে তার পক্ষে মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করা সব সময় সম্ভব হয় না। সমন্বয়ে ভাল, সংসারে এমন একজন মানুষও প্রয়োজন।

সংসারে এমনও সদস্য থাকেন যিনি কাজে জড়াতে চান না বলে মনে হয়। তাকে নিয়ে জবরদস্তী না করে নিজেরা কাজটা করে ফেললে ভাল। নচেৎ কাজের চেয়ে আকাজ বেড়ে যাবে বেশী। তাকে দিয়ে যা উপকার হবে তার চেয়ে অপকার বেশী হবে। এটিও বিধাতার আরেক বিধানের অন্তর্ভূক্ত বিষয়। বিষয়গুলি যিনি বুঝতে চাইবেন বুঝবেন। কেউ বুঝতে না চাইলে না বুঝবে। সমস্যা নেই। কেবল একটু ইংগীত দিয়ে রাখি।

আল্লাহ বারণ করেছেন মানুষকে তার নিজের করা কাজের জন্য গর্ব করতে। ওপরে যে কাজগুলোর বিষয়ে আলোচনা করা হলো, সে কাজগুলো করতে গিয়ে প্রত্যেকের মধ্যে গর্ব করার প্রবণতা প্রবেশ করে। অর্থবান ভাবেন তিনি সব করছেন। অর্থ উপার্জন করতে গিয়ে তার রক্তক্ষরণ হচ্ছে। আর কেউ কিছু করছে না। তিনি একাই বড় দায়িত্ববান। আর সব দায়িত্বজ্ঞানহীন। যিনি অভাবি তিনিও তার পক্ষে যুক্তি খুঁজে পাবেন। তেমনি সমন্বয়কারীও। তিনিও ভাবতে পারেন অর্থই কি সব? নিজে এসে কাজটা করে দেখুক না?

এত মানুষ (!)

সকলের মাঝে একজন থাকেন যাকে সবাই ফুর্তিবাজরূপে দেখে। সরাসরি কোন দায়িত্ব পালন করে না বলে মনে হয়। কিছু মানুষকে বিধাতা তেমনিভাবে সৃষ্টি করেন। কিন্তু অপরাপররা সেটি বুঝতে পারে না। বুঝতে পারে না সৃষ্টির রেসিপির তারতম্যের কারনে। তেমন একজনকে বিধাতাই সর্বত্র নিযুক্ত করে রাখেন। তিনি জানেন কোন চরিত্রটিকে এভাবে বসিয়ে রাখতে হবে। তিনি জানেন তেমন একজনের ভেতরের সৃষ্টির রেসিপি। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় তারা ফুর্তি করে বেড়ায়। কোন কাজ করে না, করতে চায় না কিংবা ফাঁকিবাজ বলে মনে হয়। সাবধান! এভাবে বলতে হয় না। এভাবে বলাটিই দায়িত্ববানের সবচেয়ে দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজ। এর সুদুরপ্রসারী মন্দ ফলাফল আছে। দায়িত্ববানেরা সমাজ-সংসারে দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে সে মন্দ বীজটিই বপন করে যায়। এমন মানুষেরা যতটা না দায়িত্ব পালন করে, তার চেয়ে বেশী বিষবৃক্ষ বপন করে।

উল্লেখিত চরিত্রের মানুষগুলি আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তেমন কোন কাজ করে না বা কাজে জড়াতে চায় না। কথাটি এক অর্থে সঠিক। কেননা তারা কাজ করে না, যতক্ষণ না বিধাতা তাদের কাঁধে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব অর্পন করেন। এরা সমর্পন বোঝে। সব কাজের পেছনে প্রেরণা হয়ে থাকে। সময়ে হাল ধরে। এরা কাজ জানে, কিন্তু প্রকাশ, প্রচার ও দম্ভ করে না। এরা কারও দ্বারা কৃত কোন কাজের মাঝে অনর্থক ঝামেলার সৃষ্টি করে না। যে কাজ করছে এরা তার কাজ করে যাওয়ার পরিবেশ ও পথটিকে মসৃন করে রাখে। কিন্তু অনেকেই সেটি বোঝে না বা উপলব্ধি করে না বা করতে পারে না।

একজন ওপর থেকে দেখেন কথিত দায়িত্ববানেরা তেমন এক চরিত্রের সাথে কেমন আচরণ করে। তাকে কতটা হেয় প্রতিপন্ন করে। তিনি পরীক্ষা করেন। তিনি মানুষের অন্তরের ক্ষুদ্র বাসনাকেও জেনে নেন। বস্তুত সব কাজই আল্লাহ সম্পন্ন করেন। যাদের মাধ্যমে করেন, তারা নিজেদেরকে কতটা বড় ও দায়িত্ববান ভাবে তিনি সেটিও দেখেন। তারা কি ততটা সন্মান আল্লাহকে দেয় কিংবা প্রতিনিয়ত আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, দায়িত্ব পালনের কারনে যতটা সন্মান তারা নিজেরা প্রত্যাশা করে? কিংবা সকল কর্মের পেছনে আল্লাহকে স্বীকার করে?

সত্যিকার অর্থে দায়িত্বপালনকারীরা কি কোন দায়িত্ব পালন করে? আল্লাহ যাকে দিয়ে একটি কাজ করাচ্ছেন, চাইলে তিনি তাকে দিয়ে কাজটি নাও করাতে

পারেন। তেমন ক্ষেত্রে কথিত দায়িত্ববান কি নিজেকে ততটা হেয় বা ছোট বলে ভেবে নিতে প্রস্তুত আছে, যতটা নিজে একটি দায়িত্ব পালনের কারনে অপরকে করে থাকে? যদি তা না হয়, তবে সে ভূল বা অন্যায় আচরণ করে।

যে নিজেকে নিজে সৃষ্টি করেনি, যে নিজেকে নিজে জন্ম দেয়নি- সে তার কাজের জন্য কতটা সন্মান প্রত্যাশা করতে পারে? যার বোধ আছে সে বোঝে যে, তার সমস্ত কাজের সন্মানের অধিকারী তার স্রষ্টা। অতএব যে নিজের সন্মান বা কোন সুবিধা প্রত্যাশী না হয়ে কাজ করবে, কেবল সেটাকেই দায়িত্বপূর্ণ কাজ বলে বিবেচনা করা যেতে পারে, নচেৎ নয়। সন্মান বা কোন সুবিধা প্রাপ্তির প্রত্যাশা নিয়ে যে দায়িত্ব পালন, সেটি বস্তুত রাগ-অনুরাগ-ক্ষোভ ও কলহের সৃষ্টি করে। যা কিনা চরম দায়িত্বহীন আচরণ বলে বিবেচ্য হতে পারে। এরকম দায়িত্ব পালন না করে বরং নিষ্ক্রিয় থাকা এবং অপরকে সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ করে দেয়া অধিক দায়িত্বশীলতার পরিচয় বহন করে।

প্রত্যেকেরই তার নিজ নিজ কাজের অংশটুকু ভালভাবে পালন করা ভাল। যিনি অর্থমন্ত্রি, অর্থ দেন বলে মনে করেন, তিনি নিজে যদি সব কাজ করতে যান তবে সব গুবলেট হয়ে যাবে। আবার এটিও বুঝতে হবে যে, সংগৃহীত অর্থ তার নিজের না। বৃহত্তর সমাজে কোন প্রয়োজন প্রদর্শন করার মাধ্যমে অর্থ সংগৃহীত হয়েছে। সংগৃহীত অর্থ অনেকে মিলে রক্ষা করে বিধায় তার কাছে অর্থ নিরাপদে থাকে। তাই সমাজ বা সংগঠনে কাউকে ছোটভাবে দেখার অবকাশ নেই।

জগতে এই যে, এত মানুষ! প্রত্যেকেই কিছু না কিছু দায়িত্ব পালন করছে। একজন বিকলাঙ্গও অনেকের বেঁচে থাকার জন্য কাজের সৃষ্টি করছে। সব আমরা বুঝি না। বোঝার প্রয়োজনও নেই। যিনি এত কিছু করেছেন তিনি জানলেই যথেষ্ট। আমাদের কাজ নিজের কাজটা অহম পরিত্যাগ করে যথাযথভাবে পালন করা। সকল কর্মের পেছনে বিধাতাকে স্বীকার করা। তিনি দায়িত্ব পালন করা থেকে সরিয়েও দিতে পারেন।

“আল্লাহ যদি ইচ্ছে করেন, তবে তোমাদের অপসারণ করতে পারেন এবং তোমাদের স্থলে অন্যদের প্রতিষ্ঠা করতে পারেন।” (আল-কোরআন ৪:১৩৩)

ইমাজিনারী গড, বিভাজন ও ধর্ম

(Imaginary God, Religion and Division)

আল্লাহর সাথে প্রথম পরিচয়। আল্লাহ কোথায়? সর্বত্র- চারিদিকে। এইতো এখানেও আছে। দু'হাত বাড়িয়ে লিখন লম্ফ-ঝম্ফ দিল, আল্লাহকে ধরার জন্য। জানলো তাঁকে ধরা যায় না। ছোঁয়া যায় না। তাঁর কোন আকার-আকৃতি নেই। তিনি নিরাকার। বয়স তিন কি সাড়ে তিন। লিখনের ক্ষুদ্র মস্তিস্কেও এ ভাবনা খেলা করে যায়- কোথা থেকে এলো, কিভাবে এলো? জানা হল- আল্লাহ পাঠিয়েছেন।

"যারা সত্যকে দেখে অর্থাৎ তত্ত্বদ্রষ্টা- তারা এ উপসংহারে পৌঁছেছে যে, .. অব্যয়-অক্ষয়-নিত্য বস্তু আত্মার কোন সমাপ্তি বা ধ্বংস নেই। ... আত্মাকে ভাঙ্গা যায় না, দ্রবীভূত করা যায় না, না একে পোড়ানো যায়, না শুকানো যায়। এটি চিরজীবি, সব কিছুকে বেষ্টন করে রাখে, অপরিবর্তনীয়, নিশ্চল এবং শাশ্বত।" (গীতা ২:১৬,২৪)

আল্লাহ নামটি উচ্চারিত হলে সেদিন থেকে লিখনের মানসচক্ষে আর কোন অজানা-অচেনা ছবি ভেসে ওঠে না। কোন নর কিংবা কোন নারীর ছবিও ভেসে ওঠে না। স্বরস্বতী, দূর্গা, গনেশ এর মত কোন ছবি ভেসে ওঠে না। মানসচক্ষে দেখে না কোন হাতি, ঘোড়া, বাঘ; নদী, সাগর, বটবৃক্ষ; চন্দ্র কিংবা সূর্যের ছবি। তবে মনের চোখে কিছু একটা তো ভেসে উঠতেই হবে। এমনও কি সম্ভব যে, মুখে কিছু উচ্চারিত হল অথচ মানসচক্ষে তার কোন ছবি-প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠবে না?

আল্লাহ নামটি উচ্চারিত হলে লিখনের মনজগতে কুয়াশার মত আবছা ধোঁয়া ধোঁয়া কিছু একটা ভেসে ওঠে। কসকো সাবানের খয়েরী রঙ এর সাথে ছাই মেশানো রঙ দেখতে পায়। এর ওপর লিখনের কোন হাত নেই। এটি আপনা থেকে তার মানসচক্ষে চলে আসে। তাতে কি কোন অপরাধ হল? যদি হয় তবে এ অপরাধ তো তার নিজের কোন পরিকল্পিত অপরাধ নয়। নিয়ন্ত্রনের বাইরে অজানা কারও দ্বারা সৃষ্ট অপরাধ। প্রথম তৈরী হয়ে যাওয়া ছবিটি মন থেকে সরাতে চাইলেও সরাতে পারে না লিখন। বিষয়টি যদি অপরাধ না হয়, তবে বলা যেতে পারে লিখন সঠিক পথেই আছে। অন্যরাও তাকে অনুসরণ করতে পারে।

যদি ধরে নেই আল্লাহ নামটি উচচারিত হল, অথচ মানসচক্ষে কোন কিছুই ভেসে উঠল না, তাহলে সে সময়টায় স্মৃতির একটা অংশ থাকবে শূন্য। শূন্য

স্মৃতির রং বা প্রতিচছবিটা কেমন হবে? কালো, ধুসর নাকি সাদা? যদি তাই হয় তাহলে তো সেই একই অর্থ হল। আল্লাহ নামটি উচ্চারিত হলে কালো, ধুসর কিংবা সাদা কিছু একটা অন্তরের চোখে ভেসে উঠবে। অর্থাৎ মানসচক্ষে আল্লাহর নিদেনপক্ষে একটি আবছা কল্পিত রূপের প্রতিচছবি ভেসে উঠবে।

হার্ভার্ড কিংবা কেমব্রীজে লেখাপড়া করা একজন মুসলিম এবং বাংলাদেশের বরগুনার কোন মাদ্রাসায় লেখাপড়া করা এতিম ছাত্রটির মনজগতে দেখা আল্লাহর রূপটি কি এক? হতে পারে এক, আবার নাও হতে পারে। লিখন বিষয়টি নিশ্চিত নয়। যদি এক না হয়, তবে মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও মনজগতে কি দু'জন একই আল্লাহর উপাসানা করছে? হতে পারে একই ধর্মে অবস্থান করছে, অথচ মনজগতে ভিন্ন ভিন্ন কল্পিত প্রতিচছবির উপাসনা করছে।

এমনও হতে পারে যে, দু'জন মুসলিমের মনজগতে সৃষ্টি হওয়া স্রষ্টার ধারণা সম্পর্কিত কল্পিত প্রতিচছবিটি মিলছে না, অথচ কাকতালিয়ভাবে কোন হিন্দু কিংবা কোন ইহুদীর সাথে মিলে যাচেছ। তাহলে কে কাকে উপাসনা করছে? মনজগতে কে হিন্দু, কে মুসলিম, কে ইহুদী কিভাবে নিশ্চিত হবে লিখন? লিখন ভাবে মনজগতে কে কাকে উপাসনা করে যাচেছ কেউ তা জানে না।

এদিক থেকে সরস্বতী পূঁজারী ভাল অবস্থানে আছে। তারা পূঁজার সময় মনজগতে সবাই একই প্রতিচছবির পূঁজা করে। কিন্তু তারা কি সরস্বতীর সঠিক রূপের পূঁজা করে? যে রূপটি সচরাচর দেখা যায় সেটিই কি সরস্বতীর প্রকৃত রূপ? এটা তো মানবের নিজের তৈরী করা বা মনগড়া কোন এক রূপ। এটা কি নিশ্চিত যে কোন ভূল প্রতিচছবির পূঁজা করা হচ্ছে না? যদিও সরস্বতী সৃষ্টিকর্তা, বিধাতা বা পরমেশ্বরের সম পর্যায়ের নয়। বিবিধ রূপের দেবতাদের এমনিতর উপাসনা করার বিষয়ে গীতা বলছে-

"যাদের মন বস্তুগত কোন কিছু প্রাপ্তির প্রত্যাশায় বিচ্যুত, তারা বিবিধ দেব-দেবতায় নিজেদেরকে সমর্পন করে এবং প্রাপ্তির প্রত্যাশা থেকে তারা তাদের নিজস্ব প্রকৃতি অনুসারে নির্দিষ্ট বিধি-বিধান অনুসরণ করার মধ্য দিয়ে সেইসব দেবতাদের উপাসনা বা ভজনা করে। .. আমি সকলের হৃদয়ে বিরাজ করি। কিন্তু যখন কেউ কোন দেব-দেবীর উপাসনা করতে ইচ্ছে করে, আমি সেখানেই তার বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করে দেই, যেন সে কোন নির্দিষ্ট উপাস্যতে একান্তভাবে নিজেকে নিয়োজিত রাখে। তেমন বিশ্বাসে নিজেকে নিয়োজিত করে, ভক্ত কোন নির্দিষ্ট দেব-দেবীর

আনুকূল্য কামনা করে এবং তার কাম্য বা প্রত্যাশিত বিষয় বা বস্তু লাভ করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সকল সুবিধা, অনুগ্রহ বা কাম্য বস্তু আমি একাই প্রদান করি। স্বল্প জ্ঞানের মানুষ দেব-দেবীদের উপাসনা করে ...।" (গীতা ৭:২০-২৩)

".. ভক্তিপূর্বক যারা অন্যান্য দেবতাদের পূঁজা করে বা কিছু উৎসর্গ করে, তা আসলে আমাকেই করে, কিন্তু এটি করে বিষয়গুলি সত্যিকারভাবে না জেনে-বুঝে।" (গীতা ৯:২৩)

যারা বিবিধ দেবতাদের উপাসনা বা পূঁজা করে তাদের বিষয়ে কোরআনেও এভাবে বলা হয়েছে যে,

"... যারা আল্লাহ ব্যাতিত অপরকে (বিবিধ দেব-দেবীদেরকে) উপাস্যরূপে গ্রহণ করে তারা বলে যে, আমরা তাদের উপাসনা করি এজন্য যে তারা যেন আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে নিয়ে আসে। তারা যে বিষয়ে মতপার্থক্য করছে আল্লাহই তার মিমাংসা করবেন। ...।" (আল-কোরআন ৩৯:৩)

দেব-দেবতার উপাসনা করা এবং আল্লাহ বা পরমেশ্বরের উপাসনা করা এক নয়। মানুষ তবে বিধাতার কোন রূপের উপাসনা করবে? এ এক বিরাট প্রশ্ন। গীতায় বলা হয়েছে, অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের কাছে জানতে চাইছে-

"হে ভগবান! কি রূপে আমি তোমাতে ধ্যানগ্রস্ত হব? কোন কোন বিবিধ প্রকারের আকৃতিতে আমি তোমার প্রতি মনোনিবেশ করব?" (গীতা ১০:১৭)

".. কোনটি অধিক সঠিক? যারা তোমার (ব্যক্তিক রূপের) আরাধনা করে তারা, নাকি যারা ইন্দ্রিয়াতীত তোমার অপ্রকাশিত ও নৈর্ব্যাক্তিক (নিরাকার) ব্রহ্মাকে উপাসনা করে তারা? ভগবান বলেন: যার মন আমার ব্যাক্তিকরূপে নিবিষ্ট এবং আমার উপাসনা করে, যথাযথতার দিক থেকে আমি তাকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করি। কিন্তু যারা ... আমার অপ্রকাশিত রূপ যা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যতার অতীত (নিরাকার), যা সবকিছুকে পরিব্যাপ্ত করে আছে, যাকে ধারণা-কল্পনা করা যায় না, ধ্রুব ও নিশ্চল- পরম সত্যের সেই নৈর্ব্যাক্তিক বা নিরাকার স্বরূপকে উপাসনা করে, তারা অবশেষে আমাকে লাভ করে। ... (তবে) যারা ভগবানের নৈর্ব্যাক্তিক রূপে অনুরক্ত, তাদের পক্ষে সে পথে অগ্রগমন কষ্টকর। কেননা দেহবিশিষ্টদের জন্য অব্যাক্তের (নিরাকারের) উপাসনা দুরূহ বা কঠিন হয়" (গীতা ১২:১-৫)

বস্তুত আল্লাহ, ভগবান, ঈশ্বর, গড স্রষ্টা সম্পর্কিত বিবিধ ধারণা কতগুলি গুণবাচক বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত। এসব গুণাগুণের পার্থক্য কেবল কতগুলো

বইয়ের পাতায় পাতায় লিখিত রয়েছে। লিখিত অক্ষরগুলি মনে কিংবা মুখে বারবার উচ্চারণ করার মধ্য দিয়ে আমরা স্মৃতিতে ধারণ করি। যার যার স্মৃতির গন্ডির মধ্যে বারবার আওড়াতে গিয়ে তার তার ভক্তি গড়ে ওঠে এবং ভক্তি থেকে বিশ্বাস বাসা বাঁধতে থাকে। মানুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, সে নিজ বিশ্বাসের গন্ডির বাইরে যেতে চায়না। কখনও কখনও পারেও না।

একেকজনের হৃদয়ে গেঁথে থাকা বইয়ের পাতার সে অক্ষরগুলির পার্থক্য নিয়ে বিভাজিত মানুষ! বিভাজন সবসময় খারাপ তা বলা যাবে না। এক সময়ের প্রয়োজনে সেটাই সঠিক এবং প্রয়োজনীয় কিংবা বলা যেতে পারে স্বাভাবিক ছিল। এখনকার বাস্তবতায় প্রয়োজন সমন্বয়। তার জন্য মানসিকভাবে মানুষের প্রস্তুত হওয়ারও প্রয়োজন আছে। মুখোমুখি সমাজে এ বিভাজন কখনও কখনও সংঘাতময়। শিক্ষার অসাম্য এর পেছনে বড়ভাবে দায়ী।

অশিক্ষা ধর্মের মর্মকে অনুধাবন করার পথে প্রধান অন্তরায়। তাই ধর্ম নিয়ে এত হানাহানি। ধর্ম নিয়ে ব্যবসা। ধর্ম যা বলতে চায় সে সত্য আজও অনাবিস্কৃত। কিংবা যে সত্য প্রকাশ করতে হলে স্বার্থ ত্যাগ করতে হয়, সে ত্যাগে সত্যিকারভাবে মানুষ আজও প্রস্তুত নয়। মানুষ অভিনয় দিয়ে জীবন পার করেই তুষ্ট। যেখানে একদিন ছিলাম না, আবার ক'দিন পর নিশ্চিতভাবে থাকব না জানি- এ দু'সময়ের মধ্যের সময়টুকু সত্যকে পাশ কাটিয়ে একটু বেশী খেয়ে, বেশী পেয়ে কি এমন লাভ? লক্ষ্যচ্যুত এমন জীবন!

স্রষ্টার গুণাবলি সম্পর্কিত সঙ্গা ও তালিকার পার্থক্য এবং কিছু রিতি-নীতির পাথর্ক্যের কারনে মানুষ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী। অথচ গ্রন্থগুলো বলে এক মানব থেকে সৃষ্ট মানুষ। যুক্তি এবং বাস্তবতাও তাই বলে। সে হিসেবে সকলেই একে অন্যের সাথে বিনিসূতোর মালা দিয়ে গাঁথা। আদি পিতা এক। সকলের স্রষ্টা এক। তাহলে কল্পিত প্রতিচছবি, কিছু গুণাগুণের সূক্ষ-সূক্ষ পার্থক্য, আচার-রিতি-নীতির সূক্ষ-সূক্ষ পার্থক্যে মানব জাতির বিভাজন সত্যিকারের শিক্ষিত মানবের কাছে কিভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে? অথচ শিক্ষিতরাই এ বিভাজনের স্রষ্টা। অগ্নি-সংযোগকারীরা কেবল অনুসারি।

ভাইয়ে ভাইয়ে স্বার্থ নিয়ে দন্দ্ব হয়। সেটি অসাম্য ও অন্যায্য বন্টন থেকে হয়। সেটি প্রকাশিত। সত্যটি সবাই জানে। মেনে নেয়া যায়। কিন্তু মনজগতে সৃষ্ট স্রষ্টার কল্পিত রূপ-গুণ, ধর্মীয় আচার-রিতি-নীতি নিয়ে সংঘাত মেনে নেয়া যায় না।

যদিও সবাই জানে এগুলোর পেছনেও সেই জাগতিক নানান একই জটিল স্বার্থই জড়িত। মুখ ফুটে সেই স্বার্থের কথাটি প্রকাশ্যে বলে দেয়াই সততা। নিজ স্বার্থ হাসিলে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, দেশ, ভাষা, পতাকা এগুলোকে কাজে লাগানো প্রত্যাশিত নয়। বস্তুত স্রষ্টাকে জানা ও বোঝার ক্ষেত্রে মানবের দৌড়ের সক্ষমতা সম্পর্কে স্রষ্টা নিজেই বলেন-

"... তিনি বস্তুগত অনুভূতিতে দেখা বা জানার সক্ষমতার বাইরে ..." (গীতা ১৩:১৬) "... সকল জীবন্ত সত্ত্বা সম্পর্কেই আমি অবহিত অথচ কেউই আমার সম্পর্কে অবহিত নয়।" (গীতা ৭:২৬)

"ধারণা/কল্পনা/দৃষ্টি/অন্তর্দৃষ্টি তাঁকে অনুধাবনও করতে সক্ষম নয়, অথচ তিনি সকল ধারণা/কল্পনা/দৃষ্টি/অন্তর্দৃষ্টি সম্পর্কেই জ্ঞাত ...।" (আল-কোরআন ৬:১০৩)

কল্পিত জটিলতা পরিহার করে সহজ-সরল-সোজা পথে যেন মানুষ চলতে পারে, মহান সৃষ্টিকর্তা সে বাস্তবতার পথ ধরে চলতে সহায়তা করুন।

"নিশ্চয়ই! তোমাদের এই জাতি/ধর্ম এক জাতি (মানবজাতি)/ এক ধর্ম (সমর্পন/ইসলাম) এবং আমি তোমাদের পালনকর্তা, অতএব আমার প্রতি তোমাদের কর্তব্য পালন কর। কিন্তু মানুষ তাদের ধর্মকে নিজেদের মধ্যে বহুধা বিভক্ত করেছে। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উল্লসিত। অতএব তাদেরকে তাদের অজ্ঞতায় নিমজ্জিত থাকতে দাও কিছু কালের জন্য।" (আল-কোরআন ২৩:৫২-৫৪)

"নানারূপ ধর্ম পরিত্যাগ কর এবং কেবলমাত্র আমার প্রতি নিজেকে সমর্পন কর। আমি তোমাকে সকল পাপ থেকে মুক্ত করে দেব। এ বিষয়ে দুঃশ্চিন্তা বা ভয় কর না।" (গীতা ১৮:৬৬)

"আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পন ব্যতিত যে ধর্মের সন্ধান করে, তা গৃহিত হবে না এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবে। " (আল-কোরআন ৩:৮৫) (লেখা ২০১৩)

ওরশিপ বা উপাসনা

(Worship)

এ জগৎ সত্যের ভিত্তির ওপর দাড়িয়ে আছে। সত্যকে ভিত্তি করে সৃষ্ট। সত্য কি? সত্য হচ্ছে সেটি, যা একদম সঠিক। যার ব্যাত্যয় হতেই পারে না। যদিওবা কখনও ব্যাত্যয় হয়, তবে তার মাঝেও আরেক সত্য লুকিয়ে থাকে। সত্য বা সঠিকতার কোন শর্ত ছাড়া কোন কিছু ঘটতে পারে না। সত্য পদার্থ, রসায়ন, জীব বিজ্ঞান- এক কথায় বিজ্ঞানের সূত্রগুলির মত। সূত্র ছাড়া কিছু ঘটে না।

যিনি এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, তিনিই সত্যের স্রষ্টা। তিনি মহাজ্ঞাণী, বিজ্ঞানী। তিনি যখন কোন দিক নির্দেশনা দেন, তখন তার ভেতরে সত্য লুকিয়ে থাকে। কখনও বুঝতে পারি, কখনও পারি না বা বোঝার চেষ্টায় রত থাকি।

স্রষ্টা নানান প্রকার উপাসনা পালন করার নির্দেশনা দিয়েছেন। নিশ্চয়ই এর পেছনে কোন কারন আছে। আছে কোন সত্য। কিন্তু এতকিছু বোঝা বা জানার অনর্থক প্রয়োজনীয়তা কি? বিশ্বাস করলেই তো হল।

এটা সত্য যে, না বুঝে বিশ্বাস করে নিলেও সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। বিধাতা মানুষকে এত অলস সময়ও দেননি যে, তারা এসব নিয়ে বাড়তি ভাবনা ভাববে। তবে কিছু আছে অনুসন্ধানি মন। যারা জানতে চায়। তাদেরকেও অনুপ্রাণিত করেন সেই একইজন! এ জগতে বিবিধ প্রকারের মানুষের একজন অপরজনকে বোকা কিংবা নির্বোধ ভাবে। এ নিয়ে বিবাদ কিংবা উপহাসের প্রয়োজন কি? প্রত্যেকে তার নিজের মত চলতে পারলেই হল।

সৃষ্টিকর্তা মানুষকে উপাসনা পালন করার নির্দেশনা দিয়েছেন। কেন বলেছেন? কোন কোন মানব হৃদয় এমন অপ্রয়োজনীয় জটিল প্রশ্নেরও উত্তর খুঁজতে আপনা থেকে ছুটে যায়। যদিও কারও কাছে বিষয়গুলি অপ্রয়োজনীয়, তবে সবার কাছে নয়। তাইতো পৃথিবীর এত অগ্রগতি! তবে এটাও সত্যি যে, যারা এমন সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে মাথা ঘামাতে চায়, তাদেরকেও বাস্তবতা বাঁধা দেয়। তবুও অনুসন্ধানি আত্মা সুযোগ খোঁজে। প্রশ্নের উত্তর জানতে চায়। কেন এমন হয়? এখানেও আরেক সত্য বা সূত্র বা নিয়ম আছে। সর্বত্র সত্যের ছড়াছড়ি। যে সত্যের স্রষ্টা স্বয়ং বিধাতা।

সৃষ্টিকর্তা নানা প্রকারের উপাসনা পালনের নির্দেশনা দিয়েছেন। এ সবই দিয়েছেন জগত ও সমাজের মঙ্গলের জন্য। জগত ও সমাজ ভাল থাকে 'প্রাণের' কার্যাবলীর মাধ্যম হয়ে। তাই বলা যায় মানুষকে ভাল হয়ে চলার জন্য এতসব নির্দেশনা। অন্যকথায় মানুষকে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য এসব নির্দেশনা।

উপাসনা স্রষ্টাকে স্মরণ করিয়ে রাখে সর্বক্ষণ। ফলে তার নির্দেশ ও বিধি-নিষেধগুলো মানুষকে প্রতিনিয়ত স্মরণ করিয়ে দেয় উপাসনা। ধরে নেয়া যায় যে, নির্দেশনার স্মরণে মানুষ মন্দ পথ থেকে দুরে থাকবে। আর তাই এ সম্পর্কিত সকল বিষয়ে বিশ্বাস গুরুত্বপূর্ণ। এটিও এক সূত্র। বিশ্বাস ভিন্ন আবার অপরাপর সূত্র কাজ করবে না। লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে না।

এতসব নিয়ম-বিধির পরেও কিছু মানুষকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা যায় না। তাদের মধ্যে লোভ, রাগ, হিংসা, বিদ্বেষ, অসুস্থ প্রতিযোগীতা- যা কোন না কোন লোভ থেকে সৃষ্ট, সেই কু-প্রবৃত্তিগুলো মাত্রায় অধিক। কিংবা যে জ্ঞান এসব প্রবৃত্তি থেকে দুরে সরিয়ে রাখবে তার মাত্রা কম। তা সত্ত্বেও পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষকে ভাল পথে ধরে রাখে বিশ্বাস ও উপাসনা। এ দুটো না থাকলে এর প্রয়োজনীয়তাকে মানুষ অধিক উপলব্ধি করতে পারত। মানুষ উদ্ভ্রান্ত হয়ে পথের সন্ধান করে বেড়াত। যেমন পূর্বপুরুষেরা করেছে।

সৃষ্টিকর্তা মানুষকে উপাসনার নির্দেশনা দিয়েছেন পার্থিব জীবনে ভাল হয়ে চলার জন্য। কেবল এতটুকুই কি সত্যি বা সব? মানুষ তো যথেচ্ছাচার করে অধিক পার্থিব আনন্দ ভোগ-উপভোগ করতে পারে। ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে তাহলে কেন মানুষ নিজের আনন্দকে বিসর্জন দিয়ে ভাল হয়ে চলতে যাবে? মানুষ ভাল হয়ে চললে উপকারীতা কি? যেতে হবে আরও গভীরে।

আল্লাহর সৃষ্টি এখানে মূখ্য বিষয়। সৃষ্টিকে সৃষ্টি করা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টিকে ধরে রাখা বা এর যথাযথ রক্ষনাবেক্ষন। কেবল মানুষের ভোগ-উপভোগের জন্য মানুষকে আল্লাহ সৃষ্টি করেননি। সৃষ্টিকে এই ধরে রাখার কাজে সকল 'প্রাণ' বা প্রাণী নিয়োজিত। সকলের কাজের মাঝে অদৃশ্য যোগ-সাজশ আছে। সব একত্রিত হয়ে এক লক্ষ্যে ধাবিত।

যে কোন মন্দ বা নিয়ম বিরুদ্ধ কাজই সৃষ্টিতে ভারসাম্য ক্ষুন্ন করে। সেটা অতি সূক্ষ থেকে শুরু করে বৃহত্তম যে কোন পর্যায়েই হোক না কেন। এই

ভারসাম্যহীনতা আল্লাহর সৃষ্টিকে ঘুণে ধরার মত খেতে থাকে। যার সর্বশেষ পরিণতি ধ্বংস। সৃষ্টিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যই বিধাতার এত নির্দেশনা। বহু সংখ্যক মানুষকে সঠিক পথে ধরে রাখা বা চালানো সহজ কাজ নয়। উপাসনা সে কাজকে সহজতর করে দেয়। উপাসনা অধিকাংশ মানুষকে নিয়মের মধ্যে ধরে রাখে স্বতঃস্ফুর্ততার সাথে।

সৃষ্টিকর্তার নিদর্শন বাস্তবে মানুষের ব্যাবস্থাপনায়ও প্রতিফলিত হয়। আইন-কানুন, সংবিধান, বিচার-ব্যবস্থা, প্রশাসন, নানান সব আয়োজন বিধি-বিধান এ সবই বিশৃংখলা বা ধ্বংসের হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করার জন্য। যা সামাজিক ভারসাম্যকে ঠিক রাখে। সমাজ ঠিক না থাকলে সৃষ্টি ঠিক থাকবে না। তাই এসবই সামাজিক তথা জাগতিক ভারসাম্যকে রক্ষা করে, তথা সৃষ্টিকে ধরে রাখে। ধ্বংসের হাত থেকে সৃষ্টিকে রক্ষা করে। বাস্তব জীবনে সুখ-সাচছন্দ ভোগ-উপভোগ, প্রটোকল বা সামাজিক মর্যাদা অর্জন বা রক্ষা করা- এসব কাজগুলি মূখ্য বিষয় নয়, গৌন। তবে বাস্তবতার কারনে এগুলিও প্রয়োজনীয় বা কখনও অপরিহার্য। ফলে উপাসনা থেকে শুরু করে এ সব কিছুই আল্লাহর সৃষ্টিকে ধরে রাখার জন্য। সব কাজই উপাসনার অন্তর্ভূক্ত।

"যে পরমেশ্বর সকল জীব-সত্ত্বার উৎস এবং যিনি সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত, মানুষ তার নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার মধ্য দিয়ে তাঁর উপাসনা করে পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে।" (গীতা ১৮:৪৬)

একটা উদাহরন তুলে ধরি। সামাজিক-অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা দুর করার জন্য যাকাত প্রদানের কথা বলা হয়েছে। এটিও উপাসনার অন্তর্ভূক্ত একটি বিষয়। পৃথিবী কতদিন টিকে থাকবে? জানা নেই। ধরে নেই কোটি বছর পর এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হল যে, দারিদ্রতা কমে এসেছে। যাকাত দেয়ার বা নেয়ার মত মানুষ খুঁজে পাওয়া যাচেছ না। কেউ ভিক্ষে কিংবা যাকাত-ফেতরা নিতে ইচ্ছুক নয়। তখন এই উপাসনার কি হবে? কিভাবে পালিত হবে? জোর করে কিছু মানুষকে কি দরীদ্র বানিয়ে রাখা হবে, এ উপাসনা পালন করার জন্য?

আরেকটি উদাহরন তুলে ধরি। কাবার পূর্ব দিকের মানুষ পশ্চিম দিকে ফিরে নামাজ আদায় করে। দক্ষিনের মানুষ উত্তরে। কেন্দ্রের মানুষ কোন দিকে ফিরবে? এ উদাহরণটি কেন তুলে ধরা হল? অর্থাৎ কখনও কখনও, কোথাও কোথাও বা কোন একটা অবস্থায় সার্বজনিনভাবে স্বীকৃত ও পালিত নিয়ম বা বিধানের অনেক

শর্তের আর প্রয়োজনীয়তা থাকে না, অথবা সাধারণ শর্ত থেকে ভিন্ন শর্ত বা ধরণ-ধারণ প্রযোজ্য হয়, বা কোন শর্তই প্রযোজ্য হয় না।

সকল উপাসনার মূল লক্ষ্য হলো ভাল হয়ে চলা। ভাল হয়ে চলারও একটি লক্ষ্য আছে। আর তা হল সৃষ্টিকে যথাযথভাবে চলতে সহায়তা করা। যে ব্যাক্তি উপাসনা ছাড়াই ভাল হয়ে চলতে বা থাকতে পারে, তার ক্ষেত্রে উপাসনার সাধারণ নিয়মজনিত বিষয়টির কি হবে? অর্থাৎ উপাসনার নিয়ম পালনের লক্ষ্যের কেন্দ্রে যার উপস্থিতি তার কথা বলছি। বলা হচ্ছে,

"... কেবলমাত্র সর্ব-সাধারণের শিক্ষাদানের জন্য হলেও তুমি তোমার জন্য নির্দেশিত দায়িত্ব পালন করা উচিৎ।" (গীতা ৩:২০)

পাঠক, লেখাটি পড়ে কেউ উপাসনা ছেড়ে দিতে উৎসাহিত হবেন না। বিশ্লেষন করবেন। হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করবেন। পছন্দ না হলে বুঝে নেবেন যে, কেউই লেখাটি পড়তে বাধ্য করছে না।

মূল কথায় আসি। সবই পশু বা পাখি বা গাছ। কিন্তু এসবের মধ্যেও আছে নানান প্রকারভেদ। আবার পশুর মধ্যে যদি কেবল হরিণকেই ধরে নেই; পাখির মধ্যে কেবল কাক, কিংবা গাছের মধ্যে কেবল কচু গাছকে ধরে নেই- তথাপি সেখানেও আছে নানান প্রকারভেদ। প্রকারভেদের কারনে প্রত্যেককে এবং প্রত্যেকের কর্মকে পৃথকভাবে চেনা ও জানা সহজ হয়ে যায়। এসব প্রকারভেদে যেমন আছে বাহিরের দৈহিক বা গঠনগত পার্থক্য, তেমনই আছে ভেতরে চরিত্রগত পার্থক্য।

ওপরের একই নিয়মে বা সূত্রে দেখতে সবই একই রকম মানুষ; কিন্তু পার্থক্য আছে। পার্থক্য আছে ভেতরে ও বাইরে। প্রত্যেকেই ভালবাসে; যেমন মা-বাবাকে ভালবাসে। কিন্তু সব সন্তানের ভালবাসার প্রকাশ এক রকম নয়।

"তুমি কি দেখনি যে, নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলে যারা আছে তারা এবং উড়ন্ত পক্ষীকুল তাদের পাখা বিস্তার করে আল্লাহর মহিমা প্রকাশ করে? প্রত্যেকেই তার উপাসনা ও মহিমা প্রকাশের পদ্ধতি জানে।" (আল-কোরআন ৪১:২৪)

"তুমি কি দেখনি, আল্লাহকে সেজদা করে যা কিছু আছে নভোমন্ডলে এবং যা কিছু আছে ভূ-মন্ডলে- সূর্য্য, চন্দ্র, তারকারাজি, পর্বতমালা, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং মানুষের মধ্যে অনেকে ...?" (আল-কোরআন ২২:১৮)

"নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলে যা কিছু আছে, প্রত্যেকেই আল্লাহর সেজদায় পতিত হয় ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায়, ঠিক যেমন তাদের ছাঁয়া সকালে ও সন্ধ্যায় পতিত হয়। (সৃষ্টির সূত্র বা নিয়মটিই এমন যে, এটি হতে বাধ্য, যদিও অনেকে তা উপলব্ধি করতে পারে না।)" (আল-কোরআন ১৩:১৫)

"সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং এসবের মাঝে যা কিছু আছে সবই তাঁর মহিমা প্রকাশ করে এবং এমন একটি কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা প্রকাশ করে না। কিন্তু তাদের মহিমা প্রকাশকে তোমরা উপলব্ধি বা অনুধাবন করতে পার না।" (আল-কোরআন ১৭:৪৪)

দেহের ওঠা-নামা কিংবা আঁকা-বাঁকাকরণই কেবল উপাসনা নয়। অনেক মানুষের পরিচালনা ও শৃংখলার জন্য এগুলি কিছু নিয়ম বা পদ্ধতি। এসবও থাকতে হবে। কিন্তু তাতে সত্যিকারভাবে 'যে আমি' দেহ থেকে পৃথক, তার উপাসনার যথাযথতা জানা ও বোঝা যায় না।

পাঠক, প্রত্যেককে তার নিয়মমাফিক উপাসনা করে যেতে হবে। এটাই জীবনের লক্ষ্য। কেবল বুঝতে হবে- যাকে উপাসনা করতে দেখি না, সেও উপাসনায় রত। সর্বক্ষণ রত। ধন্যবাদ।

সার্থকতা

(Success)

ক'দিন আগে পৃথিবীতে ছিলাম না। আজ আছি। কেন আছি ? জানিনা। কে পাঠালো? জানিনা। আবার ভবিষ্যতে থাকবো না। এতটুকু জানি। এটা নিশ্চিত।

জীবনের সার্থকতা কোথায়? কি আমার করণীয়? আমি কি আমার নিজের ইচ্ছায় এখানে অবস্থান করছি? যদি তা না হয়, তবে কি আমি কেবল আমার নিজের প্রয়োজনে এখানে অবস্থান করছি? যদি তাও না হয়, তবে আমার এ পৃথিবীতে উপস্থিতিটা কার প্রয়োজনে? কোন প্রয়োজনে?

আমি কি আমাকে সৃষ্টি করেছি? উত্তর না। যে সৃষ্টি করেছে তাহলে প্রয়োজনটা তার। তবে কি তার নির্দেশ মেনে চলা ও সে অনুসারে জীবন-যাপন করাটাই যুক্তিযুক্ত নয়?

প্রশ্ন হচ্ছে, তার নির্দেশটা কি? কোথায় খুঁজে পাবো সে নির্দেশনা? কোরাআনে? বাইবেলে? গীতায়? না আরও অন্য কোথাও? কে সঠিক? কোনটা সঠিক? যত যুক্তি, যত তর্কই হোক না কেন- মানতে না চাইলে জ্ঞানীও মানে না, মানতে না চাইলে মূর্খও মানে না। এখানে এসে জ্ঞানী আর মূর্খের জ্ঞান সমান।

আমার নিজেরতো কোন প্রয়োজন ছিল না এখানে আসার। আসলে প্রয়োজন ছিল কি ছিল না তাও জানিনা। কেননা পূর্বের কোন স্মরণ বা স্মৃতি আমার মাঝে নেই। তাই ভাল-মন্দ কিছুই বুঝতে পারি না। প্রয়োজনও বুঝতে পারি না। জন্মের পূর্বের জ্ঞান থাকলে ভাল হত। বুঝতে পারতাম। এ জনমের পূর্বে আদৌ কি আমার কোন অস্তিত্ব বা স্মৃতি ছিল?

স্রষ্টা যা করেন ভালর জন্যই করেন। তিনি যা বোঝেন আমরা তা বুঝি না। পূর্বের কোন বিষয়াবলী স্মরণশক্তিতে এলে- দেখা যাবে আমরা আমাদের স্বভাবসুলভ বর্তমানের কাজ ফেলে এক প্রতিশোধপরায়ন অন্তর নিয়ে পূর্বের শত্রুর পিছু নিয়েছি। আমরা বর্তমানের কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলতাম। অনেক বড় সমস্যার মূল এই 'স্মৃতি'। হয়তো তাই পূর্ব স্মৃতিবিহীন এক নতুন সৃষ্টি আমরা।

একান্তই নিজস্ব ভাবনা এটি। আমার কোন প্রয়োজন ছিল না এখানে আসার। বরং এখানে চলে আসার কারনে আমার কিছু অপ্রয়োজনীয় প্রয়োজনীয়তার সৃষ্টি হয়েছে।

সার্থকতা

আজ আমার খাবার প্রয়োজন। লজ্জা নিবারনের প্রয়োজন। একটা বাসস্থান প্রয়োজন। জ্ঞান আহরণ প্রয়োজন। চিকিৎসার প্রয়োজন। বিনোদনের প্রয়োজন। সর্বপরি এ সবের জন্য অর্থের প্রয়োজন। সে কারনে একটা কাজও প্রয়োজন। কাজের প্রয়োজনে দক্ষতা প্রয়োজন। এসবের কিছুই ছিল না প্রয়োজন, যদি না জন্ম হতো। শত কোটি প্রয়োজনের ভিড়ে প্রতিদিন প্রাতঃকালে নাভিশ্বাঃসে ছুটে চলি। একবার ভাবরারও সময় পাই না কেন ছুটে চলি।

যাদের কারনে ছুটে চলি তারা ভাববার সময়টিও দেয় না। পাছে কাজের লোকটি হারিয়ে যায়। আমার জন্য তারা ভাবে। তারা তাদের মত করে আমাকে ভাবতে শেখায়। সমাজে এমন নিয়মাবলীর সৃষ্টি করা হয়- যেগুলি ছোঁয়ার আশায় ছুটতে ছুটতে জীবনের আয়ু ফুরিয়ে যায়। চটকদার বিজ্ঞাপনী জীবনের পিছু ছুটতে ছুটতে জীবন শেষ হয়ে যায়। জীবনের সার্থকতা কিসে? পৃথিবীতে যে বা যারা মালিক সেঁজে বসে আছে, তার বা তাদের ফুট-ফরমায়েশ খাটাই কি জীবনের একমাত্র লক্ষ্য? তাদের মুখ থেকে নিঃসৃত একটি প্রশংসাসূচক শব্দই কি জীবনের অনেক প্রাপ্তি?

কেন ছুটে চলি? শুধুই কি জীবনটা ধারণের জন্য? একটু খাবার জন্য? একটু ঘুড়ে বেড়াবার জন্য? পারিপার্শ্বিক মানুষগুলোর কাছে নিজেকে একটু বড় মাপের মানুষ হিসেবে ফুটিয়ে তোলার জন্য? ইদানিং আরও যেটা যোগ হয়েছে- ‘সেলফি’। সেলফি তুলে ঘন্টা পর পর স্ট্যাটাস দেয়ার জন্য?

একটা দর্শন অনেক প্রয়োজন সৃষ্টি করে। একটা দর্শন অনেক প্রয়োজনীয় কিছুকে অপ্রয়োজনীয় করে তুলতে পারে। মানুষের অনেক কষ্টের কারনের সৃষ্টি কেবল তার নিজের ‘এক টুকরো চিন্তা’। আবার তার নিজের এক টুকরো চিন্তাই পারে তাকে অনেক কষ্টের হাত থেকে মুক্তি দিতে।

একটার পর একটা আকাংখা। আকাংখার পিছে ছুটে চলেছি সবাই। শৈশবে এক রকমের আকাংখা। যৌবনে আরেক রকম। পরিণত বয়সে পরবর্তী প্রজন্মের চিন্তা। আরেকটা রকম। অধিকাংশ সাধারণ মানুষের জীবনের প্রাথমিক চরম লক্ষ্য হলো একটি ‘বাড়ী’ তৈরী করা। তারপর মৃত্যু হলেও প্রশান্তি। যদি সে বাড়ীতে একরাত ঘুমুতে নাও পারি, তবুও।

একটা বাড়ি রেখে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ায় কি সার্থকতা আছে? একটা আলীশান বাড়িতে কিছুদিন কাটিয়ে সেই অন্ধকার মাটির নীচে চলে যাওয়ায় কি

বাড়তি পাওনা অছে? বরং সাধু-অসাধু নানান উপায়ে এটি অর্জন করতে গিয়ে জীবনকে ক্ষয় করে ফেলা।

ক্ষণস্থায়ী কিছু প্রাপ্তি আছে। প্রাপ্তিটা নিজের না। অজ্ঞতার কারনে অন্যের দেয়া। একটা বাড়িওয়ালা-গাড়িওয়ালাকে অন্যেরা অনায়াসেই মর্যাদা দিচেছ। ন্যায়-অন্যায়েরও ধার ধারছে না। এই প্রাপ্ত মর্যাদা-ক্ষমতা-আনন্দ ক্ষণিকের। মাটির সাথে মিশে গেলে কিছুই থাকবে না। তবে কিসের পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছি- ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠাকে বিসর্জন দিয়ে?

কখনও ছুটে চলেছি স্ত্রীর মুখে এক চিলতে হাসি ফোটাবার জন্য। কখনওবা সন্তানের মুখের হাসি। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের কাছে একটু বড় প্রমাণিত হওয়া। ক্ষণিকের একটু আত্মতৃপ্তি। অথচ অধিক কষ্টের প্রাপ্তি এদের কাছ থেকেই, যদিও ভাগ্যবান কেউ কেউ সেটি পায় না। এমনি কিছু ক্ষণিকের প্রাপ্তির আশায় সবাই ছুটে চলেছে।

এমনি কিছু প্রাপ্তির আশায় একদিন আলেকজান্ডার ছুটেছে। নবাব সিরাজুদ্দৌলাও ছুটেছে। সম্রাট শাহজাহান ছুটেছে। কি প্রাপ্তি ঘটেছে? যাদের জন্য ছুটে চলা বলে প্রকাশ করা হয়, এক সময় তারাই আঘাত করে কোন শত্রুর প্রয়োজন হয় না। যদিও ভেতরে নিজের বড় হওয়ার লোভটাই কাজ করে বেশী। তবে কখনও কেউ আবার পরিস্থিতীর স্বীকার। বস্তুত কোন লক্ষ্য অর্জনের পেছনে ছুটে চলেছি আমরা?

আজ তারা কোথায়? আলেকজান্ডার, সিরাজুদ্দৌলা কিংবা সম্রাট শাহজাহান? তাদেরকে কেউ আজ চেনে না। সমসাময়িক সময়ের মানুষের চোখের সামনে মর্যাদার স্বীকৃতি প্রাপ্তির আশায় ন্যায়-অন্যায় কত কিছুই না ঘটাতে হয়েছে। আজ কে চেনে তাদের? জানে কেবল নামটি। নামের লোকটিকে কেউ জানেনা। চেনে বইয়ের পাতায় আঁকা ছবিটিকে। তাহলে সিরাজের কষ্ট করার প্রয়োজন কি ছিল? কোন এক কলিমুল্লাহকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়ে বইয়ে ঐ ছবিটি ছাপিয়ে দিলেই তো হল। সিরাজকে কষ্ট করে জীবন দিতে হত না।

যত শ্রম, যত কষ্ট নিজের লোভের কারনে। নিজের প্রাপ্তির আশায়। গাড়ি-বাড়ি, ধন-সম্পদ, ঐশ্বর্য্য-ক্ষমতা-মর্যাদা ক্ষণিকের! যখন ছিলাম না তখন এ ঝামেলা ছিল না। যখন থাকবো না তখনও এ ঝামেলা থাকবে না। মাঝখানের

সময়টুকুতে যত ঝামেলা। সবাই এ ঝামেলাটুকু পরিত্যাগ করতে পারে না। পারে না কারন স্রষ্টা সেভাবে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

পরিবেশের ক্রিয়ায় মানুষ প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে। তারপর আঠার মত জড়িয়ে যেতে থাকে একের পর এক আকাংখায়। যে আকাংখা কোনদিন ফুরোবার নয়। মানুষ ভূলে যেতে থাকে নিজেকে। অন্যের প্রদত্ত উৎসাহ বা দেখানো পথ তখন জীবনের হাল ধরে। নিজের জীবন আর নিজের হাতে থাকে না। এতদসত্ত্বেও কেউ ভাল থাকতে পারে, কেউ পারে না। এগুলোই পরীক্ষা।

সৃষ্টি যদি নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারে, তবে সহজেই বুঝতে পারে স্রষ্টারও সৃষ্টির কোন লক্ষ্য আছে। সে লক্ষ্য কারও জানা নেই। হয়তোবা জানা সম্ভবও নয়।

তাই তাঁর কাছে আত্মসমর্পনই একটি সহজ-সরল ও বুদ্ধিসম্মত চলার পথ। জীবনের আপাত একটি লক্ষ্য হলো স্রষ্টার প্রতি নিজেকে সমর্পন করা। এটিই 'আত্মসমর্পন'। এখানেই জীবনের সার্থকতা। এতটুকুই মানুষের কাজ। এটি বুঝে চলতে পারলেই জীবন সহজ হয়ে যাবে। বাকী কাজ তাঁর, যিনি সৃষ্টি করেছেন।

এ আত্মসমর্পন অস্ত্র ফেলে হাত ওপরে উত্তলন নয়। বিধাতার প্রতি সমর্পন কি এবং কিভাবে সেটি করতে হবে এটিও এক বড় প্রশ্ন? তবে এ পথে যিনি এগুবেন তিনি নিজেই সেটি জানতে ও বুঝতে পারবেন। কেননা বিধাতা নিজেই তাকে সহায়তা করেন তাঁকে বুঝতে।

"... যে জানে যে, কিরূপে পরমার্থের কাছে সমর্পন করতে হয়, সে স্বর্গরাজ্য লাভ করে।" (গীতা ৫:১৫)

স্ত্রীর মুখের হাসি কিংবা সন্তানের সকল মনবাসনা পূর্ণ করার মধ্যেই জীবনের সার্থকতা নয়। একটি বাড়ী করে যাওয়ার মধ্যেই জীবনের সার্থকতা নয়। কিংবা ক্ষুদ্র একটা দলে নিজের বিশাল অস্তিত্ব তুলে ধরতে পারার মধ্যেই জীবনের সার্থকতা নয়।

"মানুষকে সেই স্থানের খোঁজ করতে হবে যে, কোথা থেকে সে এসেছে, কোথায় চলে যাওয়ার পর সে আর ফিরে আসে না এবং সেই পরমাত্মায় সমর্পন করতে হবে, যার থেকে সব কিছুর শুরু এবং আদি থেকে যার মাঝে সকলের বসবাস।" (গীতা ৪:১৫)

মর্যাদা

(Stature)

সত্যি বলতে মানুষ নামক প্রাণীটির কোন মর্যাদা নেই। কোন ভালবাসা প্রাপ্তি নেই। মানুষ একটি খোলসমাত্র। যার কোন মূল্য নেই। অতপর তার ওপরের অংশটি আরেকটি খোলস দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে। নাম মুকুট। না-হ, তাতেও পরিপূর্ণ মনে হচ্ছে না। সেখানে লাগানো হলো হীরা-জহরত-মনি-মুক্তা। পরিধানের কাপড়ে নানান সব মূল্যবান পাথর। একেবারে নীচে সাম্পানের মত জুতো। সেটিও দামী সব পাথরে খঁচিত!

কলিমুল্লাহ যখন খোলসটির বাইরে ছিল, সবাই তাকে কৃষকের ছেলে কিংবা তাতী-জেলে, কামার-কুমার বা মুটের ছেলে, কিংবা তার ছেলের ছেলে কিংবা তার ছেলের ছেলে কিংবা ... এভাবেই জানতো। কিন্তু তাতে দোষের কি?



না দোষের কিছু নেই। দোষ মানুষের। দোষ মানুষের ভাল-মন্দের স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে তার অবুঝ কিংবা অতি বুঝজনিত পছন্দের।

কলিমুল্লাহ যখন খোলসটির ভেতরে, তখন সে রাজা, মহারাজা, বাদশাহ, সম্রাট, শাহেনশাহ! অতএব ওটা কেবল খোলসই নয়! ওটা তার মর্যাদার প্রতীক। ওটার ভেতরে যে যতক্ষন অবস্থান করে ততক্ষন সে মর্যাদাবান। বস্তুত যাকে মর্যাদাবান বলি, সত্যিকারে তার কোন মর্যাদা নেই। ঐ খোলস থেকে মানুষটিকে বেড় করে আনলেই সে মর্যাদাহীন হয়ে যাবে। মর্যাদার সৃষ্টি মর্যাদার প্রতীকের সাথে মানবের সংযোগে।

এতে কোন সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার কথা নয়। এটাকে একটা সিস্টেম হিসেবে মেনে নেয়া যায়। সমস্যা হয় তখন, যখন ঐ প্রতীকটি আয়ত্বে আনতে অনৈতিক পথ, ছল-চতুরতার পথ বা দুষ্টুমির পথ গ্রহণ করা হয়। তখন ওটা আর সাধারণ মর্যাদার প্রতীক নয়, অহম বোধের প্রতীক হয়ে যায়! যার পরিণতি ধ্বংস। সে ধ্বংস কেউ নিজের জীবনে দেখে, কেউ দেখে পরবর্তী প্রজন্মের মাধ্যমে।

মর্যাদা

স্যুট-টাই, কোট-প্যান্ট পরিহীত লোকটি যখন ফুটপাত দিয়ে হেটে যায়, অচেনা হলেও সকলেই তাকে ন্যূনতম সন্মানটুকু প্রদর্শন করে। সালাম দেয়। ভেতরে কি আছে জানতেও চায় না। বাহিরের রূপই ব্যাক্তিকে সন্মানীত বলে ধারণা দেয়। বিলেতী বিলেতী বা ইংরেজ ভাব। পোষাক কথা বলে।

ধুতি পরিহীত, পৈতা গলায় ব্যাক্তিটি যে ব্রাহ্মন তা পোষাক বলে দেয়। ভেতরে ব্রাহ্মনত্বের জ্ঞান ও চর্চ্চা আছে কি নেই কেউ তা জানতে চায় না। মাথায় টুপি, গায়ে পাঞ্জাবী, পরণে পায়জামায় দেশী হওয়া সত্বেও আরবী ভাব।

ব্যাক্তি কিভাবে মনুষ্য সমাজে নিজেকে উপস্থাপন করতে চাইছে, পোষাক তার প্রমাণ বহণ করে। ভেতরের জ্ঞান কিংবা আচরণে কেমন জানতে বা বুঝতে চায় না। অথচ পোষাক জ্ঞান ধারণ করে না। তবুও পোষাকিকে নির্দিষ্ট বিষয়ে জ্ঞানী বা সন্মানী মনে হয়।

সমস্যা কি? ছদ্দবেশ ধারণ করে কেউ যদি একটু মর্যদার সাথে ভালভাবে তার জীবনটা পার করে দিতে পারে? না, সমস্যা নেই। সমস্যা হয় তখন, যখন এভাবে মাত্রাতিরিক্ত সন্মান অর্জন করা সত্বেও, সমাজকে তারা ভূল পথে চালনা করে, কিংবা নিজ কর্মের স্থানটিতে যথাযথ সেবা দান করতে ব্যার্থ হয়।

বিভিন্ন লেবাস ধারণের শিক্ষা প্রকৃতিই আমাদেরকে দিয়েছে। প্রকৃতি এটাও বলে দেয় যে, সে লেবাস কখনও অন্যকে ঠকানোর জন্য, কখনওবা কারও চোখকে ফাঁকি দেয়ার জন্য। এমন কথাও সমাজে প্রচলিত আছে। তবে এটাও ঠিক যে, তা করা হয় নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যও বা আত্মরক্ষার জন্য।

সত্য হচেছ, প্রকৃতির এ শিক্ষা একটি পরীক্ষাও। প্রকৃতি প্রলুব্ধ করে। ভূল পথে পা বাড়াতেও প্রলুব্ধ করে। কিন্তু তাতে পা বাড়াতে পূর্ব থেকেই বারণ করে দেয়া আছে। যে কাজটি মানুষের ওপর আরোপিত ধর্ম করে। যারই ক্রমবিকাশমান ধারায় বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত আইন-কানুন, বিধি-বিধান ও নানান রকমের ব্যবস্থা। ধর্ম তাই মানব জীবন ও সমাজে দিক বা পথ নির্দেশনা হয়ে কাজ করে বলা হয়। অতঃপর মানুষকেই তার করণীয় বিষয়ে নিজেকে বিবেচনা করতে হবে। এটিই পরীক্ষা।

প্রকৃতির কার্যকলাপে আছে অনেক অংক। যার যেটা ইচ্ছে গ্রহণ করে। প্রকৃতি থেকে মানুষ ঠকবাজিও শিখতে পারে, আবার সত্য পথে চলার দৃঢ়তাকেও গ্রহণ

করতে পারে। পরিশেষে সকল রকম কর্মের পরিণাম ভোগ করতে হবে মানুষকেই। আরোপিত ধর্ম সে শিক্ষা বা জ্ঞানও দিয়ে রেখেছে।

কলিমুল্লাহকে কেউ চেনে না, জানে না। যেদিন টিভিতে তাকে প্রথম দেখা গেল গাড়ি হাঁকিয়ে চলে যেতে- সেদিন থেকে তার সন্মান বৃদ্ধি পেল। নিঃস্ব-দুঃখী-বঞ্চিত কলিমুল্লাহর সত্যিকারের কোন সন্মান নেই। তার সন্মান ঐ গাড়িতে উঠে বসার কারনে। প্রকৃত সন্মানটা কার? কলিমুল্লাহর না গাড়ির?

মানবের নিজস্ব কোন সন্মান নেই। মূল্যবান সম্পদের সাথে সংযোগে তার সন্মান। শুধু সন্মান নয়। ভালবাসা প্রাপ্তিও। এ সন্মান - এ ভালবাসা অর্থহীন। এটা কিনতে পাওয়া যায়। তবে আর বাড়তি সম্পর্কগুলো চর্চ্চা করার প্রয়োজন কি? সামর্থ থাকলে প্রয়োজনে যখন খুশি তা কিনে নেয়া যাবে। কথাটি এ কারনেই বলতে হচ্ছে যে, কথিত প্রটোকলের মর্যাদার ভারে অনেকেই আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের সাথে আজকাল স্বাভাবিকভাবে মিশতেও ব্যার্থ হচ্ছে।

কলিমুল্লাহর স্রষ্টার বড় বেদনা। তাকে দিয়ে যা করানো যেত তা করানো যাচ্ছে না। অতএব মর্যাদা আরও বৃদ্ধি করে দিতে হবে। সমাজে গ্রহণযোগ্যতার প্রতিযোগীতায় এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে তাকে। কিন্তু কিভাবে সেটি সম্ভব? সন্মানজনক পদবী সৃষ্টি করে।

মর্যাদার আরেকটি প্রতীক প্রটোকল। প্রটোকলধারীগণ যাদের সেবায় রত তারাই তাদের কাছে ভিড়তে পারে না। যাকে তার সালাম দেয়ার কথা, সেই তাকে সালাম না দেয়ার অপরাধে হাজতবাসী হয়। অংক বলে চাকুরী শেষে তার যতটুকু সম্পদ থাকার কথা, কারও কারও থাকে ঢেড় ঢেড় বেশী। কোন আচার-বিচার নেই। ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে নানান খেলা খেলে ক'দিন আনন্দে কাটিয়ে দেয়া। এ জীবন এক কঠিন পরীক্ষা।

যারা বিশ্বাসী নয়- তারাই পারে অনায়াসে বৈষম্যমূলক অন্যায় আচরণ করে যেতে। যেন কোন দায়িত্ববোধ নেই। আছে দায়িত্বের কথা ঘন ঘন উচ্চারণ। মানুষকে তাই তার কর্মের পরিণাম বিষয়ে বিশ্বাসী হতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। তবে স্বাধীনতাও দেয়া আছে সত্য বার্তায় বিশ্বাসী কিংবা অবিশ্বাসী হওয়ার।

অতপর যদি আরও অধিক মর্যাবান করে সৃষ্টি করার প্রয়োজন হয়, তবে পুরস্কার প্রদান করা যেতে পারে। মর্যাদা বৃদ্ধির আরেকটি হাতিয়ার। নোবেল পেলে মর্যাদার চরমে উন্নীত হলো। নোবেল প্রাপ্তির আগের দিন আর পরের দিনে

কলিমুল্লাহর শারিরীক-মানসিক কিংবা চিন্তায় কোন পরিবর্তন নেই। অথচ সমাজে সাধারণ মানুষের মনে ধারণাগত এক পরিবর্তন সূচীত হয়। যার সুফল কেবলি ভোগ করতে পারে এসব প্রতীকের সৃষ্টিকারীরা। সত্যি বলতে এমন কি নোবেলের প্রাপকও সে সুফল পরিপূর্ণ ভোগ করতে পারে না! বরং কখনও তাকে ঝুঁকির মধ্যে পরতে হয়।

এসব থেকে সাধারণ মানুষের কোন প্রাপ্তি নেই। যতটুকু প্রাপ্তি ততটুকুও মিডিয়াকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে হয়। সাধারণ মানুষ সাধারণভাবে বুঝে না কিসের জন্য এত পুরস্কার! যদিওবা কিছু প্রাপ্তি থাকে তো সেটা সামষ্ঠিক অর্জন। ব্যাক্তির নয়। কথাগুলি সর্বতোভাবে সঠিক না হলেও এভাবে বলতে হল- কেননা এসবের যেমন উপকারীতা ও আনন্দ আছে, তেমনি অপকারীতা বা নিরানন্দও কম নয়। বর্তমান সময়ে শেষোক্তটাই বেশী। এগুলি অন্যদের ভাল কাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। নিরূৎসাহিত করে। হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। অতপর সকল ভাল কাজকে নষ্ট করে। বিশেষত এখনকার যুগ ও সময়ে। যখন কৃত্রিমভাবে সাঁজিয়ে বা পরিকল্পিতভাবে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

যারা মর্যাদার একটির পর একটি এমনতর ধাপ সৃষ্টি করে তারা বুদ্ধিমান। বুদ্ধিমানদের কোন ক্রুটি নেই। তারা তাদের লাভ ও প্রয়োজনে নানান ফঁন্দি আটবেই। কিন্তু যারা সে ফাঁদে আটকা পরছে দোষটা তাদের নিজেদের উদাসীনতা ও অজ্ঞতার। প্রত্যেককেই তার নিজের ভাল বুঝে নিজেকেই চলতে হবে। পুরস্কারপ্রাপ্তরা কিছুই করে দেবে না। কিন্তু উদাসীনতা ও অজ্ঞতা অপরাধের পর্যায়ে পরে। অতপর একদিন তাদেরকেও বলতে হবে,

“যেদিন তাদের মুখ-মন্ডল আগুনের দিকে ফেরান হবে তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহ ও তার বার্তাবাহককে মান্য করতাম। হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা আমাদের নেতা ও প্রভাবশালীদের কথা মান্য করেছিলাম এবং তারা আমাদেরকে সঠিক পথ থেকে ভূল পথে পরিচালিত করেছে। .. তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন।” (আল-কোরআন ৩৩:৬৬-৬৮)

এতসব শ্রুতিকটু কথা বলতে হল, কেননা অনেক পাপি মর্যাদার এসব প্রতীক সংগ্রহ করে লেবাস লাগিয়ে দিব্যি সমাজে সাধু সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মানুষ এভাবে মর্যাদার স্বীকৃতি দেয় বিধায় দুষ্টু জনেরা এসব সুবিধা গ্রহণ করে চলেছে। আবার

এগুলো সংগ্রহ করতেও যে প্রতিযোগীতার সৃষ্টি করা হয়, অনেক অঘটন ঘটনের কারনও সেখানে নিহীত।

যারা এগুলো সৃষ্টি করে তারা কি এসব জানে না? নিশ্চয়ই জানে। নিয়মের সৃষ্টিকারীরা সম্পদশালী, ক্ষমতাশালী। তারা নানান উপায় উদ্ভাবন করে নিজেদের অবৈধ বা অনৈতিক অর্জনের নিরাপত্তা বিধান করে। নিজেদেরকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত রাখে। নিজেদের ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করে।

এটাও সত্য যে- নোবেল বিজয়ী এক কলিমুল্লাহ, গাড়ি হাকানো কোন কলিমুল্লাহ, টুপিওয়ালা কোন কলিমুল্লাহ, ধুতি পরিহিত কোন কলিমুল্লাহ, কিংবা মুকুট মাথায় দেয়া কোন কলিমুল্লাহ সৃষ্টি করে কোটি মানুষের অন্তরের সত্য ভাষণকে তুলে আনা কোন কলিমুল্লাহকে স্তব্ধ, নয়তো পরিহাসের পাত্র বানিয়ে দেয়াও সম্ভব।

জ্বালা ও প্রশান্তি

(Pain and Peace)

কৃষকের নাতি। কৃষকের ছেলে। কষ্টে লেখাপড়া শেষ হয়েছে। ভাল চাকুরি হয়েছে কিংবা ব্যাবসা। গ্রাম ছেড়ে রাজধানীতে স্থান হয়েছে। কর্মস্থলে একটু একটু নেতৃত্বও জন্মেছে। এক সময় নেতা হয়েছে। ফুটফুটে বউ হয়েছে। সন্তান হয়েছে। তাদের মুখের সুখের হাসি বুকে আনন্দের বন্যা বইয়ে দিয়েছে। গাড়ি হয়েছে, বাড়ি হয়েছে। সমাজে সন্মানের আসন হয়েছে। তার সুখ আর তড়তড়িয়ে এগিয়ে যাওয়া দেখে মানুষ দুর থেকে ঈর্ষা করে। মনে মনে কেউ হয়তোবা ধ্বংসও কামনা করে। জানিনা।

এই সুখ আর এই সন্মান অর্জন করতে গিয়ে হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়েছে। ভেতরের ইতিহাস কেউ জানে না। কেউ তা জানতেও চায় না। সবাই দেখে দিন শেষে প্রাপ্তিটা কি? ফলাফল দেখে।

দিনশেষে বার্ধক্য এলো। যেসব অন্যায় আর চাতুর্যপূর্ণ কৌশল দিয়ে অপরকে বঞ্চিত করেছে, এতকিছু অর্জন করেছে, তার বিচারও হল। আজ স্ত্রীর চোখের জল ভেতরে ব্যাথার সৃষ্টি করছে। অবুঝ সন্তানও বড় হয়ে আজ পিতার অতীত কর্মকান্ড মেনে নিতে পারছে না। নানান কারনে ভেতরে দহন হচ্ছে। যাদের জন্য এতসব করা তাদের আচরণও নতুনভাবে অন্তর জ্বালার মাত্রাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। বুকের ভেতর আগ্নেয়গিরির লাভার উদগিরণ। সব সময় দোজখে গিয়ে পুড়ে আসতে হয় না। কখনও কখনও দোজখ ভেতরেও বাসা বাঁধে।

“অনেক জ্বিন ও মানুষ এখনও নরকের আস্বাদ গ্রহণ করছে। তাদের অন্তর আছে, অথচ তার দ্বারা তারা উপলব্ধি করে না। তাদের চোখ আছে, তার দ্বারা তারা দেখে না এবং তাদের কান আছে, তার দ্বারা তারা শোনে না। ... তাদের মধ্যে আছে উদাসীনতা।” (আল-কোরআন ৭:১৭৯)

এ জ্বালার সাধ যে পেয়েছে সে জানে কেন মানুষ আত্মহত্যা করে, কিংবা খুন করে। তারপরেও যার মনুষ্যত্ব আছে, যার বিশ্বাস, ধৈর্য্য ও জ্ঞানটুকু আছে সে সঠিক আচরণের মাধ্যমে ক্ষমা পায়। সময় লাগে। কিন্তু কিছু লোক অধিকতর পাপে নিমজ্জিত হয়।

জ্বালা ও প্রশান্তি

এত উপার্জন, এত সন্মান দিনশেষে কেবলি জ্বালা। ছিনিয়ে আনা এমন উপার্জন, এমনতর সন্মান জীবনের লক্ষ্য হতে পারে না। তবুও জীবন বড় মধুর। উপার্জনের ফলাফল মধুর । সন্মানের ফলাফল মধুর। সবাই মধু পছন্দ করে। শিশুরা বেশী। অধিক মধু রোগেরও কারন। এ এক উদাহরণ।

কেরানির নাতি। অফিসারের ছেলে। আহামরি উন্নতি নেই। সাদামাটাভাবে দিন চলে যায়। স্ত্রীর সব চাহিদা পুরণ হয় না। সন্তানেরও নয়। সকলের মুখ কালো। কালো মুখ দেখেও অন্তর জ্বলে।

অধিক উপার্জন করে অধিক দিলে আরও চাই। সেখানেও মুখ কালো। দিয়েও সুখ নেই। না দিতে পারলেও সুখ নেই। জ্বালা আর জ্বালা। এ জগত জ্বালাময়।

অধিক উপার্জন, অধিক প্রাপ্তি আর অধিক প্রদানের আবর্তে জীবন বাঁধা পরে গেছে। এত কিছুর পরেও শান্তি নেই। অথচ শান্তির জন্যই এতকিছু করা। শান্তি বিনষ্ট করে শান্তি খুঁজে বেড়াই। অন্তরের জ্বালা দুর হয় না।

যাকে ভালবাসি তাকে দিতে চাই। আপনা থেকেই দিতে চাই। ভালবাসা থেকে এ চাওয়া উৎসারিত। দিলে আরও চায়। তুলনা করে। মনে হয় যেন ভালবাসা নেই। অন্তরে জ্বালা হয়। যখন দিতে পারি না। তখনও জ্বালা হয়। সর্ব-সংকট।

কে আছো তুমি? কোথায় আছ? কে আমায় এমন করে সৃষ্টি করেছ? কে আমায় সৃষ্টি করা এমন পরিবেশে ফেলে দিয়েছ- যেদিক দিয়ে হাটি সেদিকেই জ্বালা?

- কি এই জ্বালা? কেন এই জ্বালা?
- না, এটা জ্বালা নয়। এ জ্বালা কিছু একটার নির্দেশক। ইনডিকেটর।
- কিসের নির্দেশক?
- ভূল পথে চলার নির্দেশক।

দুই দিকে দুটি সীমা রেখা। মাঝখানে পথ। যেদিকে যাই, যেভাবে যাই- যখন সীমা ছাড়িয়ে যাই, তখন জ্বালার উৎপত্তি। বৈদ্যুতিক তরঙ্গের মত এ জ্বালা সমস্ত দেহ ও মনে ছড়িয়ে পরে। বেশীদুর সে পথে এগুতে 'না বলে'। সীমার মাঝে চলতে স্মরণ করিয়ে দেয়।

কখনও কখনও সে জ্বালার পরিমান মাত্রাতিরিক্ত বাড়িয়ে সঠিক পথে ফিরে আসতে বাধ্যও করে। প্রকৃতপক্ষে মানুষ সইতে না পেরে বাধ্য হয় ফিরে আসতে। বিধাতা এভাবেই মানুষকে সঠিক পথ চিনতে ও সে পথে চলতে সহায়তা দিয়ে

যান। কিন্তু যে ইনডিকেশন বা ইংগীত বোঝে না, সে ভূল পথে চলতে থাকে- অতপর জ্বলে-পুড়ে জীবন তার নিঃশেষ হতে থাকে।

কে আমায় এত দায়িত্ব দিয়েছে স্ত্রীর মুখে হাসি ফোটাবার? কে আমায় এত দায়িত্ব দিয়েছে সন্তানের মুখে হাসি ফোটাবার। এ স্ত্রী তো একসময় আমার ছিল না। এ সন্তানও তো একসময় আমার ছিল না। আমি নিজেও তো এক সময় এ ধরায় ছিলাম না। এখন এতসব হওয়ায় আমার ওপর দায়িত্ব বর্তেছে।

যিনি সৃষ্টি করেছেন বস্তুত সকল দায়িত্ব তাঁর। তিনি তার কাজ সঠিকভাবে করে চলেছেন। তাঁর কারনেই মানুষের ওপর দায়িত্ব বর্তেছে। তিনি মানুষকে পথ বাৎলে দিয়েছেন। কিন্তু আমরা নিজেরাই সঠিক কাজ করিনা। ধর্মের পথে চলি না। কি? ধর্মের পথ? অন্ধত্ব! সাম্প্রদায়িকতা?

ধর্মকে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর সঙ্গার মধ্যে ফেলে দেয়া হয়েছে। অথচ ধর্ম অন্যায় ও মন্দ পথে চলতে বারণ করে। সে কথা কেউ বলে না।

অন্যায় কাজ করে হলেও কারও মুখে হাসি দেখতে চাই। মর্যাদা পেতে চাই। বস্তুত এর সবকিছুই যাদের জন্য করি বলে মনে করি, একটিও তাদের জন্য করি না। সবই করি আত্মতুষ্টির জন্য। কেউ হাসি দিলে নিজে আনন্দ পাই। ঐটুকুর জন্য কাজ করি। পাপটা তাই নিজের। স্ত্রী সন্তান জেনে-বুঝে উৎসাহ দিলে পাপের ভাগীদার হতে পারে।

- সীমারেখার মাঝের পথটি তবে কি?

সম্পদ আহরণে অধিক সময় ব্যায় না করে স্রষ্টাকে স্মরণ করা। এ স্মরণের অর্থ কেবল স্মরণই নয়। এ স্মরণ তার নির্দেশিত পথে চলা। অর্থাৎ যথাযথ পথে চলা। অন্য কথায় সত্য ও ন্যায়ের পথে চলা। সম্পদ যতই আহরণ করি তা চিরস্থায়ী নয়। সাথে নিয়েও যাব না। মান-মর্যাদা প্রাপ্তির যে আকাংখা তাও চিরস্থায়ী নয়। শরীরের রস ফুরোতে থাকলে নিজ জীবদ্দশাতেই তা উপলব্ধি করা সম্ভব। এগুলো অপ্রয়োজনীয় নয়। তবে এগুলোর পেছনে প্রাণান্ত শ্রমব্যয়, শারিরীক-মানসিক-সামাজিক সুস্থ্যতার পরিচায়ক নয়।

স্রষ্টাকে অধিক স্মরণ করতে গিয়ে সম্পদের প্রাপ্তি কম হতে পারে। স্ত্রী ও সন্তানের মুখের হাসি কম জুটতে পারে। বেশী জুটলেও লাভ নেই। সেটাও ক্ষণস্থায়ী। একটু অপ্রাপ্তিতেই বরং তৃপ্তি বেশী। অতিরঞ্জিত করার প্রয়োজন নেই। পরিবারের সদস্যদের এ মানসিকতায় গড়ে তোলা এ পথে চলাকে সহজতর করে

গড়ে তুলতে পারে। কিন্তু সমস্যা হয় তখন, যখন সমাজের অপরাপররা অন্যায় পথে চাকচিক্যময় জীবন-যাপন করার মধ্য দিয়ে মানুষকে বিচলিত করে দেয়। তাই কিছু মানুষের অতি উপার্জনের তেমন সহজ পথ বন্ধ করার প্রয়াস চালানও মানুষের কাজের মধ্যে একটি অন্যতম কাজ। এটিই সুশাসনের অন্তর্ভূক্ত কাজ। অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কারও মুখে হাসি ফোটানোতে পাপ নেই। নিজের মর্যাদা বৃদ্ধি করাতেও পাপ নেই। তবে অন্যায়ভাবে অতিরঞ্জিত করার প্রয়োজন নেই। অতিরঞ্জিত না করে ন্যায়ের পথে প্রয়োজনীয়টুকু করাই যথাযথ দায়িত্ব পালন। ততটুকু হাসিতে তুষ্ট থাকতে পারাতেই শান্তি।

কিছু তরকারি আছে তেতো। যেমন করলা। সবাই এর স্বাদ পায়না। পছন্দ করে না। শিশুরা তো নয়ই। যারা পায় তাদেরও পেতে একটু সময় লেগে যায়। কিন্তু যে তার স্বাদ বুঝতে পেরেছে সে সত্যটি জানে এবং আস্বাদটুকু পুরোপুরি নিংড়ে নিতে চায়। স্রষ্টার স্মরণের পথে প্রবেশে প্রাথমিক পর্যায়ের সময়টিও তেমনি তেতো মনে হয়।

“.. এবার (তবে) শোন তিন ধরণের সুখী অবস্থার কথা। যা জড় প্রকৃতির শর্তে আবদ্ধ আত্মা উপভোগ করে এবং যার মাধ্যমে কখনও সকল বেদনার অবসান হয়। যা শুরুতে বিষের মতো মনে হয়, কিন্তু শেষে অমৃতের মত; যা একজনকে আত্ম-উপলব্ধির মাধ্যমে জাগরিত করে, সেটিই সবচাইতে ভাল অবস্থাজনিত সুখ।” (গীতা ১৮:৩৬-৩৭)

“... অবশ্যই আল্লাহর স্মরণ (আত্ম-উপলব্ধি) দ্বারা অন্তরসমুহ প্রশান্তি লাভ করে।” (আল-কোরআন ১৩:২৮)

গবেষনা ও অনুভূতি

(Research and Feeling)

বাজারে আড়ং কিংবা মিল্ক ভিটার দুধ দেখেছেন? কোথায় কিভাবে তা তৈরী হয় সে প্রক্রিয়া কেউ দেখেছেন? সে সব বিশাল ব্যাপার-স্যাপার। বিরাট শিল্প কারখানা। প্রকান্ড এক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এ দুধ বাজারে ভোক্তা পর্যন্ত আসে। যেহেতু বিরাট প্রক্রিয়া এবং আমরা জানি যে প্রক্রিয়াটি আসলেই বিশাল, তাই এর কর্মযজ্ঞকে বড় বলে মেনে নিতে দ্বিধা হয় না। বড় বলে স্বীকৃতি দেই।

বড় শিল্প মাধ্যম দিয়ে যা বেড় হয়ে আসে তার মূল্য দেই এবং বড় বলে স্বীকার করি। কিন্তু যেটি আসল কর্ম অর্থাৎ দুধ সৃষ্টিকরণ, সে শিল্প মাধ্যমে কিন্তু কোন দুধ উৎপাদন হয় না। কেবল প্রাপ্ত দুধের প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। অনেক দুধ সংগ্রহ করে তাকে দীর্ঘদিন ধরে রাখার মত করে সরবরাহ করা হয়। তাতেই কত বড় কর্মযজ্ঞ! বড়কে বড় বলতে দ্বিধা করি না।

কোনটি বড় কাজ? প্রাপ্ত দুধের প্রক্রিয়াকরণ না দুধ সৃষ্টিকরণ? কে দুধ সৃষ্টি করে? কে মধু সৃষ্টি করে? যারা এগুলি সৃষ্টি করে তারা তাদের ক্ষুদ্র দেহের অভ্যন্তরে এর চেয়েও জটিল যন্ত্র ও প্রক্রিয়াকে ধারণ করে। তারা ভেজালমুক্ত খাঁটি দ্রব্যটি সরাসরি সরবরাহ করে। তাদের মূল্য কি ঐ প্রকান্ড শিল্প কারখানা থেকে কম না বেশী? যাদেরকে ক্ষুদ্র প্রাণী বলি, তারা নিজেরাই এক একটি প্রকান্ড ও বহু সংখ্যক শিল্প-কারখানার জীবন্ত ধারক! আর যিনি সেই যন্ত্রের বা শিল্পের স্রষ্টা?

যন্ত্র কেবল নিজ প্রয়োজন পুরণ করে। সে অন্যের কথা বা মানব জাতির উপকারের কথা ভাবে না। সে নিজ প্রয়োজনে আহার করে। কিন্তু যিনি সমগ্র জগত সৃষ্টির শিল্পি বা কারিগর তিনি ভেবেছেন অনেক কিছু। তিনি কাউকে দিয়ে বলপূর্বক কোন কাজ করান না। তিনি করেন কৌশলে। একটি প্রক্রিয়া সৃষ্টির মাধ্যমে।

ছাগল কিংবা গরু কিংবা মৌমাছি তার নিজ প্রয়োজনে, নিজ আগ্রহে খাদ্য গ্রহণ করে। গৃহিত খাদ্যই পরবর্তী কর্মযজ্ঞের কাঁচামালস্বরূপ। তার আহারকৃত খাদ্য অবশেষে যে প্রক্রিয়ার মধ্যে পরে যায়, তাতেই দুধ কিংবা মধু বের হয়ে আসে।

দুধ সৃষ্টির ক্ষুদ্র প্রাণীজ ইন্ডাষ্ট্রি, দুধ সংরক্ষণ করে রাখার বিশাল ইন্ডাষ্ট্রিজ থেকেও অনেক বড় ও জটিল!

গবেষনা ও অনুভূতি

মানুষ এক ক্ষুদ্র প্রাণী। নিজ প্রয়োজন ও আগ্রহে সে জগতের নানান রূপ-রস-গন্ধ গ্রহণ করে। তাতেই সে তার মধ্যে সকল বিষয়ে একটি ধারণা লাভ করে এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। সে নিজেই এক গবেষনা প্রতিষ্ঠান। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক দ্বারা সে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে। মস্তিস্কে সে তথ্যের প্রক্রিয়াকরণ হয়। সে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। গবেষনার সব প্রক্রিয়া তার নিজের মধ্যেই সম্পন্ন হয়। মূল কাজটি প্রতিটি ব্যাক্তি এককভাবে করে। অতপর কোন বড় গবেষনা প্রতিষ্ঠান অনেকের তথ্য একত্রিত করে একটি সিদ্ধান্তে আসে।

গবেষনার আছে বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন ধরণ। সামাজিক গবেষনার ক্ষেত্রে এক রকম, বৈজ্ঞানিক গবেষনার ক্ষেত্রে এক রকম। সামাজিক গবেষনার ক্ষেত্রে মতামত সৃষ্টিও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই অনেকের সম্পৃক্ততা গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ বিষয়টিকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই মূল বা প্রধান বা কোন একক চিন্তাশীল মানুষ বা গবেষকের প্রাপ্তিটাই আসল। অনেকের থেকে তথ্য নেয়া হয় সেটিকে যাচাই করার জন্য। উনিশ-বিশকে ঠিক করার জন্য।

বৈজ্ঞানিক গবেষনার ক্ষেত্রেও তাই। পরবর্তীতে ভূল-ত্রুটি সংশোধন কিংবা আরও অগ্রসর হওয়ার জন্য মানুষের সম্পৃক্ততা প্রয়োজন। কিন্তু মুল প্রাপ্তি বা আবিস্কারটা হয়তোবা একজনেরই। সেক্ষেত্রেও গ্রহণযোগ্যতার বিষয়টির গুরুত্ব আছে। নইলে নতুন ধারণা উদ্ভাবন বা আবিস্কারের কারনে অনেককে শাস্তি পেতে হত না।

এতগুলো কথা কেন বলতে হলো? বিষয়গুলি বোধসম্পন্ন মানুষগন বোঝেন। তবুও বলতে হলো এ কারনে যে, বোধসম্পন্ন মানুষগনই আবার কারও গভীর পর্যবেক্ষনজনিত কোন একক প্রাপ্তিকে মেথডলজির ত্রুটির কথা বলে সমাজে অপাংতেয় করে তোলায় মত্ত হয়ে ওঠে।

বিধাতা সৃষ্ট মূল যন্ত্র থেকে প্রাপ্ত ফলাফলটাই আসল। আর সেটি যখন কোন প্রকল্পভূক্ত না হয়ে কোন অনুসন্ধানি মনের নিজ আকুতি বা আগ্রহে আন্তরীকতার সাথে সম্পন্ন হয়, তখন সেটি হয় সর্বশ্রেষ্ঠ! (লেখা ২০১৩)

- শেষ -